রেবতীমোহন বর্ম'ণ

রেবতীমোহন বর্ম'ণ আর আমাদের ভিতরে নেই। ৬ই মে (১৯৫২) তারিখে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল দুরারোগ্য কুষ্ঠ-ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাধির হাতেই তিনি নিজের জীবনকে স'পে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা যে শুধু একজন বিশিষ্ট বিপ্লবীকে হারালাম তা নয়, মার্ক্‌স্‌বাদের একজন একনিষ্ঠ ছাত্রও আজ চির-দিনের মতো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তাঁর আরো অনেক অবদান দেওয়ার ছিল, কিন্তু দুষ্ট ব্যাধি তা থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রে দিল।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একজন সুলেখকও ছিলেন তিনি। কিন্তু এই পরিচয় তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর রাজনীতি ও বৈপ্লবিক জীবন থেকেই তাঁর আসল পরিচয় আমাদের পেতে হবে। এই জীবনের তাকিদেই তিনি লেখক হয়েছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি পড়া ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের জোর ক'মে যাওয়ার পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি ঢাকার শ্রীসঙ্ঘেও যোগদান করেন। গোড়ায় এই সঙ্ঘটি মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের একটি যুব সংগঠন ছিল। পরে সঙ্ঘের সভ্যরা বৈপ্লবিক কার্যক্রম (সরকারী দফ্‌তরের ভাষায় সন্ত্রাসবাদী কর্মপদ্ধতি) গ্রহণ ক'রেছিলেন। রেবতী বর্ম'ণ পূর্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী হ'লেও শ্রীসঙ্ঘের সভ্য হিসাবে তাঁর কর্মস্থল ছিল কলিকাতা, বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলা। এইরূপ বৈপ্লবিক কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়েও তিনি কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষা পাস করেছিলেন। তিনি "বেণু" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বা'র ক'রে তার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। পরে এই কাগজখানার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। যতটা মনে হয় এই সময় থেকেই কমরেড রেবতী বর্ম'ণ রুশদেশের কর্মধারার প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। এই সময়েই (১৯২৯ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর "তরুণ রুশ" নামক বইখানা।

বর্তমান শতাব্দীর তিন দশকে বাংলার হাজার হাজার রাজনীতিক কর্মীদের মতো কমরেড রেবতী বর্মণও বিনা বিচারে বন্দী হন। এই অবস্থায় তাঁকে বিভিন্ন বন্দী-শিবিরে বাস করতে হয়েছিল এবং তিনি শেষ বাস করেছিলেন রাজপুতনার দেউলী বন্দী-শিবিরে। সম্ভবত এখানেই তাঁর শরীরে কুষ্ঠরোগের বীজাণু প্রবেশ করে।

বন্দী-শিবিরে থাকার সময়ে কমরেড বর্মণ গভীর মনোযোগের সহিত মার্ক্‌স্‌বাদের মূল সাহিত্যগুলোর পড়া শুরু ক'রে দেন। এই অধ্যয়নের ভিতর দিয়েই তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন এবং এও স্থির ক'রে ফেলেন যে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিবেন।

একটি কথা এখানে ব'লে রাখা ভালো। কমরেড রেবতী বর্মণ যে মামুলী ধরনে মার্ক্‌স্‌বাদের পড়াশুনা করেন নি তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজস্ব "ক্যাপিটাল" বইখানা থেকে। "ক্যাপিটাল"-এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো ভারতের যে-কোনো ঘটনা পেলেই তিনি তা বই-এর মার্জিনে নোট ক'রে রাখতেন। মার্জিনে জায়গা না থাকলে ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রাতে ছোট ছোট হরফে লিখে সে-সব "ক্যাপিটাল"-এর বিভিন্ন পৃষ্ঠার সঙ্গে এ'টে রাখতেন। এই বইখানা আজ আমাদের নিকটে থাকলে তা থেকে সকলে বুঝতে পারতেন যে কত অধ্যবসায়ী ছাত্র কমরেড রেবতী বর্মণ ছিলেন। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে তাঁর এই বইখানা আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর লেখা পুস্তক-পুস্তিকাগুলো ছাড়া তাঁর কোনো স্মৃতি-চিহ্নই আমাদের নিকটে নেই, তাঁর একখানা ফটো পর্যন্ত নয়।

বন্দী-শিবিরে ব'সে ব'সে বাইরের কাজের জন্যে তিনি নিজেকে আরো নানাভাবে তৈরী করছিলেন। বাংলার ভূমি-সমস্যা বোঝার জন্যে সেটল্‌-মেণ্টের রিপোর্টগুলো সবই তিনি পড়েছিলেন। বাংলা দেশের যত জায়গার ছোট-বড় যত ইতিহাস আছে সে-সবও তিনি পড়েছিলেন।

১৯৩৮ সালের আগে কমরেড রেবতী বর্মণের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। ১৯৩৮ সালে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান। তার পরেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ছিল। তার আফিস কোথায় তা কারুর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তাই, কমরেড বর্মণ আমার মারফতে পার্টির নিকটে রিপোর্ট করলেন এবং কাজ চাইলেন। পার্টির তরফ থেকে কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এবং এই কাজের ভিতর দিয়েই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন ক'রেছিলেন।

আগেই বলেছি বাংলা দেশের কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অধ্যয়ন করেছিলেন। এই জন্যে কৃষক-আন্দোলনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। মুক্তি পাওয়ার অল্পদিনের ভিতরে তাঁর "কৃষক ও জমীদার" বই-খানা প্রকাশিত হয়। হুগলী জিলার বড়া নামক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয় ১৯৩৮ সালে। এই সম্মেলনের সভাপতি পরিষদের তরফ হতে যে-প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল তারও রচয়িতা কমরেড রেবতী বর্মণ ছিলেন। এই প্রবন্ধটি পরে "ভারতে কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন" নাম দিয়ে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের দিকে কমরেড রেবতী বর্মণের ঝোঁক ছিল না একথা বললে ভুল বলা হবে। শ্রমিকদের সঙ্গেও তিনি সহজভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। যখনই তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তখনই তাঁদের তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। এইভাবে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিক-দের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বেলঘরিয়ার শ্রমিকদের ভিতরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবের গোড়া পত্তন যাঁদের হাতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কমরেড বর্মণ ছিলেন অন্যতম।

বন্দী-শিবিরে বসে বসেই তিনি "মার্ক্স্বাদী" সাহিত্য প্রচারের কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে, আমাদের নিজেদের ভাষায় মার্ক্স্বাদী সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলে জনগণের ভিতরে কিছুতেই মার্ক্স্বাদ প্রসার লাভ করতে পারবে না। তাই মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমরেড নেপাল নাগ প্রভৃতির সহযোগে ঢাকায় "গণ-সাহিত্য চক্র" নামে একটি ছোট্ট প্রকাশন-ভবন তিনি স্থাপন করেন। এখান থেকে তাঁর "মার্ক্স্ প্রবেশিকা" ও "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" নামক দু'খানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী" স্থাপনের পেছনেও কমরেড বর্মণের অনেকখানি প্রেরণা ছিল। শুধু কমরেড সুরেন দত্ত ও আমার প্রেরণাতে যে "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী" স্থাপিত হয়নি একথা আজ সকলের জেনে রাখা ভালো। "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী" এই নামটিও কমরেড রেবতী বর্মণের দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির শুভেচ্ছায় স্থাপিত ও পরিচালিত ন্যাশনাল বুক এজেন্সীই ছিল সেই সময়ে (১৯৩৯ সালে) সমস্ত ভারতবর্ষে একমাত্র দোকান। এটা বড় হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে মার্ক্সীয় সাহিত্য পরিবেশন করবে এই কল্পনা হতেই ব্যাপকতার অর্থে ন্যাশনাল কথাটা ব্যবহার করা হয়েছিল।

কমরেড রেবতী বর্মণের লেখা সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা আজ আর পাওয়া যায় না। তাঁর বইগুলোর একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ—

(১) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (১৯৩৮)
(২) মার্ক্স্ প্রবেশিকা (১৯৩৮)
(৩) কৃষক ও জমীদার (১৯৩৮)
(৪) সাম্রাজ্যবাদের সংকট (১৯৩৮)
(৫) হেগেল ও মার্ক্স্ (১৯৩৮)
(৬) ক্যাপিটাল (মার্ক্স্-এর ক্যাপিটালের বাংলায় লেখা সংক্ষিপ্ত সার) (১৯৩৮)
(৭) ভারতে কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন (১৯৩৮)
(৮) লেনিন ও বলশেভিক পার্টি (১৯৩৯)
(৯) Society and Its Development (1939)
(১০) Marxist View of Capital (1939)
(১১) সমাজের বিকাশ (১৯৩৯)
(১২) সোভিয়েট ইউনিয়ন (১৯৪৪)
(১৩) শান্তিকামী সোভিয়েট (১৯৪৫)
(১৪) অর্থনীতির গোড়ার কথা (১৯৪৫)
(১৫) পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (বাংলা তরজমা)
(১৬) সমাজতন্ত্রবাদ—বৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক (বাংলা তরজমা)
(১৭) সমাজ ও সভ্যতার ক্রম বিকাশ

"সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" কমরেড রেবতী বর্মণের লেখা শেষ গ্রন্থ। তাঁর "সমাজের বিকাশ" নামক পুস্তিকাখানা নিঃশেষ হযে যাওয়ার পরে এই বড় পুস্তকখানা লেখার জন্যে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী তাঁকে অনুরোধ করে। তাঁর শরীর খুব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই কাজের ভার নিয়ে ১৯৪৬ সালের ভিতরে লেখা শেষ করেন। নানা কারণে ১৯৪৭ সালের ভিতরে পুস্তকখানা প্রকাশিত হতে পারেনি। ১৯৪৮ সাল থেকে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর ওপরে নানান রকম বিপদ আসতে থাকে। পুলিস দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানটির দুয়ারও জবরদস্তি বন্ধ ক'রে রাখে। দোকান খুলে দেওয়ার পরে বইখানার পাণ্ডুলিপি কিছুদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি। পরে তা পাওয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাপানোর জন্যে প্রেসে পাঠানো হয়। এই বইখানা যে ছাপা হতে প্রেসে গেছে তা কমরেড বর্মণ জেনে গেছেন। বড় দুঃখ যে তাঁর জীবদ্দশায় তার মুদ্রণ কার্য শেষ হয় নি। আমাদের

সান্ত্বনা এই যে আমাদের দেশের লোকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারবেন কত বড় অবদান তিনি এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে আমাদের জন্যে রেখে গেলেন।

পার্টির কাজের ধারা কখন কি ভাবে বদলানো দরকার তা তিনি খুবই তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ে তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার এলাকায় তাঁর নিজের বাড়ীতে ছিলেন। অসুখের জন্যে পার্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বললেই চলে। তবুও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন সব কিছুর ওপরে। ১৯৪১ সালে জার্মানীর দ্বারা সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর রোগশয্যা থেকে পার্টির ময়মনসিংহ জিলা কমিটিকে লিখে জানালেন যে এবারে যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেল, অর্থাৎ এ-যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থাকল না,—পার্টির এ-দিকে এখনই নজর দেওয়া উচিত।

পার্টির জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। পার্টি সভ্যদের জন্যে তাঁর অপরিসীম দরদ ছিল। ১৯৪০ সালে আমাদের পার্টির অন্য অনেকের সঙ্গে কলিকাতা ও আশে-পাশের জিলাগুলো থেকে আমিও গবর্নমেন্টের দ্বারা বহিষ্কৃত হই। তখন এক রকম নিঃসম্বল অবস্থাতেই আমি বাংলার এ-জিলা ও-জিলা ঘু'রে বেড়াচ্ছিলাম। এই সময়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ রওয়ানা হওয়ার আগে কমরেড রেবতী বর্মণকে এই ব'লে টেলিগ্রাম করলাম যে আপনি যদি ময়মন-সিংহের কৃষক সমিতির আফিসে একবার আসেন তবে সেখানে আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখা হতে পারে। তাঁর অসুখ বেড়েছিল ব'লে তিনি নিজে ময়মনসিংহ পর্যন্ত আসতে পারলেন না। কিন্তু টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন যুবককে ময়মনসিংহে পাঠালেন। এই যুবক নিয়ে এসেছিলেন কমরেড বর্মণের একখানা সুদীর্ঘ পত্র এবং কয়েকটি টাকা। কমরেড বর্মণ আমাদের অবস্থা বুঝতেন। তাই সব কিছুর আগে তিনি ধারণা ক'রে নিতে পারলেন যে ওই সময়ে আমার টাকার বড় দরকার। পত্রে লিখেছিলেন কোথাও যাওয়ার আগে তাঁকে জানালে তিনি মাঝে মাঝে আরো টাকা পাঠানোর চেষ্টা করবেন। সাথীদের জন্যে তাঁর মন কত দরদভরা ছিল তা এই দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝা যায়।

মাঝে অনেক বছর কমরেড রেবতী বর্মণের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। গত নবেম্বর মাসে আমি আগরতলা গিয়েছিলেম। তখন তাঁর সঙ্গে আমি শেষ দেখা ক'রে আসি। শহরের বাইরের দিকে একটি টিলার ওপরে খড়ের চালা তুলে তিনি তাতে বাস করছিলেন। শহরের একজন যুবক আমাকে তাঁর নিকটে নিয়ে যান। তিনি আমার থেকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন—"রেবতী দা, আপনার সঙ্গে মুজফ্ফর সাহেব দেখা করতে

এসেছেন।" শুনেই তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই পুরানো হাসি, সেই পুরানো স্বর, কিছুই বদলায় নি। কিন্তু, দেখলাম ঝড় বয়ে গেছে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে। চোখে খুব ঝাপসা দেখতে পান। এই অবস্থাতেও আমাদের কর্ম-তৎপরতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো কিছু অজানা নেই। খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনেন আমরা কোথায় কি করছি, আর না করছি। কোনো বিশ্বস্ত পার্টি সভ্যকে পেলে পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল হতে চান। আমি মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলতে পারলাম না বটে, কিন্তু মন আমার ব্যথায় ভরে উঠল এই ভেবে যে কি লোককে আমরা হারাতে বসেছি। অবশ্য, এত শীঘ্র যে তাঁকে আমরা হারাব তা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

মাত্র ৪৭ বছর বয়সে আমাদের ভিতর থেকে কমরেড রেবতী বর্মণ চলে গেলেন। তাঁর অভাব আমরা পুরা করতে পারব কিনা তা জানিনা। তবে, তাঁর কাজ অন্যরা ক'রে যাবেন। তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের স্মৃতি আমাদের কর্মীদের মনে সব সময়ে প্রেরণা জোগাবে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কলিকাতা
২৫শে মে, ১৯৫২

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অবস্থা হইতে সুরু করিয়া আজিকার সমাজতন্ত্র পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজের বিকাশ হয়। আদিম যুগ এবং সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে দেখা দেয় প্রথমত গোলামী ব্যবস্থা বা দাস যুগ, তারপর সামন্ততন্ত্র বা ভূমিদাস-প্রথা, সর্বশেষে পুঁজিতন্ত্র। আদিম সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল না; সমাজ-তন্ত্রেও শ্রেণী-বৈষম্য নাই। শ্রেণী-বৈষম্য মাঝের সমাজগুলিরই বিশেষত্ব।

প্রত্যেকটি সমাজের কাঠামো অপরটি হইতে ভিন্ন; সমাজের এই রূপান্তর হইয়াছে কিরূপে, কোন্ সূত্র অনুসারে?

সমাজের বিকাশের সূত্র আবিষ্কার করেন কার্ল মার্কস। খাওয়া-পরার জন্য উৎপাদন করিতে হয় সকলকেই; কিন্তু উৎপাদনের জন্য দরকার উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র। পশুরও খাইতে হয়। বাঁচিয়া থাকার জন্য আহার সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু হাত পা-ই তাহার হাতিয়ার; নিজের স্বাভাবিক অংগ-প্রত্যংগ দ্বারাই পশু খাদ্য আহরণ করে। কিন্তু মানুষের বেলায় তাহা হয় না। কৃত্রিম হাতিয়ার দ্বারা মানুষ তাহার স্বাভাবিক হাতকে সম্পূরণ করে। এইখানেই মানুষের সংগে পশুর জগতের প্রভেদ; কৃত্রিম হাতিয়ারের ব্যবহার হইতেই মানুষের সমাজের সুরু।

উৎপাদনের জন্য যে হাতিয়ার বা উপকরণ দরকার, তাহাকে বলা হয় উৎপাদনশক্তি। আর উৎপাদনের কাজে মানুষ মানুষের সংগে যে সব সম্পর্কে আবন্ধ হয় তাহাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন-শক্তির অনুরূপই হয় উৎপাদনসম্পর্ক। আদিম সমাজে পাথরই ছিল হাতিয়ার; পাথর দ্বারা একমাত্র শিকার করাই সম্ভব। কিন্তু শিকার করিতে হইলে যাইতে হয় জংগলে; একা যাওয়ার উপায় নাই, দল বাঁধিয়া, সকলে মিলিয়া যাইতে হয়। শিকার সহজলভ্য নয়, পাওয়া যাইত কম। তাই সকলে সমানভাবে শিকারের অংশ লইত। উৎপাদন শক্তি মোটেই বিকাশলাভ করে নাই; আদিম মানুষের সম্পর্কের মধ্যে তাই কোন অসমতা দেখা দেয় নাই; সকলকেই কাজ করিয়া খাইতে হইত।

কিন্তু উৎপাদনশক্তির যখন আরও বিকাশ হয়, তামা-লোহা প্রভৃতির আবিষ্কার হয়, তখন খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়। শুধু তাহাই নয়, মানুষে মানুষে অসমতাও সৃষ্টি হয়। কতকলোক শুধু উৎপাদনের উপায় বা যন্ত্রাদির মালিক, ইহারা কাজ না করিয়াও পারে। কিন্তু আর সব হাড়-ভাঙগা খাটুনি খাটে। উৎপাদন সম্পর্ক বদলাইয়া যায়। সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনশক্তির কিরূপ বিকাশ হইয়াছে, তাহার সঙেগ সামঞ্জস্য রাখিয়াই গড়িয়া উঠে উৎপাদন সম্পর্ক। কিন্তু এই সামঞ্জস্য বেশী দিন থাকে না। যতই উৎপাদনশক্তির বিকাশ হয় ততই উৎপাদন সম্পর্কের সঙেগ উহার বিরোধ বাধে। একটা সময় আসে যখন উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনশক্তির বিকাশের পথে বাধা জন্মায়। ইহাই সমাজবিপ্লবের অবস্থা। তখন সমাজে যে-শ্রেণী পরিবর্তনবিরোধী এবং যে-শ্রেণী পরিবর্তনপ্রয়াসী তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সে সময়ের অবস্থায়, যাহারা পরিবর্তন চায় তাহারাই বৈপ্লবিক শ্রেণী। সামন্ত-তন্ত্রের শেষ দিকটায় সদ্যোজাত বুর্জোয়া শ্রেণীই ছিল বৈপ্লবিক; ইহারাই সামন্ততন্ত্রের সমাজকাঠামো ভাঙিগয়া দিয়া পুঁজিতন্ত্রের জন্ম দেয়। আবার আমাদের চোখের সামনেই দেখিতেছি—পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনশক্তির এতবড় বিরাট পরিবর্তন হয়, এবং এত বেশী বিকাশ হয় যে পুঁজিতন্ত্রের কাঠামো ইহাকে সামলাইতে পারে না; নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক বাধা জন্মায়। এই রকম সমাজ-বিপ্লবের অবস্থায় সমাজে বৈপ্লবিক শ্রেণী সর্বহারা শ্রমিক। নূতন সমাজের অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের জন্ম দেয় সর্বহারা শ্রমিকের বিপ্লব।

অতএব, আমরা পরিষ্কারই দেখিলাম—উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ বাধে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রকাশ। ইতিহাসের ধারায় এবং সমাজের বিকাশের পথে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে শ্রেণীসংগ্রাম।

শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বই সমাজের বিকাশের সূত্র। এই সূত্রটি ধরিয়াই আমরা সমাজের বিভিন্ন রূপগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ রচনায় মার্কসবাদের মূলগ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহাছাড়া, এদেশের এবং বিদেশের বহু মনীষি-ব্যক্তির লেখারও সাহায্য লইতে হইয়াছে।

এই বই লেখায় আমাকে যাহারা সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সকলের আগে নাম করিতে হয় শ্রদ্ধাস্পদ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ এবং কমরেড সুরেন দত্তের। বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করায় একান্তভাবে সাহায্য করিয়াছে পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমোদরঞ্জন বর্মন। আরও অনেক বন্ধু নানারকমে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের সকলের নিকট ঋণ স্বীকার করি।

প্রতাপপুর
চীনসুরা
২০শে ফাল্গুন,
১৩৫৩।

সূচী

	পৃষ্ঠা
আদিম সমাজের গড়ন	১
ভাষা ও ধর্মের উৎপত্তি	১৫
পরিবারের উৎপত্তি	২০
সভ্যতার উন্মেষ	২৪
প্রাচীন সভ্যতার শ্রেণীরূপ	২৮
গ্রীসে দাসত্বপ্রথা	৫০
এথেনীয় রাষ্ট্র ও সমাজ	৫৯
গ্রীকরাষ্ট্রের পতন	৬৮
রোমান রাষ্ট্রের উত্থান	৭৪
রোমান সাম্রাজ্যের পতন	৮৩
সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি	৯৮
সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য	১০৩
সামন্তযুগে শিল্প ও বাণিজ্য	১১৩
সামন্তযুগে শ্রেণী সংগ্রাম	১১৯
পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষ	১২৯
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ	১৩৪
ষোলশতকের কৃষকযুদ্ধ	১৩৯
ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব	১৪৪
ফরাসী বিপ্লব	১৫৩
বুর্জোয়ার উত্থান সম্পর্কে—এঙ্গেলস্	১৫৯
পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ	১৬৩
ভারতে ইংরাজ	১৭৪
শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব	১৮০
সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সংকট	১৯৩
সোভিয়েট ও সমাজতন্ত্র	২০৪

আদিম সমাজের গড়ন

প্রত্যেক জীবই জীবনকে পরিপূর্ণরকমে ভোগ করিতে চায়। প্রত্যেক জীবই নিরাপদে বসবাস করিতে চায়। বাঁচিবার এই সংগ্রামে কত জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। মানুষের দৈহিক গঠন অন্যান্য জীবের চেয়ে উন্নত; তাই প্রতিকূল প্রকৃতির রাজ্যে তাহার বাঁচিবার সংগ্রাম কতকটা সহজতর হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহায়তায়ই নয়, কৃত্রিম উপায়েও সে তাহার অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। মানুষ তাহার স্বাভাবিক হাতের পরিপূরকরূপে কৃত্রিম হাতের ব্যবহার সুরু করে; এই কৃত্রিম হাতই হাতিয়ার।

পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, হাইডেলবার্গ মানবজাতির মধ্যে হাতিয়ারের বড় একটা ব্যবহার ছিল না। হাতে যে সব খাদ্য আহরণ করা যায় তাহাই তাহারা খাইত। সম্ভবত হাইডেলবার্গ মানুষ এবং তাহার পূর্বপুরুষ নর-বানর লাঠি এবং পাথরের বেশী অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করিতনা। লাঠি এবং হাতিয়ারও আবার,—প্রকৃতির ক্রোড়ে তাহারা যেভাবে পাইত,—সেইভাবেই কুড়াইয়া লইত; উহাতে কোন অদল-বদল করিত না।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বরফের রাজত্বের মাঝখানটাতে মানুষ পশুর জীবনই যাপন করিত; কেননা তখন বিশেষ ধরনের কোন হাতিয়ার তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ ছিল অসহায়; তাই সে সময়কার মানুষ পশুর জীবনের বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। যখন হইতে মানুষ হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে সুরু করিয়াছে, তখনই দেখা দেয় মানুষের জীবনে পরিবর্তন। তৃতীয় এবং চতুর্থবারের বরফের রাজত্বের ফাঁকটাতে প্রথম হাতিয়ার তৈয়ারী হয়। সে যুগের মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে পুরাতত্ত্ব-বিদেরা মানুষের তৈয়ারী হাতিয়ার আবিষ্কার করেন।

মানুষ প্রথমত কতকগুলি পাথর নেয় পছন্দমতো; অন্য পাথরে ঘসিয়া তাহা মসৃণ করে; যেন আঘাত করা বাদেও এই ধারাল পাথরে কোন কিছু কাটা কিংবা চাঁছা যায়। প্রথম পাথরের হাতিয়ার নির্মাণ করিতে মানুষ ব্যবহার করে চকমকি পাথর; সহজে ইহা ভাঙ্গা যায়, সহজে শানান যায়।

মানুষের বানানো প্রথম পাথরের হাতিয়ার দেখিতে অনেকটা বাদামের মতো; অনেক কাজেই উহা লাগে। হরিণ শিকার করা যায়, ঘা মারা যায়,

কোন কিছু কাটা যায়। পরে কাঠের হাতল লাগাইয়া উহাকে আরও উন্নত করা হয়। পাথরের তৈয়ারী কাটারি মানুষকে আরও এক ধাপ আগাইয়া দেয়। হাতে যে সব খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা ছাড়াও হরিণ এবং অন্যান্য জন্তু শিকার করা সম্ভব হয়। উৎপাদন কতকটা সহজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রাও কিছুটা স্বচ্ছন্দ হয়। মানুষ এখন শিকার করে, সুতরাং এখন আর সে-পশুর স্তরে নয়। এখন মানুষ উৎপাদন কার্যের জন্য ছোট ছোট দল গড়ে। আদিমকালে যে সব জায়গায় মানুষের বসতি ছিল, পুরাতত্ত্ব-বিদেরা সেখানে পশুর হাড়-গোড় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই হাড়-গোড় হয় বুড়ো কিংবা শিশু পশুর। শিকারী হয়ত পশুর পালের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে দুর্বল তাহাদের চেষ্টা করিত দল হইতে তফাত করিয়া ফেলিতে। ইহাদের ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়াই শিকারীদের ঝোঁক ছিল সেগুলির দিকেই বেশী।

শিকারে বাহির হইত বয়স্ক পুরুষেরা। খাদ্য আহরণের কাজ হইতে ইহারা ছুটি লয়; এখন একাজ মেয়েদের। মেয়েরা ঘরে থাকিত; শাকসবজি ও ফলমূল আহরণ, খাবার তৈয়ারী, এবং শিশুর যত্নই ছিল মেয়েদের প্রধান কাজ। পশুর মাংস কাঁচাই খাওয়া হইত বেশী, কিছুটা হয়ত শুকাইয়া রাখা হইত। এইভাবে দেখা দেয় শ্রম-বিভাগ; মানুষের সমাজে প্রথম শ্রমবিভাগ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে।

শিকারে যাহা পাওয়া যাইত এবং মেয়েরাও যাহা সংগ্রহ করিত, সবই ছিল সকলের সম্পত্তি; সকলে মিলিয়া খাইত। হাতিয়ারগুলি ছিল যার যার সম্পত্তি। অবশ্য সাময়িক কাজের জন্য একে অন্যের হাতিয়ার ব্যবহার করিতে পারিত। এইভাবে আদিম শিকারীদের ছিল যৌথজীবন। যৌথ-জীবনের ভিত্তি ছিল সমতা। পুরুষেরা সকলে মিলিয়া শিকার করিত। খাদ্য একসঙ্গেই রান্না হইত; সকলকে তাহা সমানভাবে পরিবেশন করা হইত। এখানে লক্ষ্য করা দরকার,—যদিও এইরূপ যৌথজীবনের ভিত্তি ছিল সাম্য, তবুও তখনকার সমাজ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র; প্রকৃতিকে বশে আনার ক্ষমতা তাহাদের প্রায় ছিলই না।

যৌথসমাজগুলি ছিল খুবই ক্ষুদ্র; গুটিকয়েক লোকের এক একটি সমাজে লোকের সংখ্যা ত্রিশ কি চল্লিশ। শিকারের সময়ে অভিজ্ঞ কাহাকেও দলের নেতা নিযুক্ত করা হইত। সাময়িকভাবে একাধিক যৌথসমাজ একত্র হইত। খুব বড় একটা শিকার পাইলে তাহারা একসঙ্গে মিলিয়া উহা খাইত। কোন শ্রমসাধ্য কঠিন শিকার ধরিতে হইলেও তাহারা মিলিত। বুড়োদের অথবা যাহারা দুর্বল এবং অকর্মণ্য তাহাদের অনেক সময় উপেক্ষা করা হইত। কেননা, খাদ্যের পরিমাণ ছিল সব সময়ই অপ্রচুর। যৌথসমাজ-

গুলির অনেক সময়ই উপবাসে কাটিত, কারণ খাদ্যের যোগান ছিল অনিশ্চিত; সকল সময় শিকার মিলিত না।

এই আদিমবাসীদের স্থায়ী কোন বাসস্থান ছিল না; গাছেই তাহারা রাত কাটাইত। সম্ভবত গাছে চড়ায় মানুষ তাহার পূর্বপুরুষদের মতই পটু ছিল।

আদিম সমাজের লোকেরা ক্রমে নূতন হাতিয়ার তৈয়ার করিতে শিখে। পাথরের বর্শা, কোদাল এবং কাঠের ধনুক ও তীর আবিষ্কার করে। বর্শার দ্বারা শিকার করা এখন সহজ হয়। তীর ছুঁড়িয়া পাখী শিকার করাও সহজ হয়। এইভাবে এক এক রকম কাজের এবং উৎপাদনের জন্য বিশেষ ধরনের হাতিয়ার তৈয়ার হয়। জীবনযাত্রার কঠোরতাও কতকটা কমে।

নিয়েনডারথেল মানুষ আগুন ব্যবহার করিত। ছাই, কয়লা, পোড়া-হাড়গোড় প্রভৃতির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই আগুন তাহারা তড়িতাহত গাছ কিংবা দাবানল হইতে সংগ্রহ করিত; নিজেরা তখনও আগুন উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করে নাই। আগুন তাহারা নিভিতে দিত না; দৈনন্দিন কাজের জন্য কাঠের পর কাঠ পুড়াইয়া তাহা রক্ষা করিত। রাত্রিতে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে পারিত; তাই বন্যজন্তুর উপদ্রবের মধ্যেও তাহারা নিরাপদে বাস করিত।

নূতন নূতন হাতিয়ারের এবং আগুনের ব্যবহার আদিম মানুষের জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন আনিয়া দেয়। মাংস আর এখন কাঁচা খাইতে হয় না; পুড়াইয়াই খাওয়া যায়। নূতন হাতিয়ারের সহায়তায় মানুষ বাসস্থান তৈয়ার করে; এমনকি পরিধেয় আচ্ছাদনও বানায়।

নিয়েনডারথেল মানুষেরা প্রায় উলঙ্গই থাকিত; তখন জলবায়ু উষ্ণ ছিল। কোনরূপ আশ্রয় অথবা আচ্ছাদনের প্রয়োজন বোধ করিত না। শীতের সময় তাহারা গা ঢাকিত পশুর চামড়ায়। চতুর্থবারের বরফের রাজত্ব হইতে শীতের প্রকোপ হয় প্রচণ্ড; তখন বাসস্থান ছাড়া উপায় নাই। তাই তাহারা গুহায় বাস করিতে থাকে; হাজার হাজার বছর মানুষ গুহাবাসী হইয়াই কাটায়। যেখানে পাহাড় নাই,—যেমন রুশিয়ায়,—মাটি খনন করিয়া মাটির কুটির বানাইত সেখানে। বৃষ্টি ও বরফ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপরে একটা আচ্ছাদন দেওয়া হইত। পুরাতত্ত্ববিদেরা ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে পাহাড়ের গায়ে সেকালের মানুষের আবাস আবিষ্কার করিয়াছেন।

নূতন হাতিয়ারের আবিষ্কার এবং নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন আনে। নূতন হাতিয়ার এবং নূতন কৌশলের সহায়তায় শিকারীরা এখন অনেক বেশী শিকার ধরিতে পারে। কিন্তু যদি ফাঁদ, বেষ্টনী, গর্ত ইত্যাদির সাহায্যে বড় শিকার ধরিতে হয়, তবে তাহা

কখনও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একটি সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, প্রতিবেশী যৌথসমাজগুলি জোট বাঁধে। প্রথমটায়, এইরকম জোট ছিল সাময়িক, পরে তাহা স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে পাঁচটি কি ছয়টি ছোট যৌথসমাজের সমবায়ে গড়িয়া উঠে গোষ্ঠী*; উহার অন্তর্ভুক্ত একক সমাজগুলিকে বলা হইত টোটেম। আঠার শতকের শেষের দিকেও পর্যটকেরা উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এইরূপ টোটেম-সমাজ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার শিকারীদের সমাজে টোটেম-ব্যবস্থার কথা আমরা জানি। ঊনিশ শতকের মাঝের দিকেও তাহারা পাথরের হাতিয়ারই ব্যবহার করিত।

প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই একটি নির্দিষ্ট স্থান জুড়িয়া শিকার করিত; এখানে অন্য কোন গোষ্ঠীরই শিকারের অধিকার থাকিত না। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শিকারভূমি লইয়া ঝগড়া বাধিত; হয় তাহারা যুদ্ধ করিত, অথবা আপসে মিটাইয়া লইত। গোষ্ঠী কোন একটি নূতন জায়গা দখল করিলে, টোটেমগুলির মধ্যে তাহা বিলি করিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেকটি টোটেমই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে শিকার করিত। কোন এলাকায় বড় কোনও শিকার আসিলে,—যেমন একপাল হরিণ—গোষ্ঠীর সকল টোটেমকেই খবর দেওয়া নিয়ম ছিল। সকলে মিলিয়া শিকার করিত, এবং শিকার সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত।

প্রত্যেক টোটেমেরই নিজস্ব কোন নাম থাকিত; কোননা কোন পশুর নামে নামকরণ হইত। শিকারের সময় টোটেম নেতা নির্বাচন করিয়া লইত। নেতা হাড়ের তৈয়ারী, চিত্রাঙ্কিত মুগুর লইয়া আগে আগে যাইত। এই নেতা ছাড়াও সর্বদার জন্য একজন সর্দার থাকিত। সাধারণত, সর্দার ঠিক করা হইত বৃদ্ধদের মধ্য হইতে।

এখন আর বৃদ্ধদের আগের মত উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বরং তাহাদেরই সবার অধিক সম্মান ছিল। বৃদ্ধদের বিশেষ কাজ ছিল হাতিয়ার তৈয়ারী। তাহা ছাড়া, ইহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি; শিকারের সকল কৌশলই ইহাদের আয়ত্ত। বৃদ্ধরা যুবকদের শিকারবিদ্যায় শিক্ষা দিত; এই কারণেই সমাজ বৃদ্ধদের বিশেষ রকম যত্ন লইত।

প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই বৃদ্ধদের একটা কাউন্সিল থাকে। শিকার, প্রতিবেশীর সংগে সম্পর্ক, শিকারের জায়গা নির্ধারণ, স্থানান্তর গমন—কাউন্সিলে এসকল প্রশ্নের আলোচনা হইত। গোষ্ঠীর সাধারণ সভায় বৃদ্ধদের কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত জানান হইত। বৃদ্ধদের এই আলাদা দল কিন্তু আজিকার অর্থে কোনরূপ শ্রেণী নয়। শিকারভূমি কিংবা হাতিয়ারের উপর

---

* Tribe

বৃদ্ধদের কোনরূপ স্বত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে তাহারা মাত্র নেতৃত্বের অধিকার-ই অর্জন করে। অবশ্য শিকারের ভাল অংশটা তাহাদের প্রাপ্য ছিল। সে সময়কার সমাজে এইটুকুই ছিল বৃদ্ধদের বিশেষ-অধিকার।

টোটেমসমাজেই বিবাহকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনে। আদিম শিকারী সমাজে যে-কোন পুরুষ যে-কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে পারিত। বিবাহ ছিল স্বাধীন, অবাধ; যে কোন সময় বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারিত। পুরুষ ইচ্ছা করিলে একাধিক নারীকে বিবাহ করিতে পারিত; যে কোন মেয়েও একাধিক পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত। বৃদ্ধরা নির্দেশ দিল এবং কানুন প্রণয়ন করিল—একই টোটেমের স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহ হইতে হইবে দুই টোটেমের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে। এইভাবে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত টোটেমের অভ্যন্তরে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন হয়। টোটেম এখন শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ায়। পরিবারের বিকাশ সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করিব।

ইওরোপের এখন যে জলবায়ু তাহা দেখা দিয়াছে চতুর্থবার বরফের রাজত্বের পর। এই বরফের রাজত্বের সময় অতিকায় জন্তুগুলি নির্বংশ হয়, আবার অনেক জন্তু এশিয়া এবং আফ্রিকায় চলিয়া যায়। উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বভাবতই পরিবর্তন দেখা দেয়। এখন শিকার পাওয়া যায় কম; কিন্তু মৎস্য প্রচুর। বরফ গলায় অসংখ্য হ্রদের সৃষ্টি হয়। চারিদিকে জল; সুতরাং জঙ্গলে ঘুরা-ফিরা সম্ভব নয়। তবে, এই নূতন অবস্থায় আদিম মানুষ মৎস্যশিকারের সুবিধা পায়। বহু যৌথসমাজই পশুশিকার ছাড়িয়া মৎস্য-শিকার করিতে থাকে। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনেক জায়গায়ই মৎস্য এবং জলজ-প্রাণীর কঙ্কালের বিরাট স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন।

আদিম মানুষ এখন আর শিকারী নয়, জেলে। এই পরিবর্তন আদিম-মানুষের জীবনের ধারা বদলাইয়া দেয়। না ঘুরিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া এবং একস্থানে আবদ্ধ থাকিয়াই এখন তাহারা খাদ্য আহরণ করিতে পারে। মাছ পাওয়া যায় নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতেই। শিকারের জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে দৌড়াইতে হয়, ঘুরিতে হয়; কিন্তু মাছ ধরার জন্য তাহা করিতে হয় না। অতএব, না ঘুরিয়া একজায়গায় স্থায়ীভাবে বসতি করার সুবিধা হইয়াছে। ইহার একটা ভাল ফলও দেখা গেল। আদিম মানুষ কৃষির এবং পশুপালনের কৌশল বাহির করে। মানুষের যাযাবর জীবনে যবনিকা পড়িতেই তাহারা চিন্তা করিতে থাকে, কিরূপে এই নূতন অবস্থার মধ্যে শাকশব্জী ও মাংসের নিয়মিত যোগান পাওয়া যায়। কৃষি এবং পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন হাতিয়ারেরও উদ্ভব হয়।

সেকালের জেলেদের কুটির এবং নৌকা তৈয়ারীর জন্য দরকার হয় গাছ কাটার ও চেরার হাতিয়ার। আগেকার চকমকি পাথরের হাতিয়ারে এখন আর

কাজ হয় না। এই পাথর হইতে একমাত্র গাছ চেরার জন্য করাতই বানান যাইত। প্রয়োজনের তাগিদে মসৃণ পাথরের কুড়াল ও ছুরি তৈয়ার হইল।

এক জায়গায় স্থির হইয়া বসায় মেয়েদের আর এখন ফলমূল ও শাক-সবজির জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরিতে হয় না। তাহারা মাটি খুঁড়িয়া আলু, কচু প্রভৃতি উদ্ভিদমূল সংগ্রহ করিত এবং নিজেদের কুটিরের নিকটে সেগুলি পুঁতিয়া দিত। এইভাবে হয় কৃষির সুরু। কৃষির প্রথম হাতিয়ার নিড়ানি।* মাটি খুঁড়িবার জন্য আগেকার কাঠের হাতিয়ার এখন অচল। ছোট কোদালের মত ধারাল চকমকি পাথর কাঠের হাতলে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, উহাই নিড়ানি। শাকশব্জী ছাড়াও এখন এই হাতিয়ারের সাহায্যে শস্যাদির চাষের সুবিধা হয়। বনে যে বার্লি, গম, জোয়ার আপনা হইতে জন্মিত নিয়েনডারথেল মানুষ পূর্বে তাহাই আহরণ করিত। মেয়েরা এখন নিড়ানির সাহায্যে জমি তৈয়ার করিয়া এই সব শস্য বুনিতে থাকে। এখন যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ পূর্বের সংগ্রহ করা শস্যের চেয়ে অনেক বেশী।

পশুপালনেরও সুরু তখন হইতেই। নিয়েনডারথেল মানুষের সঙ্গে কুকুর থাকিত; কিন্তু এই কুকুর যে তাহারা ইচ্ছা করিয়া পালন করিত, মনে হয় না। সম্ভবত, কুকুর নিজে হইতেই মানুষের সঙ্গী হইয়াছিল। শূকর, মেষ এবং ছাগই প্রথম গৃহপালিত পশু। শূকরের মাংস সুস্বাদু। মেষ ও ছাগের মাংস যে শুধু খাইতেই ভাল তাহা নয়, উহাদের লোমে ভাল আচ্ছাদনও তৈয়ার হয়। গরু গৃহে পালিত হয় অনেক পরে হইতে।

কৃষি এবং পশুপালন হইতে অনেক রকম কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা হয়। সেগুলিকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রয়োজন হয় নূতন রকম জিনিসের। এ সময়ই তৈয়ার হয় মাটির বাসন। গম, বার্লির বাড়তি অংশ কোন কিছুর মধ্যে রাখা দরকার, তাই মাটির বাসনের চাহিদা হয়। পরে এইসব পাত্রেই রান্না করার রীতি হয়। প্রথম এই সব মাটির বাসন দেখিতে সুদৃশ্য ছিল না; কিন্তু কালক্রমে যখন বাসন তৈয়ারীর জন্যে পাথরের চাকা ব্যবহৃত হইতে থাকে, তখনই ইহাদের আকার সুন্দর হয়।

মাটির বাসন প্রথম মেয়েরাই তৈয়ার করে; তাহারাই আবার সুতাকাটা এবং কাপড় বুনার কৌশলও বাহির করে। এইজন্য প্রথম শনের ব্যবহার করা হইত। মেয়েরা শনের বীজ সংগ্রহ করিত খাওয়ার জন্য; কিন্তু পরে তাহারা বার্লি, গমের সঙ্গে সঙ্গে শণেরও চাষ করিতে থাকে। কি করিয়া প্রথম জানা গেল যে শণের বোঁটা হইতে সুতার আঁশ হয় এবং উহা হইতে কাপড় বুনা যায়, তাহা বলা শক্ত। পুরাতত্ত্ববিদেরা খুব পুরাতন চরকা ও টাকু

* Hoe

আবিষ্কার করিয়াছেন। আগুনও তখন প্রকৃতির নিকট হইতে না লইয়া সে কালের মানুষ নিজেরাই তাহা উৎপাদন করিতে শিখিয়াছে। এক টুকরা খুব শুকনো কাঠ লওয়া হয়; উহাতে ছোট একটি ছিদ্র করা হয়; ঐ ছিদ্রের মধ্যে কাঠের গুঁড়া ছড়াইলেই কাঠ শীঘ্র গরম হইতে থাকে এবং আগুনের কণা দেখা দেয়। উহাতে হাওয়া করিয়া জ্বলন্ত আগুন উৎপাদন করা যায়।

মৎস্যশিকার, কৃষিকার্য এবং একজায়গায় থাকিয়া জীবিকা অর্জনের চেষ্টা মানুষের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, শ্রমবিভাগ এখন পূর্বের চেয়ে জটিল হইয়াছে; সমাজের আভ্যন্তরিক গড়ন পরিবর্তিত হইয়াছে।

স্থায়ী বসতি হওয়ায় পরিবারের বন্ধন দৃঢ় হয়। শিশুরা মায়েদের নিকটই থাকিত এবং মায়েদের নিকট থাকিয়াই বড় হইত। একই টোটেমের মেয়ে এবং ছেলে পরস্পরকে বিবাহ করিতে পারিত না। বিবাহের পরই যে টোটেমে বিবাহ হইত সেই টোটেমে পুরুষ চলিয়া যাইত। কোন পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিত, তবে সে পুনরায় তাহার নিজের টোটেমে ফিরিয়া আসিত; স্ত্রী আবার বিবাহ করিত। টোটেমে গোত্র সম্বন্ধ মায়ের দিক হইতে ঠিক হইত। এইভাবে টোটেমে মাতৃ-কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়; এ সময়ের টোটেম-সমাজকে বলা হয় মাতৃ-কেন্দ্রিক সমাজ।

মেয়েরা যখন কৃষি ও কাপড় বুনন আবিষ্কার করে এবং নিজেদের শ্রমদ্বারা এইসব কাজ করিতে থাকে, তখন হইতেই পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শিকারী সমাজে মেয়েরা ছিল পুরুষের সহকারী, এখন তাহারা স্বাধীন কর্মী। মুখ্য উৎপাদন কার্যগুলিই যে শুধু মেয়েদের হাতে ছিল তাহা নয়, সামাজিক ব্যাপারেও তাহাদের হাত ছিল যথেষ্ট। সমাজের নায়ক অবশ্য পুরুষদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইত, কিন্তু মেয়েদের সম্মতি ব্যতীত তাহা হইতে পারিত না। গৃহকার্যে প্রধান অংশ ছিল মায়ের। যে সব যুবক অপরিণতবয়স্ক—শিকার কিংবা মাছ ধরায় যাইতে পারিত না—মা তাহাদের কাজ কর্ম ঠিক করিয়া দিত। যুবতী মেয়েরা সকলের জন্য যে খাবার তৈয়ার করিত, তাহার নির্দেশ দিত মা; ভাঁড়ারঘরেরও ভার ছিল মায়ের।

বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মর্গান আমেরিকার ইরকয়দের মধ্যে এইরূপ মাতৃ-কর্তৃত্ব দেখিয়াছেন ঊনিশশতকের মধ্যভাগেও। মেয়েরা কৃষির কাজ করে, পুরুষ শিকারে যায়। ইরকয়রা আটটি মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে বিভক্ত; প্রত্যেকটিরই কোন না কোন পশুর নামানুসারে টোটেম-নাম ছিল। প্রত্যেকটি পরিবারই দুইটি বাড়িতে বাস করিত;—মেয়েরা ও তাহাদের শিশুরা এক বাড়িতে, এবং পুরুষরা অন্য বাড়িতে। শিকার এবং যুদ্ধের সময় একজন সর্দার নিযুক্ত করা হইত, তাহাকে বলা হইত সাহেম। মর্গানের সময়ে অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের

মধ্যেও সামাজিক সংগঠন এই রকমই ছিল। আজও মালয়ে এবং আফ্রিকার সুদানে এইরকম সমাজ দেখা যায়।

মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে সকলে মিলিয়া উৎপাদন করিত। পুরুষেরা একত্রে মাছধরায় যাইত। মেয়েরা সকলের সমবেত শ্রমদ্বারা চাষ করিত, জমি তৈয়ার করিত, বীজ বুনিত এবং ফসল কাটিত। যে খাদ্য তৈয়ার হইত তাহা সকলে মিলিয়া খাইত। উৎপাদন যতই জটিল হইতে থাকে, শ্রমবিভাগও ততই বাড়ে; উৎপাদনের হাতিয়ারও নানারকমের তৈয়ার হয়।

কৃষিকার্যে নিড়ানির ব্যবহার হওয়ায় মানুষের রুটি খাওয়ার সুযোগ হয়; কেননা নিড়ানি দ্বারা বার্লি, গম প্রভৃতির চাষ সহজ হইয়াছে। শণের চাষ হইতে সূতাকাটা এবং কাপড় বুনার সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু তবুও নিড়ানি দ্বারা সব রকম খাদ্যের চাষ সম্ভব নয়। নিড়ানি দ্বারা বিস্তৃত জায়গা চাষ করা যায় না, সুতরাং বড় আকারে কৃষিও হয় না। কৃষি উৎপাদনের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করে, যখন লাঙ্গলের আবিষ্কার হয়। প্রথম লাঙ্গল কাঠের, উহার ফলা পাথরের। বলিতে গেলে, আগেকার নিড়ানিই—তবে একটু বড় আকারের। পাঁচ সাত জন লোকে কাঠের হাতল ধরিয়া টানে, পরে যখন শিং-ওয়ালা পশু গৃহে পালিত হয়, তখন ষাঁড় দিয়া লাঙ্গল টানা হইতে থাকে। লাঙ্গলে বিস্তৃত ভূমি চাষ হয়; অতএব শস্যও অনেকরকমের উৎপাদন হইতে থাকে। এখন বেশী পরিমাণে শণের চাষ সম্ভব হয়; কাপড়ও তৈয়ারী হইতে থাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী।

লাঙ্গল দিয়া কৃষিকার্য পরিচালনায় পুরুষকেই অংশ নিতে হয় বেশী। চাষের মরশুমে বলিষ্ঠ লোকেরাই লাঙ্গল টানিয়া জমি চাষ করিত। এদিকে শিকারী-ও আবার পুরুষেরাই; পুরুষই প্রথম পশু জীবন্ত ধরিয়া আনিয়া গৃহে প্রতিপালনের কৌশল বাহির করিয়াছিল। অতএব, আমরা দেখিতেছি, কৃষির গোড়ার দিকে নিজেরা লাঙ্গল টানা; পরে গৃহপালিত পশুদ্বারা লাঙ্গল টানানো—এগুলি পুরুষেরই কাজ ছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইত, বড় বড় গাছ উপড়াইতে ও কাটিতে হইত। এগুলি পুরুষের কাজ, মেয়েদের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। শস্য মাড়ানোর জন্যও পুরুষের শ্রমের দরকার।

লাঙ্গলের ব্যবহার সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে পুরুষের শ্রমের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। ফলে মায়ের কর্তৃত্ব কমিতে থাকে; পুরুষের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারে পরিণত হয়। পারিবারিক জীবন এখন স্থায়ীরূপ গ্রহণ করে। কৃষি-উৎপাদনে পুরুষই এখন প্রধান; পরিবারেও স্ত্রী এবং সন্তানদের পুরুষই চালায়; গৃহকার্য পুরুষের নির্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হয়। এখন আর পুরুষ এক টোটেম হইতে অন্য টোটেমে ঘুরিয়া বেড়ায় না; এবং বারবার স্ত্রীও পরিবর্তন করে

না। মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে স্থায়ীভাবে থাকিত মেয়েরা এবং তাহাদের শিশুরা। কিন্তু পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার বৃহৎ সম্প্রসারিত পরিবার; ছেলেরা বিবাহের সময়ে পিতাদের নিকট হইতে আলাদা হইয়া যায় না। বিবাহ হয় অন্য টোটেমেই বটে, তবে স্ত্রীকে নিজের টোটেম ছাড়িয়া স্বামীর টোটেমে চলিয়া আসিতে হয়, এবং স্থায়ীভাবে উহাতে বাস করিতে হয়। একটি পিতৃ-কেন্দ্রিক পরিবারে হয়ত পাঁচ ছয় পুরুষের লোক বাস করে। এক পরিবারে একশ'র উপরেও লোক থাকিত। তিন কি চার পুরুষেরও ছোট পরিবার থাকিত, উহার লোকসংখ্যা ত্রিশ কি চল্লিশ। বেশী লোকের একটা পরিবার বেশীদিন একসঙ্গে থাকিতে পারিত না: উহা হইতে ছোট ছোট পরিবার বাহির হইয়া যাইত। এই নূতন পরিবারগুলি মূল পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিত। এইভাবে গড়িয়া উঠিত গুটিকয়েক পরিবারের একটা জোট, অথবা পরিবার সংঘ।

গোত্রসম্বন্ধ প্রথমটায় মায়ের দিক হইতেই পরিগণনা করা হইত; ধীরে ধীরে এই রীতির লোপ হয়। একমাত্র পিতার দিক হইতেই গোত্রসম্বন্ধ ও বংশানুক্রম ধরা হইতে লাগিল। কালক্রমে, উৎপাদনকার্য ও পরিবার পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি রীতি স্থির হয়; উহাদ্বারাই পারিবারিক জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।

কৃষির জন্য প্রত্যেকটি পরিবারের পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট থাকিত। পরিবারের স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া জমিতে কাজ করিত। ফসল কৃষির যন্ত্র, পশু—সবই পরিবারের যৌথসম্পত্তি। পরিবারের কর্তা পিতামহ অথবা প্রপিতামহ। কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়ার জন্য পরিবারের কর্তারা পরামর্শ করিত; অনেক সময় আলোচনার জন্য সকলের সভাও ডাকা হইত।

সকল আদিম শিকারী-সমাজই যে শিকার ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছিল তাহা নয়, কতকগুলি সমাজের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুপালন। যে সব জায়গায় প্রাকৃতিক অবস্থা কৃষিকার্যের অনুকূলে ছিল না,—যেমন জলা জায়গা—অথচ পশুপালনের উপযোগী,—সেখানেই এইরূপ উৎপাদন বিকাশ লাভ করিয়াছিল। পশুর জন্য প্রয়োজন হইত চারণভূমি। যত বেশী পশু, তত বিস্তৃত হওয়া চাই এইরূপ স্থান। জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় পশু চরার জায়গা মিলা শক্ত, তাহা ছাড়া হিংস্র জন্তুর ভয়ও ছিল। এদিকে বিস্তৃত খোলা জায়গায় কিংবা পাহাড়ের সানুদেশে ঘাসের অভাব নাই; সে সব জায়গাই পশুপালনের জন্য প্রশস্ত। পশুপালকদের এক একটি দলের থাকিত হাজারে হাজারে পশু। ইহারা অনেকটা যাযাবরের জীবন যাপন করিত; এক জায়গার ঘাস ফুরাইলেই তাহারা অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করিত।

পশুপালন হইতে আদিম মানুষ প্রচুর দুধ, মাংস, লোম, চামড়া প্রভৃতি

পাইত; অতএব জীবিকা সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু শাকসবজি ও কৃষিজাতদ্রব্য সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত হইতে পারে নাই। এজন্য অনেক পশুপালক সমাজ কৃষিও কিছু কিছু করিত। অবশ্য উত্তরপূর্ব ইওরোপের তুন্দ্রা অঞ্চলে এবং আরবের মত মরুভূমির দেশে একমাত্র পশু-পালনই সম্ভব হইত। কোন কোন পশুপালক-সমাজ কৃষিকার্য করিলেও কৃষি তাহাদের মুখ্য বৃত্তি ছিল না; সুতরাং যে খাদ্যশস্য তাহারা পাইত, তাহা যথেষ্ট ছিল না। প্রতিবেশী সমাজের নিকট হইতে তাহারা প্রয়োজনানুরূপ শস্য সংগ্রহ করিত।

এই ভাবেই বাণিজ্য-বিনিময়ের সুরু। যে সব সমাজ কৃষি করিত তাহাদের পশম, পশমজাতদ্রব্য, হাড় এবং শিংয়ের তৈয়ারী জিনিস ছিল না। যে সব সমাজ পশুপালন করিত তাহাদের শস্যের অভাব ছিল। অতএব, এক-সমাজ অন্যসমাজ হইতে নিজেদের উৎপাদনের বাড়তি অংশের বিনিময়ে যে জিনিসের তাহাদের প্রয়োজন তাহা লইত। কিন্তু উৎপাদন যেমন ছিল যৌথ, বিনিময়ও ছিল যৌথ; ব্যক্তিগতভাবে কেহ বিনিময় করিতে পারিত না; বিনিময় হইত সমগ্রভাবে সমাজের সঙ্গে সমাজের।

প্রধানত বিনিময়ের জন্য আগাইয়া আসিত পশুপালক সমাজ-ই। মরুভূমি অঞ্চলের পশুপালকেরাই ব্যবসায়ে মন দেয় আগে। সমাজে বিনিময়ের প্রবর্তন হওয়ায় অনেকরকমের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। বিনিময়ে কতকগুলি পরিবার ধনী হইল; অনেক পরিবারের মধ্যেই ধনের লোভ সঞ্চার হইল।

পশুপালন মায়ের কর্তৃত্বের জায়গায় পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পশু ধরিয়া আনা, পালন করা, বাণিজ্য করা—এ'সব পুরুষের কাজ। পুরুষ মেষ, গরু ইত্যাদি চরাইত; হিংস্র বন্য জন্তুর কবল হইতে উহাদের রক্ষা করিত। মেয়েদের ছিল হাল্কা কাজ; পশম কাটা, সুতা কাটা, সেলাই ও খাবার তৈয়ারী। মেয়েদের ভাবা হইত তাহারা পুরুষের সহকারী। পুরুষ এইরকম একাধিক সহকারী চাহিত; এই কারণেই পশুপালক সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। এইসব সমাজে পরিবারের লোকসংখ্যা খুব বেশী। পরিবারের প্রধান, বৃদ্ধ-পিতামহ অথবা প্রপিতামহ। পশুগুলি পরিবারের যৌথ সম্পত্তি। বড় পরিবার হইতে ছোট ছোট পরিবার বাহির হইয়া গেলে, উহাদের সকলকে লইয়া একটা 'পরিবার সংঘ' গঠিত হইত; এই সংঘের সকল পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্য বাঁটিয়া দেওয়া হইত। যখন স্থানান্তরে যাইত, একক পরিবারগুলি স্ব স্ব শিবির স্থাপন করিত; প্রত্যেকটির থাকিত পৃথক গৃহস্থালি।

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়তি অংশও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বাড়তি অংশ মজুতও করা যাইতে পারে, বিনিময়ও

করা যাইতে পারে। ধাতুর ব্যবহার যখন হইতে আরম্ভ হয়, বাড়্তি অংশের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

পাথর ঘসিয়া মাজিয়া হাতিয়ার তৈয়ারী করা শক্ত কাজ ছিল, উহাতে সময়ও যাইত বেশী। পাথর শানানো এবং নানারকম কাজের উপযোগী করিয়া পাথর হইতে হাতিয়ার তৈয়ারী খুবই কষ্টকর। পাথর দিয়া কাঁচি, কাস্তে বানানো সম্ভব ছিল না। পশুপালকেরা ভেড়ার গা' হইতে পশম ছিঁড়িয়া লইত, কাটিয়া লইতে পারিত না; উহা পশুর পক্ষে যেমন যন্ত্রণাদায়ক ছিল, তাহাদের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। ধাতুর তৈয়ারী হাতিয়ার ও অস্ত্র হাল্কা; ধাতু সহজেই গালানো যায়, ঢালাই করা যায়। এই সব হাতিয়ার ও অস্ত্র শানানো যায় সহজে। মানুষ যেই ধাতুর হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিল, অমনি শ্রমের উৎপাদন শক্তিও বাড়িয়া গেল।

প্রথম ধাতুর হাতিয়ার ও অস্ত্র লোহার নয়, তামার। ইহার কারণ, তামা পাওয়া যায় প্রায় ভূ-পৃষ্ঠেই। কালক্রমে তামার সঙ্গে টিন ও সীসা মিশাইয়া উহাকে বেশ শক্ত ও মজবুত করা হয়। এই নূতন ধাতুকে বলা হয় ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জের ব্যবহার ইওরোপের চেয়ে এশিয়ায়ই অনেক আগে আরম্ভ হইয়াছে।

কৃষি সমাজ কিংবা পশুপালক সমাজ, উভয়ের মধ্যেই অসমতা কিছু না কিছু গোড়া হইতেই ছিল। সকল পরিবারের লোকসংখ্যা সমান ছিল না—কোন পরিবারে বেশী, কোন পরিবারে কম। প্রথমটায়, এই প্রভেদের তেমন কিছু গুরুত্ব ছিল না। কেননা, অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবারের বেশী দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু শীঘ্রই অসমতা বাড়িয়া গেল।

কৃষির জন্য যখন নূতন জায়গা পরিষ্কার করা হয়, তখন সকল পরিবারের মধ্যে এমনভাবে জমি বণ্টন সম্ভব হইত না যে একই রকম উর্বর জমি সকলের ভাগেই পড়িবে। কোন কোন পরিবারের দখলে হয়ত ভাল জমি, তাই তাহাদের ফসল উৎপাদন হয় বেশী, বাড়্তি অংশও বেশী। নূতন কোন পরিবার যখন মূল পরিবার হইতে বাহির হইয়া যাইত, তাহার ভাগে প্রায় সর্বদাই খারাপ জমি পড়িত। এইভাবে ক্রমে বড় পরিবার ছোট পরিবার, ধনী পরিবার গরীব পরিবার—এই বিভেদ দেখা দেয়। কোন কারণে ফসল নষ্ট হইলে ছোট এবং গরীব পরিবারগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িত। এই সব পরিবারের লোকেরা অন্য পরিবারের শরণাগত হইত। পশুপালক পরিবারগুলিতেও একই রকমের অসমতা দেখা দেয়। সকল পরিবারেরই একইরকম চারণভূমি থাকিবে তাহা কখনও সম্ভব নয়। কোনটায় বেশী তৃণ, কোনটায় কম। এই কারণেই, কোন কোন পরিবারের পশু বেশী সবল, বেশী স্বাস্থ্যবান্। এইভাবে, পশুপালক পরিবারগুলির মধ্যে অসমতার সৃষ্টি হয়।

দ্রব্যাদির বিনিময় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারগুলির মধ্যে অসমতা আরও গাঢ় হইয়া উঠে, যে সব পরিবারের ভরণপোষণের অতিরিক্ত বাড়্তি অংশ আছে, তাহারাই শুধু বিনিময় করিতে পারিত। গরীব পশু-পালক-পরিবারগুলি নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময় করিয়া যথেষ্ট রুটি সংগ্রহ করিতে পারিত না। এদিকে গরীব কৃষি-পারবারের পক্ষেও পশম, পশমজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল।

ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের ব্যবহার অসমতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। পাথর পাওয়া যায় সর্বত্র; পাথরের হাতিয়ার তৈয়ারীও সহজ। কিন্তু তামা, ব্রোঞ্জ সকল জায়গায় পাওয়া যায় না। অতএব যাহাদের হাতে তামা রহিয়াছে, অন্যদের চেয়ে তাহাদের সমৃদ্ধি বেশী। তামা বিক্রয় করিয়া তাহারা প্রচুর সম্পদ আহরণ করিতে পারিত। এদিকে আবার তামা ও ব্রোঞ্জের আবির্ভাবে সমাজের অভ্যন্তরস্থ একক ব্যক্তিদের মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি পাইল। কতকটা অসমতা পূর্বেই ছিল। যাহারা বৃদ্ধ এবং সর্দারস্থানীয় তাহারা সমাজের ও পরিবারের উৎপাদিত দ্রব্যাদির বেশী অংশ এবং উৎকৃষ্টভাগটাই পাইত। এই অসমতা এখন আরও বাড়িয়া গেল। যে সব সমাজের তামা, ব্রোঞ্জ ছিলনা,—সেই সব সমাজের যাহারা প্রধান তাহারাই এইসব ধাতু সংগ্রহ করিতে পারিত; কেননা, তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়্তি অংশ থাকিত। তাই তাহারা সহজেই বিনিময় করিতে পারিত। তামার হাতিয়ার এবং অস্ত্রাদি ইহাদের হাতে রহিয়াছে; সুতরাং নিজের সমাজে ইহারা আরও বেশী দাবি করিত। এইভাবে ধনীপরিবার-গরীবপরিবারের পাশাপাশি দেখা দিল ধনী-ব্যক্তি-গরীবব্যক্তি।

পরিবারের ধনীব্যক্তিরা এখন অন্য লোকও খাটাইতে লাগিল। ইহারা দাস। যুদ্ধে জিতিয়া ইহাদের বন্দী করিয়া আনা হইত। দাসেরা যাবতীয় গৃহকার্য করিত; জঙ্গল পরিষ্কার করিত। ধনীব্যক্তিরা এইভাবে দাসদের দ্বারা জমি পরিষ্কার করাইয়া নূতন জমি নিজেদের দখলে আনিত, আবার পরিবারের যৌথসম্পত্তির অংশও লইত। পশুপালক সমাজেও তাহাই হইত। ধনীব্যক্তিদের যৌথসম্পত্তির অংশতো ছিলই, নিজস্ব পৃথক পশুপালও থাকিত। এইরূপ নিজস্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেই পরবর্তীকালে শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

এইসব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া গ্রামের সৃষ্টি হয়। পরিবারের জোট অথবা পরিবার-সংঘ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পরিবার দেখা দেয়। পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে এখন প্রত্যেক পরিবারই পৃথক পৃথক জমি পাইল। ফসল উৎপাদনও এখন পৃথকভাবেই হইতে থাকে। তবুও তখনও সকল জমিই মনে করা হইত যৌথ সম্পত্তি; পরিবারের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে এবং নূতন পরিবার গঠন হইলে জমির পুনর্বণ্টন হইত।

প্রত্যেক পরিবারই নিজেদের পৃথক বাড়ি তৈয়ার করিত, প্রত্যেক পরিবারেরই নিজেদের পৃথক পৃথক পশুপাল থাকিত। এইভাবে বৃহৎ যৌথ পরিবার হইতে গ্রামের সৃষ্টি হয়। জমি সকলের দখলে, কিন্তু সকলেরই পৃথক পৃথক সংসার।

অ-সমতা এবং শোষণ, দুইই বাড়িতে থাকে এই প্রকার যৌথগ্রামে। পুন-র্বণ্টনের সময় ধনী ব্যক্তিরা ভাল জমি দাবি করিত। যাহাদের হাতেই কিছু দাস থাকিত তাহারাই ভাল এবং বেশী জমি পাওয়ার চেষ্টা করিত। ফসল মারা গেলে, গরীব পরিবারগুলি বড়দের শরণাগত হইত, তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিত। এইভাবে যৌথগ্রামে শ্রেণীবিভেদের সৃষ্টি হয়। আদিম সমাজের সাম্যতন্ত্রের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়ে—শ্রেণী বিভেদের উপর দাঁড়ানো নূতন সমাজ দেখা দেয়।

ভাষা ও ধর্মের উৎপত্তি

প্রাণীজগত হইতে মানবজাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কথা বলিতে শিখে নাই। কিন্তু সাধারণত আমরা মনে করি,—কথা বলার শক্তি, ভাষায় পরস্পরের মনোভাবের প্রকাশ—এগুলি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। আবার অনেকের ধারণা, মানুষের মুখের ভাষা ঈশ্বরের দান। প্লটিনাসের মতে, সৃষ্টির প্রাণশক্তি 'লগস্' *, এই 'লগস্'-র অর্থ শব্দ। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলর তাঁহার ভাষা বিজ্ঞানের বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—কতকগুলি মূলশব্দ রহিয়াছে, এগুলি যথার্থ সত্তা। এই শব্দগুলি হইতেই ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ। আসলে মানুষের দৈহিক গড়ন ও মানুষের সামাজিক বিকাশ হইতেই ভাষার উৎপত্তি।

পশুর মতই মানুষ প্রথমটায় শুধু অস্পষ্টভাবে চেঁচাইতে পারিত। হাইডেলবার্গ মানুষেরা খাদ্য-আহরণে বাহির হইয়া পরস্পরকে মনের ভাব জ্ঞাপন করিত পশুর মতন চীৎকার করিয়া,—চীৎকারের পরিপূরক ছিল অঙ্গভঙ্গী ও হাত নাড়ানো। এই রকম ভাষাকে বলা যায় সাংকেতিক ভাষা। পশুর স্তর হইতে শিকারীর পর্যায়ে না উঠা পর্যন্ত ইহাই ছিল মানুষের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম।

যখন শিকারী-যৌথসমাজের উদ্ভব হইয়াছে, তখন আর এইরূপ ভাষায় কাজ চলিতে পারে না। হাতিয়ার তৈয়ার করা, হাতিয়ার লইয়া সকলে মিলিয়া বাহির হওয়া,—এসব কাজ সুরু হইলে দরকার হইয়া পড়ে উন্নত রকমের ভাষার। তখনও কাজ হইতে থাকে হাতের সংকেতেই; হাত ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী করা হইত। কোন বস্তুকে বুঝানো অথবা কাজকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইত। কোন একটা পশুর নাম করিতে হইলে সেই পশু যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে তাহা দেখানো হইত অঙ্গভঙ্গীদ্বারা। একজনের মনের কথা অপরে এইভাবে বুঝিতে পারিত।

মানুষের সমাজ যখন কতকটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন আর এইরকম সংকেতের ভাষায় কুলাইল না। নানারকমের হাতিয়ার যখন তৈয়ার হইয়াছে,

* Logos

নানারকম কৌশলে যখন উৎপাদন সুরু হইয়াছে, আদিম মানুষ যখন টোটেমে সংগঠিত হইয়াছে—তখন স্বভাবতই সংকেতের ভাষা অচল হইয়া পড়ে। নানারকম পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে; এই অবস্থায় তাহার মনের ভাব, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা যে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাও যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ কি। এই সব ভাব কখনও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

প্রথমটায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দের সৃষ্টি হয়, হাতের ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি উচ্চারণ করা হইত। কাহারো নাম করিতে হইলে হাত দিয়া তাহাকে নির্দেশ করিতে হইত। কিন্তু হাতের ভঙ্গীর নানারকম অর্থ হয়,—ভয় দেখান, আদেশ দেওয়া,—নানারকমই বুঝাইতে পারে। অতএব, কোন শিকারীর নাম করার সময়, হাত দিয়া দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে 'তুমি' এইরূপ নির্দেশক কোন কথাও উচ্চারণ করিতে হয়। হাত দিয়া অন্য কোন কিছু বুঝাইতে হইলেও, সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কথা উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয়। শব্দ উচ্চারণ করার সময়ে ঠোঁট এবং জিহ্বার মাংসপেশীর কাজ হয়, এগুলি ক্রমে হইয়া দাঁড়ায় শব্দোচ্চারণের নিয়মিত অঙ্গ।

প্রত্যেক টোটেমেরই এইরকম শব্দ ও ভাষা ছিল। একাধিক টোটেমের যখন সংঘ গঠিত হইত, তখন তাহাদের ভাষারও হইত সংমিশ্রণ। প্রথম ভাষাগুলির শব্দের অভাব ছিল খুবই। অনেকসময় একাধিক বস্তুকে বুঝাইতে মাত্র একটি শব্দই ব্যবহার করা হইত। যেমন, জল ও আকাশ দুয়েরই জন্য ছিল একই শব্দ, কেননা আকাশ হইতেই জল পড়ে। 'কেমন' এবং 'কত'—ভাষায় এই দুইটি প্রকাশ করা চাই-ই; 'কেমন' দ্বারা গুণ বুঝানোর চেষ্টা এবং 'কত' দ্বারা সংখ্যা বুঝানোর চেষ্টা। সংখ্যাবাচক শব্দের আবিষ্কার হয় ধীরে ধীরে। উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হইতে হইতে যখন কৃষি, পশুপালন প্রভৃতির প্রবর্তন হইয়াছে, তখনই প্রচুর শব্দের সৃষ্টি হয়।

গোষ্ঠী-সমাজে সংকেতের ভাষা প্রায় উঠিয়াই যায়। অবশ্য আজও পর্যন্ত সংকেত কিছুটা আছেই। আমরা এখনও কথা বলার সময়, বক্তৃতা করার সময় হাত নাড়াই। অনেক সময়,—মাথার ভঙ্গী, সমস্ত শরীরেরই ভঙ্গী করি। এইরূপ অঙ্গভঙ্গী আমরা হাইডেলবার্গ মানুষের নিকট হইতেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি; তাহাই এখনও চলিয়া আসিয়াছে; তবে এখন আর অঙ্গভঙ্গী ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম নয়, কথার ভাষার জোর হিসাবেই উহার ব্যবহার হয়।

ধর্ম মানুষের অন্তরের মধ্যে নিহিত, এই রকমই অনেকের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে সমাজের বিকাশের বিশেষ একটি স্তরে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে। ধর্ম একটা বিশ্বাস—কাল্পনিক

অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস; লোকে ভাবিত, এখনও বহুলোকই ভাবে—দেবতা অথবা কতকগুলি ভৌতিক সত্তাই মানুষের জীবন এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ করে। উহাদের খেয়ালের উপরই মানুষের ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য। ভাল ফসল, মন্দ ফসল, রোগ, স্বাস্থ্য, সুখ দুঃখ—সব কিছুই হয় দেবতার ইচ্ছায়। ধর্মযাজকেরা শিখাইয়া থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত; প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার বছর মানুষ ধর্ম ছাড়াই ছিল। ঊনিশ শতকেও দেখা গিয়াছে, অস্ট্রেলিয়ার টাসমানিয়ানদের কোনরূপ অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস ছিল না; কোনরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বালাই তাহাদের মধ্যে ছিল না।

ধর্মের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বাহির করিয়াছেন; কিরূপে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও ইঁহারা দেখাইয়াছেন।

নিয়েনডারথেল মানুষের হাতে হাতিয়ার ছিল অত্যন্ত দুর্বল; হিংস্র জন্তুদ্বারা তাহারা পরিবেষ্টিত থাকিত। প্রকৃতির ব্যাপারগুলি তাহারা কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহারা মনে করিত, মানুষের কিংবা পশুর ছায়া মানুষ কিংবা পশুর মতই জীবন্ত। সে কালের মানুষ ইহাও মনে করিত—গাছপালা, নদী হ্রদ, পাথর এবং প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু সবই সজীব। এই সব উদ্ভট ধারণাগুলিকে নিয়েনডারথেল মানুষ ব্যবহারিক জীবনের কাজে লাগাইত; মনে করিত শিকার ধরায় এবং বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়ায় এগুলি সহায়ক হইবে।

শিকারীরা তাহাদের হাতিয়ারগুলিতে পশুর ছবি আঁকিয়া লইত; তাহারা ভাবিত, আসল পশু এই ছবিগুলিকে যথার্থ পশু মনে করিয়া আগাইয়া আসিবে। পরে যখন মানুষ গুহায় বাস করিতে আরম্ভ করে, তখন গুহার গায়ে ছবি আঁকিয়া রাখা হইত। গুহার গায়ে বর্শাহত, কিংবা শরাহত পশুর চিত্র আঁকা হইত। বুশম্যান-আদিমমানুষেরা আজও এরকম ছবি গুহার গায়ে আঁকিয়া রাখে; তাহারা বলে, গুহার গায়ে পশুর ছবি আঁকিয়া রাখিলে আসল পশু তাহাদের বশে আসিবেই। অনেকসময় আবার ভয় প্রদর্শনের জন্য অথবা বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নিয়েনডারথেল মানুষ সিংহ, ভালুকের নখ, থাবা প্রভৃতির মালা বানাইয়া পরিত; এই সব দেখিয়া হয়ত পশু ভয় পাইয়া শিকারীর নিকট আসিবে না। এগুলিকে আদিম মানুষ রক্ষাকবচ মনে করিত।

আদিম মানুষ এইরকম অদ্ভুত উপায়ে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাও এড়াইতে চেষ্টা করিত। ঝড়-বৃষ্টি ঠেকাইতে হইলে তাহারা চীৎকার করিত, অথবা পাথরের হাতিয়ার শূন্যে ছুড়িত। মনে করিত, ভয় পাইয়া এই সব দৈত্য

সরিয়া পড়িবে। পরে গোষ্ঠীশাসনের সময়ে এ'রকম বিশ্বাস লোপ পাইয়াছিল বটে, তবুও কতকগুলি পুরাতন রীতি তখনও ছিল। তবে উহাদের ব্যাখ্যা করা হইত অন্যরকমে। রক্ষা কবচ অথবা নানারকম ক্রিয়া-কাণ্ডের অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা থাকে। বুদ্ধরা বলিত, ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রতন্ত্র ঠিকমত পালন করিলে অভিপ্রেত ফল অবশ্য লাভ হইবে।

এইভাবে হইয়াছে ভোজবিদ্যার উৎপত্তি; সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যারও সৃষ্টি হয়। ম্যাজিকের জন্য ছবি আঁকিতে হইত। নিয়েনডারথেল মানুষ ধনুক এবং কাঠের জিনিসের উপরই চিত্রাঙ্কণ করিত। গুহাবাসীরা গুহার গায়ে পশুর ছবি, শিকারের ছবি আঁকিত. পশুর ছবি আঁকায় তাহারা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মানুষের ছবি আঁকায় তখনও দক্ষতা অর্জন করে নাই।

ম্যাজিক ঠিক ধর্ম নয়, কেননা উহাতে অতিপ্রাকৃত কোনরূপ সত্তায় বিশ্বাসের কথা নাই। কিন্তু তবুও সংকীর্ণ একটা সম্পর্ক আছে দুয়ের মধ্যে।

ধর্মেরও উৎপত্তি হইয়াছে মানুষের নিজের সম্পর্কে এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ভুল ধারণা হইতে। পশু শিকারের জন্য পশুরই সাহায্য লওয়ার চেষ্টা হইতে ধর্মের সুরু। শিকারের সময় আদিম মানুষের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, পশু মানুষের চেয়ে শক্তিমান ও চতুর। পশু দৌড়ায় মানুষের চেয়ে দ্রুত, দুর্গম স্থান দিয়া অনায়াসেই উহা চলিতে পারে, তীক্ষ্ণতর ঘ্রাণ-শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির দরুন উহারা সহজেই দূরের জিনিসের সন্ধান পায়। বন্যজন্তুর অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না; নখ, শিং এগুলিই অস্ত্রের কাজ করে। সাপ একটি মাত্র ছোবলেই মানুষ মারিয়া ফেলিতে পারে। পাখী শূন্যে উড়ে, মাছ জলে বাস করে; মানুষের পক্ষে তো এগুলি সম্ভব নয়। আদিম মানুষের নিকট পশুর ও অন্যান্য প্রাণীর এসব গুণ অত্যাশ্চর্য্য ঠেকিত। তাই আদিম শিকারী পশুর নিকট প্রার্থনা করিত সহায়তার জন্য; পশুর পূজা করিত নিজেদের নিরাপত্তার জন্য।

ধর্মের প্রথমরূপ পশুপূজা। টোটেম সমাজেই উহা নির্দিষ্ট রূপ লয়। বিভিন্ন পশুর নামেই টোটেমের নামকরণ হইত। যে পশুর নামে কোনও টোটেমের নামকরণ হইত, তাহাকে মনে করা হইত সেই টোটেমের দেবতা, রক্ষাকর্তা। এই পশুকে বধ করা যায় না, বরং উহার পূজা করিতে হয়; উহার নিকট সকলরকম সহায়তার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। কেঙ্গারু-টোটেমের লোকেরা যখন শিকারে বাহির হইত, তাহারা ভাবিত কেঙ্গারু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে এবং বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলেই চীৎকার করিয়া সংকেত করিতেছে এবং সতর্ক করিয়া দিতেছে। আবার, কোন

কোন টোটেমের লোকেরা ভাবিত, তাহাদের পূর্বপুরুষ এই টোটেম পশু হইতেই জন্মিয়াছে।

টোটেমপশুর সম্মানার্থে প্রত্যেক টোটেমই বছরে একবার উৎসব করিত। উৎসবে শিকারীরা টোটেমপশুর সাজ লইয়া নৃত্য করিত। কেহ কেহ গান করিত; কিরূপে টোটেমপশু শিকারের সময় তাহাদের সহায়তা করিয়াছে, বিপদে রক্ষা করিয়াছে, এগুলিই গানের বিষয়। অনেকে আবার টোটেমপশু সম্পর্কে নানারকম গল্প বলিত। ইহাই মানুষের প্রথম গল্প এবং উপকথা। উৎসব শেষ হইলে, টোটেমপশু বলি দেওয়া হইত। বছরে এই একদিনই মাত্র টোটেমপশু বলি দেওয়া যাইত। ইহার মাংস সকলে খাইত; তাহাদের ধারণা ছিল, টোটেমপশুর মাংস ও রক্তের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহারা উহার গুণগুলি অর্জন করিতেছে।

ভৌতিক সত্তায় বিশ্বাস টোটেমেই প্রথম দেখা দেয়। টোটেমের লোকেরা বিশ্বাস করিত, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আত্মা রহিয়াছে। আত্মা মানুষের দেহে বাস করে সত্য, কিন্তু উহা মানুষের দেহ হইতে পৃথক। আত্মা নিশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। নিদ্রায় সময়ে সাময়িকভাবে এবং মৃত্যুর সময়ে চিরতরে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আদিম মানুষ মনে করিত, অনেক সময় উহারা ক্ষুধার্ত হইয়া শূন্যে ঘুরে এবং মানুষকে আক্রমণ করে। নাসিকারন্ধ্র দিয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করে; এই আক্রমণের ফলে সে পীড়িত হইয়া পড়ে। ভূত তাড়ানোর উপায়, ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রহার করা এবং ঘরে শস্যাদি পুড়াইয়া ধূঁয়া দেওয়া।

আদিম মানুষ ইহাও বিশ্বাস করিত, যদি মৃত ব্যক্তির যত্ন লওয়া হয়, তাহাকে খাবার ও পানীয় দেওয়া হয়,—তবে সে নিশ্চয়ই জীবিতদের নানা-রকমে সহায়তা করিবে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মৃত ব্যক্তির সমাধির মধ্যে মানুষের কঙ্কালের পার্শ্বে পশুর হাড়গোড়ও আবিষ্কার করিয়াছেন।

আদিম মানুষ পূর্বপুরুষদের পূজা করিত; উহাদের ভৌতিক আত্মার উদ্দেশ্যেও তাহারা পূজা দিত। মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারে মৃতা মাতামহীর পাথরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উহার পূজা করা হইত। এই মাতামহী-দেবতাদের ভাবা হইত ফসলের কর্ত্রী; মাটি হইতেই ফসল জন্মে; মাতামহী-দেরও সমাধি দেওয়া হয় মাটির নিচে; অতএব মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই তাহারা ফসলের যত্ন লয়।

পিতৃপুরুষদের পূজা শক্ত শিকড় গাড়িয়াছিল পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার-গুলিতে। এই সঙ্গে যোগ হয়, মৃত নেতাদের পূজা। মৃত নায়কের নিকট প্রার্থনা করা হইত যেন যুদ্ধের সময়ে এবং শিকারের সময়ে তাহার টোটেমের

লোকেদের তিনি সাহায্য করেন। মন্দির তৈয়ার করিয়া পূর্বপুরুষরূপ দেবতাদের মূর্তি উহাতে স্থাপন করা হইত।

ম্যাজিক, দেবতা অথবা আত্মায় বিশ্বাস, ধর্মের ক্রিয়াকান্ড প্রভৃতি আদিম মানুষের পক্ষে প্রয়োজন ছিল; কেননা প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং অসহায়। কিন্তু জীবন সংগ্রাম এইসব উপায়গুলিদ্বারা যে কিছুমাত্র সহজ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কোন কোন সময় হয়ত ক্রিয়াকান্ডের পর শুভ ফল হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্তই আকস্মিক। মানুষের সৌভাগ্য ও শুভই নয়,—দুরদৃষ্টের কারণও মনে করা হইত অতি-প্রাকৃত ভৌতিক শক্তি। দুরদৃষ্টের কারণ দেবতার রোষ, অতএব, ক্রিয়াকান্ড-দ্বারা দেবতার তুষ্টি সাধন দরকার।

টোটেমসমাজে এই ক্রিয়াকান্ড করিত প্রথমটায় বৃদ্ধরা। রোগের প্রতিকারের জন্য কিংবা দুরদৃষ্টের জন্য যাওয়া হইত ইহাদেরই নিকট। এই বৃদ্ধদের মধ্য হইতেই কয়েকজন হইয়া দাঁড়ায় বিশেষজ্ঞ; ক্রিয়াকান্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা দেবতাদের তুষ্টি সাধনের কাজ এখন তাহাদের একচেটিয়া। ইহাদের কৌশল গোপন; বাছাইকরা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি—বিশেষ করিয়া, ইহাদের ছেলেরা—এই গুপ্ত বিদ্যার উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। এইভাবে, বৃদ্ধদের পাশে দেখা দেয় 'সামান' বা ডাইনদের জাত। এদিকে, আর এক দল ছিল পুরোহিত; পূর্ব-পুরুষ—দেবতাদের মন্দিরের ভার ছিল ইহাদের উপর; বলি এবং প্রার্থনার বিষয়াদি ইহাদের আয়ত্ত ছিল। ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদির জন্য ডাইন ও পুরোহিতেরা উচ্চমূল্য দাবি করিত। অবশ্য, তাহারা বলিত—এই মূল্য তাহারা নিজের চাহিতেছে না; দেবতাদের পক্ষ হইয়া তাহারা চাহিতেছে।

পরিবারের উৎপত্তি

আদিম সমাজকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়; অসভ্য যুগ ও বর্বর যুগ। অসভ্যযুগে মানুষ ছিল একান্ত নিম্নস্তরে। প্রকৃতির উপর তাহার প্রায় কোন হাতই ছিল না। বর্বরযুগে মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে; কৃষি ও পশু পালন আরম্ভ করিয়াছে। মানুষের হাতে হাতিয়ার তখনও পাথরেরই, তবে কতকটা উঁচুদরের।

মানুষের বিকাশের এই দুইটি স্তরে—অসভ্য ও বর্বর যুগে—স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক কি ছিল? যাহারা সমাজের বিকাশের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন স্বীকার করেন না, তাহাদের উত্তর সহজ। বর্তমান সমাজে আমরা যেরূপ পরিবারে বাস করি, প্রথমাবধিই সেইরূপ পরিবার রহিয়াছে; সমাজের গোড়াতেই এক পুরুষ ও এক স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে।

ওয়েস্টারমার্ক এইরূপ মতের স্বপক্ষে তথ্য লইয়াছেন প্রাণীজগত হইতে। তাহার মতে প্রাণীর মধ্যে ঈর্ষার একটা সহজ প্রবৃত্তি রহিয়াছে; এই ঈর্ষাই এক বিবাহের মূল। এক স্ত্রী এবং এক পুরুষের এক সঙ্গে থাকাটাই প্রাণীজগতের নিয়ম; অতএব মানুষের সমাজেও যে এই রীতিটি গোড়া হইতেই রহিয়াছে তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ।

এঙ্গেলস্ এই মতের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, প্রাণীজগতের নজীর মানুষের সমাজে প্রয়োগ করায় লাভ হয় না কিছুই। প্রাণীজগতে দেখা যায় স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সকলরকমের যৌন জীবনই রহিয়াছেঃ—অবাধ সংমিশ্রন, গোষ্ঠীগত যৌন সম্পর্ক, বহু স্ত্রী পরিগ্রহ, এক স্ত্রী গ্রহণ। প্রাণীর মধ্যে যৌন জীবনের কোন ধরাবাঁধা রূপ নাই।

গোষ্ঠী এবং পরিবার একে অন্যের বিরোধী। পরিবারের বন্ধন যখন আঁট থাকে, অর্থাৎ এক পুরুষ ও এক স্ত্রী যখন পরস্পরকে আকড়াইয়া থাকে,—তখন কদাচিৎ গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে পারে। অপরপক্ষে, যখন অবাধ যৌন সম্পর্ক ও বহু স্ত্রী গ্রহণ হয়, তখন গোষ্ঠী এক প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই গড়িয়া উঠে। গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে হইলে পরিবারের বন্ধন শিথিল হওয়া প্রয়োজন। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আমরা যে ন্যূনাধিক সংঘবদ্ধতা দেখিতে পাই, উহার যথার্থ কারণ এই যে, কেহই সেখানে পরিবারের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দেয় না।
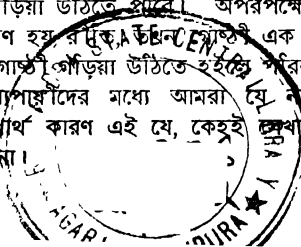
এখানে মানুষের সমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার পক্ষে প্রাণী-গোষ্ঠীর নজীরের কিছুটা মূল্য আছে। যদিও এই মূল্য গৌণ। জীবজন্তুর স্তরের উপরে যদি মানুষের বিকাশ হইতে হয়, প্রকৃতির রাজ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম অগ্রগতি যদি তাহা সফল হইতে হয়,—তবে প্রথম দিনের মানুষের পক্ষে প্রয়োজন ছিল সংহতি ও সহযোগিতা, অর্থাৎ গোষ্ঠীজীবন। এঙ্গেলস্ বলেন, 'যে বৃহত্তর এবং স্থায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে পশু মানুষে পরিণত হইয়াছিল, সেই গোষ্ঠী গড়িয়া উঠার জন্য প্রাথমিক কারণ-রূপে প্রয়োজন ছিল বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সহযোগিতা ও পরস্পরের প্রতি উদারতা।'

আদিম পারিবারিক রূপ গোষ্ঠীগত বিবাহ। এই রকম পরিবারে সকল পুরুষের ও সকল স্ত্রীরই পরস্পরের উপর অধিকার রহিয়াছে। ঈর্ষার এখানে খুব কমই স্থান। গোষ্ঠীগত বিবাহের সব কয়টি প্রকারের সঙ্গেই এমন জটিল বাধা-নিষেধ জড়িত, যে জন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কের রূপ পূর্বে সহজতর ছিল। একেবারে গোড়ায় এমন একটা 'অবাধ' যৌন স্বাধীনতার স্তর ছিল যাহার সঙ্গে পশু হইতে মানুষের পর্যায়ে রূপান্তরের মিল আছে। 'অবাধ' এই অর্থে পরে যে-সব বাধা-নিষেধ আরোপ হয় তখন সেগুলির অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য, এইরূপ মনে করা ঠিক নয় যে প্রাত্যহিক আচরণে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সহবাস বলিয়া কিছু ছিল। সাময়িকভাবে এক স্ত্রী ও এক পুরুষের এক সঙ্গে থাকার রীতি ছিলই। গোষ্ঠী-বিবাহের মধ্যেও দেখা যায়, অধিকাংশ সম্বন্ধই এইরূপ।

যৌন-সম্পর্কের এই আদিম স্তরটি হইতে সম্ভবত প্রথম বিকাশ হয় সগোত্র-পরিবার। পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে পিতামহ ও পিতামহীরা সকলেই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী। তাহাদের সন্তানেরা অর্থাৎ পিতা ও মায়েরাও তাহাই; এই ভাবে প্রতি পর্যায়ের স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। সমপর্যায়ের স্ত্রী এবং পুরুষেরা সকলেই সকলের স্বামী এবং স্ত্রী। কিন্তু একটি পর্যায় এবং উহার পরের পর্যায়,—যেমন পিতামাতা এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি—এই দুয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ভাই-বোনেরা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হইতে পারে।

বিকাশের ক্রমের মধ্যে প্রথমটায় সহোদর ভাই-বোন এবং পরে অন্যান্য ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের সম্পর্ক নিষিদ্ধ হইয়াছে। মর্গান বলেন, "প্রকৃতির নির্বাচন কার্যের এইটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।" যে সব গোত্রে যৌন সম্পর্কের পরিধি এই ভাবে ছোট হইয়া আসিয়াছে, সেগুলি যে অন্যান্য গোত্রের চেয়ে বেশী দ্রুত এবং বেশী সম্যক বিকাশ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অসভ্য এবং বর্বরযুগের জাতিগুলির মধ্যে সাধারণ স্ত্রীর অস্তিত্ব সম্পর্কে

হিরোডোটাস্ প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহারও খুব সহজতম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গোষ্ঠী-বিবাহের মধ্যে। গঙ্গার তীরবর্তী অযোধ্যার তিহুরদের সম্পর্কে ওয়াটসন ও কায়ে লিখিয়াছেন,—'পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের বন্ধন নাম মাত্র। তাহারা সম্পর্ক পরিবর্তন করে; অনেক বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাহারা নির্বিচারে বাস করে।' অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই রকম নজীর পাওয়া যায় অনেক।

গোষ্ঠী পরিবারের মধ্যে কোন একজন সন্তানের পিতা যে কে তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। কিন্তু মা যে কে, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে। যদিও সমগ্র পরিবারের সকল সন্তানকেই সে নিজের সন্তান বলে, তথাপি সকলের মধ্যে তাহার নিজের সন্তান যে যথার্থত কাহারা তাহা সে ভালই জানে। অতএব গোষ্ঠীগত পরিবারে বংশের ধারা মায়ের দিক হইতেই পরিগণনা করা হয়। এই কারণেই মায়ের ধারাটিই স্বীকার করা হইয়া থাকে।

আদিম পরিবারের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখি, দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে উহার পরিধির ক্রমেই সংকোচন হইয়াছে। গোড়ায় উহার অভ্যন্তরে ছিল সমগ্র গোত্র—সকল পুরুষ ও সকল স্ত্রীর মধ্যে ছিল দাম্পত্য সম্পর্ক। ধারাবাহিক ভাবে, প্রথমটায় নিকট আত্মীয়রা, পরে ক্রমশ অধিকতর দূর সম্পর্কীয়রা, অবশেষে এমন কি বিবাহ সম্পর্কে যাহারা আত্মীয় ছিল তাহারাও যৌন সম্পর্ক হইতে বাদ পড়িয়া যাওয়ায় কোন রকমের গোষ্ঠীগত বিবাহ কার্যত অসম্ভব হইয়া পড়ে; সর্বশেষে রহিল মাত্র একক দম্পতি। তখনও উহা খুব শিথিল, এঙ্গেলস্ বলেন, "এই ক্ষুদ্রতম অণু ভাঙ্গিয়া গেলে, বিবাহই বাতিল হইয়া যায়।"

অপেক্ষাকৃত আদিম পরিবারগুলিতে পুরুষের পক্ষে কখনও মেয়ের অভাব ঘটিত না। কিন্তু 'এক দম্পতি' অথবা 'যুগ্মবিবাহ' যখন হইতে দেখা দিয়াছে, তখন মেয়ে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে; অতএব 'মেয়ে ক্রয়,' 'অপহরণ করিয়া বিবাহ' প্রভৃতি রীতি সে সময়ে দেখা দেয়। যে গভীরতম পরিবর্তন সে সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, উহা তাহারই ব্যাপক লক্ষণ।

যুগ্মপরিবার নিজেই এত দুর্বল ও অস্থায়ী যে তাহাতে স্বতন্ত্র গৃহ-স্থালীর দরকার হয় না। যৌথসংসারে স্ত্রীরই ছিল কর্তৃত্ব। 'সমাজের বিকাশের গোড়ার দিকে স্ত্রী ছিল পুরুষের দাসী'—ইহা আঠার শতকের অমূলক ধারণা। অসভ্যযুগে এবং বর্বরযুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্ত্রী যে শুধু স্বাধীনই ছিল তাহা নয়, সমাজে তাহার স্থানও ছিল সম্মানজনক।

বর্বরযুগের নিম্নস্তর পর্যন্ত স্থায়ী ধন-দৌলত ছিল শুধু ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অসংস্কৃত গহনা, খাদ্যোৎপাদনের হাতিয়ার, নৌকা ও

বাসন-পত্র। কিন্তু বর্বরযুগের উচ্চস্তরে পশুপালন ও পশু উৎপাদন ধন-দৌলতের নূতন পথ খুলিয়া দেয়। এই নূতন ধন-দৌলত কাহার সম্পত্তি? পশুপালগুলি সর্বত্র-ই তখন পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এদিকে যুগ্মবিবাহ স্বাভাবিক মায়ের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছে স্বাভাবিক পিতাকে, পরিবারের মধ্যে সে সময়ের শ্রম-বিভাগ অনুযায়ী খাদ্যের যোগাড় করিতে হইত পুরুষকে; অতএব শ্রমের হাতিয়ারগুলি ছিল তাহারই। গো-মহিষ প্রভৃতির মালিকও পুরুষই; দাসদেরও মনিব সেই। কিন্তু তখনকার রীতি অনুসারে সন্তানেরা পিতার উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। সে সময়ের প্রথা-অনুযায়ী পুরুষ অন্য কুল হইতে স্ত্রীর কুলে আসিত। সন্তান মায়ের সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। পিতার মৃত্যু হইলে তাহার নিজের কুলের নিকট-সম্পর্কীয়রা তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। নিজের সন্তানদের এই সম্পত্তির উপর কোন দাবি থাকিত না।

ধনদৌলত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের প্রতিষ্ঠা যতই বাড়িতে থাকে, ততই উত্তরাধিকারের ও বংশপরম্পরা গণনার রীতি উল্টাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এঙ্গেলস্ বলেন, "আজ আমাদের নিকট এই কাজটি যত শক্ত মনে হয়, উহা তেমন শক্ত ছিল না। কেননা, মানুষ আজ পর্যন্ত যতগুলি চরম যুগান্তকারী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, উহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেও, কুলের একটিও প্রাণীর জীবনে কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মাইয়া এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল। সকলেই পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি থাকিতে পারিল। ভবিষ্যতে পুরুষ সন্তানেরা কুলের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে, মেয়ে সন্তানদের অন্যকুলে পাঠাইতে হইবে,—এই মর্মে একটি সাধারণ আদেশই যথেষ্ট ছিল।"

ইহার দ্বারা মায়ের দিক হইতে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের বিধিটি বিপর্যস্ত হইয়া যায়। সকল দিক হইতে পিতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সভ্যতার উন্মেষ

বর্বরযুগ হইতে সভ্যতার যুগে পৌঁছানোর আগে সামাজিক বিকাশের স্তর কিরূপ ছিল? প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয় উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগে। আরও অন্তত ৪০০০ বছর আগে হইতেই সভ্যতার উন্মেষের পথ পরিষ্কার হইয়াছে।

সভ্যতার যুগের একটা প্রধান বিশেষত্ব কৃষির সুবিধার জন্য বৃহদাকারে সেঁচের ব্যবস্থা। হাতিয়ার, যন্ত্র ও অস্ত্রনির্মাণের জন্য তখন ধাতুর ব্যবহার ব্যাপকভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। সামাজিক জীবনের কেন্দ্র তখন নগর;—হস্তশিল্পী, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, রাজা ইহারা সমাজের প্রধান স্তম্ভ। আরও একটি বিশেষত্ব বাণিজ্যের প্রসার ও নানারকম যানবাহনের প্রবর্তন।

বর্বরযুগে সমাজের কেন্দ্র ছিল গ্রাম; কৃষিই ছিল প্রধান উৎপাদন; হাতিয়ার, যন্ত্র ও অস্ত্র তখনও ছিল পাথরেরই; কাপড় বুনা ও মাটির বাসন তৈয়ারীই ছিল একমাত্র শিল্প।

মিশরে এবং পশ্চিম এশিয়ায় পুরাতত্ত্ববিদেরা যে সব খনন কার্য করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা সভ্যতার যুগেব পূর্বেকার অবস্থা জানিতে পারি। ইঁহারা প্রথম-রাজবংশের কবর এবং নাকুডার গোরস্থান আবিষ্কার করিয়া মিশরের রাজবংশের * পূর্বেকার যুগ সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। বাডারি ও ডিয়ারটাসায় এবং নিম্ন মিশরের ফাউমে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে পূর্বের আবিষ্কারের সঙ্গে এগুলি মিলাইয়া খৃষ্ট জন্মের ছয় হাজার সাত হাজার বছর আগের কৃষি-সমাজগুলির অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

নদী এবং হ্রদের তীরে এই সমাজগুলির বসতি ছিল। তাই উহারা যে একমাত্র কৃষিই করিত তাহা নয়, মাছও ধরিত,—শিকারও করিত। ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল এগুলি ঘরে রাখা হইত বটে কিন্তু পশুর হাড়-গোড়ও এত কম পাওয়া গিয়াছে যেজন্য মনে হয় পশুপালন সে-সময়ের অর্থনীতিতে তেমন গুরুত্বলাভ করে নাই। ফসল সংগ্রহ এবং শস্য মাড়ান ও ঝাড়ার জন্য যে-সব সরঞ্জাম পুরাতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয়

---

* Dynasty

সে-সময়ে কৃষি ও শস্যোৎপাদনই ছিল প্রধান। যে-সব যায়গা নীল নদীর প্লাবনে ভাসিয়া যাইত সেখানে শুধু বীজ ছড়াইয়া দিলেই ফসল হইত। কিন্তু ফাউমিরা পাথরের নিড়ানি দিয়া জমি কর্ষণ করিত, কাঠে লাগানো পাথরের কাস্তে দিয়া শস্য কাটিত।

শিল্পের দিক হইতে টাসিয়ান, ফাউমি ও মেরিম্‌ডিয়ানেরা প্রস্তর-যুগেই ছিল। বাডেরিয়ানরা তামার ব্যবহার জানিত। উহারা হাতুড়ি দিয়া পিটাইয়া তামা হইতে নানা রকম জিনিস তৈয়ার করিত। কিন্তু কি ভাবে তামা গালাইতে হয় এবং ঢালিতে হয় তাহা জানিত না। কাপড় বুনা ও মৃৎপাত্র তৈয়ার বর্বর যুগের একটি বড় কীর্তি। বস্ত্রশিল্পের জন্য দরকার প্রচুর আঁশের যোগান। ফাউমি ও বাডেরিয়ানরা শনের চাষ করিত। মিশরের এই কৃষি-সমাজগুলি অনেকটা স্বাবলম্বী ছিল। সাধারণত বিদেশ হইতে তাহারা আনিত অঙ্গসজ্জার ও অলংকারের দ্রব্যাদি। ফাউমিরা এসব জিনিসের আমদানি করিত ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও ভারত সাগরের তীরবর্তী দেশ হইতে। বাডেরিয়ানদের কবরে নৌকার ছাঁচ পাওয়া গিয়াছে; নৌকায়ই তখন বাণিজ্য হইত।

পশ্চিম এশিয়ায় পশু ছিল অনেক, ঘাসও প্রচুর জন্মিত; কিন্তু মিশরের মেরিম্‌ডিয়ান কিংবা ফাউমিদের মত এত পুরাতন কৃষি-জীবী সমাজ দেখা যায় না। শিল্পে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে এ রকম সমাজেরও চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কারাকুম মরুর প্রান্তলগ্ন 'আনাউ' এবং কাশানের নিকট-বর্তী 'সিয়াল্‌ক'—এই দুই যায়গা হইতে আমরা অনেক তথ্যের খোঁজ পাই। প্রথমটিতে খনন কার্য হয় ১৯০৪ সালে; দ্বিতীয়টিতে ১৯৩৩-৩৭এ। পশ্চিম এশিয়ায় বসতি স্থাপন হয় খানিকটা উন্নত স্তরে। মেসোপটেমিয়ার মাটির ঢিবিগুলি হইতে জানা যায় অল-উবেদ্‌, উরুক, জামডেত্‌-নসর প্রভৃতি স্থানে বসতি ছিল।

সভ্যতার বড় বিশেষত্ব শহর; শহর বলিতে বুঝায় বহুলোকের একত্রবাস—ঘনবসতি। খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা থাকিলেই ঘনবসতি গড়িয়া উঠিতে পারে। উত্তর আফ্রিকার মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার সুমের. উভয় স্থানেই প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল ছিল। তাই এসব যায়গায় শহর গড়িয়া উঠে আগে। উভয় জায়গায়ই স্বাভাবিক সেচের সুবিধা ছিল; নদীর প্লাবনে যে জমির উর্বরতা বাড়ে তাহা সকলের নিকটই এত সুস্পষ্ট ছিল যে তথাকার অধিবাসীরা কৃত্রিম সেচেরও ব্যবস্থা করে। প্রথমটায় হয়ত কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করা হইত সীমাবদ্ধ আকারে। কিন্তু যে সব যায়গায় সেচের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেখানে খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় লোক বসতি করিতে থাকে বেশী সংখ্যায়। এই বর্ধিত জনসংখ্যা এখন বড় আকারে সেচের ব্যবস্থা

করিতে উদ্যোগী হয়। সেচ-ই এসব যায়গায় উৎপাদনের উপায় হিসাবে প্রধান স্থান গ্রহণ করে।

সভ্যতার উন্মেষের সময়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল মাটির পাত্র তৈয়ার; আগে মাটির জিনিস বানানো হইত হাতে, এখন চাকার ব্যবহার সুরু হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের অনুসন্ধানে জানা যায় অল্-উবেদে চাকায় মাটির বাসন তৈয়ার করা হইত। চাকার ব্যবহারে অল্প সময়ে উৎপাদন হয় বেশী; মৃৎ-শিল্প এখন একটা বিশেষ বৃত্তিরূপে গড়িয়া উঠে; সমাজে মৃৎশিল্পীদের একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এতকাল মাটির বাসন তৈয়ার ছিল মেয়েদের কাজ; এখন ইহা প্রধানত পুরুষের কাজ।

পাথরের কারুকার্যেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। আদিম বর্বরেরা যে সমস্ত ছোট ছোট পাথরের বাটি তৈয়ার করিত তাহা ছিল নিতান্ত সাধারণ; অসভ্য-যুগের চেয়ে সামান্য উন্নতধরনের। কিন্তু সভ্যতার যুগের সুরুতে নানা-রকমের পাথরের বাসন তৈয়ার হইতে থাকে। ইরেক্‌টে আবিষ্কৃত পাথরের জিনিসে যে কারুকর্ম দেখা গিয়াছে তাহাতে স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। পাথরের উপর খোদাই করা দেবীমূর্তি গোলাকার সীল-মোহর এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পাথর-খোদাই প্রভৃতি হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায় তখন ধাতুর ব্যবহার বেশ ব্যাপক ছিল। তামা গালাইয়া কি ভাবে উহাকে ছাঁচে ঢালিতে হয়, এই আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এখন পাথর খোদাই, কাঠ কাটা সবই সহজ হয়। ঠিক কোথায় এবং কখন যে এই আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। সুমেরে অল্-'উবেদে'র অধিবাসীরা তামা গালাইয়া ব্যবহার করিত। মিশরে বাডেরিয়ান ও গেরিজিয়ানেরা তামার ছুরি, সূঁচ, ক্ষুর প্রভৃতি বানাইত। সীরিয়ার এবং এসীরিয়ার হাল্‌ফিয়ানরা খুব ব্যাপকভাবেই যে তামার ব্যবহার করিত তাহা সুনিশ্চিত।

ব্রোঞ্জের আবিষ্কারে যন্ত্রের আরও উন্নতি সম্ভব হয়। তামার সঙ্গে টিন ও সীসা মিশাইয়া অস্ত্রাদি শক্ত ও দৃঢ় করা হইত। ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হইয়াছে প্রথম এশিয়াতে। অনেক পরে রাজবংশের যুগে মিশরে উহার ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অবশ্য রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই মিশরে সীসার ব্যবহার ছিল; প্রাক্-রাজবংশ যুগের অনেক কবরে সীসা পাওয়া গিয়াছে। ধাতুর ব্যবহারে ব্যবহারিক জীবনের তো সুবিধা হইয়াছেই রাসায়নিক জ্ঞানও বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, সমাজে নূতন একটি হস্তশিল্পীর শ্রেণীও গড়িয়া উঠে।

রাজবংশের অভ্যুদয়ের আগের মিশরীয় মাটির পাত্রে নৌকার ছবি পাওয়া গিয়াছে; নৌকাগুলির পাল আছে। লোহিত সাগরের উপকূলে রাস্-

সামাডিতে একই সময়ের কতকগুলি কবর আবিষ্কার করা হইয়াছে; ঐগুলিতেও একই রকম ছবি পাওয়া গিয়াছে। এদিকে আবার, সীরিয়ার বিব্‌লস্‌ বন্দরে মিশরের বহু জিনিস পাওয়া গিয়াছে। এইসব আবিষ্কারগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, তখন সুদূরব্যাপ্ত বাণিজ্য-চলাচল ছিল। জলপথে মাল চালান দেওয়া হইত এবং সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরগুলি হইতে স্থলপথে নানাদিকে পণ্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত।

জন্তুর দ্বারা টানা গাড়ি এবং অন্যান্য যান প্রথম প্রবর্তিত হয় সীরিয়া, এসীরিয়া এবং সুমেরে। ষাঁড় দিয়া টানা চার-চাকার গাড়িই সম্ভবত প্রথম যান। উরুক যুগের চাকা-সমন্বিত রথের চিত্র পাওয়া গিয়াছে সীলমোহরে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চাকাসমন্বিত রথের প্রচলন মিশরে দেখা গিয়াছে পশ্চিম এশিয়ার প্রায় হাজার বছর পরে।

বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্তারে নানা রকমের মানসিক উদ্ভাবনের সহায়তা হইয়াছে। এই উদ্ভাবন দ্বারা অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতিরও সুবিধা হয়। সমাজ উন্নতির এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে এখন পরিমাপ করা, হিসাব কষা এগুলি অপরিহার্য হইয়া উঠে। পূর্বে মাছ অথবা শিকারে ধরা পশু গণনা করিলেই হইত; নির্দিষ্ট মাপের পাত্র দিয়া শস্য, তেল প্রভৃতি মাপা চলিত। কিন্তু ধাতুর যখন আবিষ্কার হইয়াছে তখন আর এইভাবে মাপা যায় না। ধাতুর মাপ করিতে হয় ওজন দ্বারা; তাই ওজন করার জন্য আবিষ্কার হয় পাল্লার। এম্‌রেসীন্‌ কবর হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌ পোট্র পাল্লা আবিষ্কার করিয়াছেন।

ব্যক্তিগতবিত্তের আবির্ভাব এবং বাণিজ্যের বিস্তার হওয়ায় ব্যক্তির স্বত্বের নিদর্শন আবশ্যক হয়। কোন্‌ দ্রব্য কাহার তাহা যাহাতে জানা যায়, সে-জন্য আবিষ্কার হয় সীলমোহরের। লেখার উদ্ভব হয় গণনা হইতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুমেরে অক্ষর ছিল প্রথমত্রায় ছবির। সাধারণত কোন স্বাক্ষর দিতে হইলে সীল মারিয়া দেওয়া হইত, কেননা, তখন নিরক্ষরতা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। লেখার কাজই ছিল যাহাদের বৃত্তি, তাহাদের একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠে।

ঘনলোকসংখ্যা, বৃহদাকার সেচের কাজ, বাণিজ্যের প্রসার এবং বহুরকমের অর্থনৈতিক বৃত্তির উদ্ভবের দরুন সমাজের কাঠামো যেমন জটিল হইয়া পড়ে, তেমনি সমাজের সংহতিও বাড়িয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জীবনযাত্রা সহজতর হইতেছে বটে, কিন্তু লোকের আত্মবিশ্বাসের অভাব আগের মতই রহিয়াছে। তাহার নিজের দক্ষতা বাড়িয়াছে, কিন্তু বাইরের শক্তির সহায়তার কামনা কমে নাই একটুও। যে অলৌকিক শক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কিরূপে সাফল্য

বাড়ানো যায় এবং দুরদৃষ্ট এড়ানো যায় তাহা আমরা ম্যাজিকের ব্যাপারে দেখিয়াছি। আগে পূজা হইত নিজের ঘরে; মাতামহীর মূর্তি ও মন্দিরের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বর্বর যুগের শেষের দিকে যখন সভ্যতার উদয় হয় তখন গৃহপূজা সর্বসাধারণের জাতীয় পূজায় পরিণত হইয়াছে। সুমেরে প্রাগৈতিহাসিক স্তরেই সর্বসাধারণের মন্দির স্থাপিত হয়, বিশেষ একটা পুরোহিত শ্রেণীও গড়িয়া উঠে। সম্প্রতি খননকারীরা দুইটি মন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন; একটির অধিষ্ঠাত্রী-দেবী 'আনু'* অপরটির 'ইয়া'†। মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইত উঁচু জায়গায়, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হইত। মন্দিরগুলির যে-সব অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহার গঠন কার্য হইতে মনে হয় কয়েকবারই উহাদের সংস্কার করা হইয়াছে। মন্দিরগুলির যে খুবই যত্ন লওয়া হইত তাহাও পরিষ্কারই বুঝা যায়। এই-সব কারণ হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সভ্যতার বিকাশের পূর্বেই সমাজের উপর মন্দিরের ও মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভাব ছিল খুবই।

বর্বরযুগের সর্বশেষ বিকাশ রাজবংশ ও একীভূত রাষ্ট্র; এই বিকাশ হইতেই সভ্যতার যুগ ধরা হয়। জেমডেতনেসরের প্রাসাদ, মিশরীয় 'মস্টবস্'‡ এগুলি রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বাভাস।

---

* Anu ; † Ea ; ‡ Mastabas—পিরামিডের প্রথম রূপ

প্রাচীন সভ্যতার শ্রেণীরূপ

সভ্যতা প্রথম গড়িয়া উঠে উত্তর আফ্রিকায় ও এশিয়ায়। পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস্ নদীর তীরে এবং উত্তর আফ্রিকায় নীলনদের অববাহিকায় যে সভ্যতা ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল পুরাতত্ত্ববিদেরা সে সম্পর্কে অনেকরকম তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষের সিন্ধু-গঙ্গার তীরে এবং চীনের হোয়াংহোর তীরে যে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহাও সুপ্রাচীন, কিন্তু এখনও এসব যায়গার ইতিহাস তেমনভাবে লেখা হয় নাই। চীনের প্রাচীন ইতিহাস আমরা জানি অনেক পরবর্তীকালের চৈনিক ঐতিহাসিকদের লেখা হইতে; ইঁহাদের লেখার অবলম্বন ছিল বেশীর ভাগই অতীত কাহিনী ও গল্প। মেসোপটেমিয়া ও মিশরের ইতিহাসই আমরা জানিতে পারি ভালরকম। পুরাতত্ত্ববিদেরা এসব যায়গায় খনন কার্য করিয়া শুধু যে নানারকম জিনিসই আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নয়, অনেক পুরাতন লেখাও পাইয়াছেন। এসব লেখা প্রথমটায় ছিল দুর্বোধ্য; অনেক চেষ্টার পর তাঁহারা ইঁহাদের অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন।

মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একান্ত অনুকূল। নদীর প্লাবনে স্বাভাবিক সেচের কাজ হইত; জলবায়ু ছিল উষ্ণ। ভূমি উর্বর, অতএব সহজেই চাষ হইতে পারিত। কৃষির কাজ এসব অঞ্চলেই হয় প্রথম; কৃষির বিকাশও হয় দ্রুত। মিশরে ও মেসোপটেমিয়াই সকলের আগে যৌথ-পরিবারে অসমতা দেখা দেয়। ধনী-দরিদ্রের সৃষ্টি হয়; শ্রেণী গড়িয়া উঠে; শোষণ প্রথার উৎপত্তি হয়। সভ্যতার একটা বড় বিশেষত্ব শ্রেণীশাসন; মিশর ও মেসোপটেমিয়ায়ই এইরূপ রাষ্ট্রের জন্ম হয় সকলের আগে। এই দুই দেশের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির প্রভাব অনেক জায়গায়ই ছড়াইয়া পড়ে।

(১)

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীসের নিচের দিকটা,—যেখানে এই খরস্রোতা নদী দুইটি মিলিয়াছে—পুরাকালে তাহার নাম ছিল সেন্নার। খৃষ্টজন্মের ৫০০০ কি ৪০০০ হাজার বছর পূর্বে সেন্নারের সমুদ্রঅঞ্চলে সুমেররা বাস করিত।

উত্তর দিকটাতে বাস করিত পশুপালক আক্কাডিয়ানরা; এই যাযাবর জাতি আরব দেশ হইতে সেন্নারে আসে। ইহাদের প্রধান শহর আক্কাডা।

সেন্নারের ভূমি সমুদ্রের পলিতে গড়া। কিন্তু কোন কোন জায়গা ছিল জলা। জমি খুব উর্বর বটে, কিন্তু নদীর প্লাবনে কৃষির অসুবিধা হইত। সেন্নারের অধিবাসীরা বাঁধ তৈয়ার করিয়া বন্যা ঠেকাইত; এদিকে গ্রীষ্মকালে যখন জলের অভাব হইত, তখন সেচের জন্য জলের অভাব হইত না।

সুমেরু এবং আক্কাডিয়ানরা প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম মৃত্তিকাস্তূপের উপর শহর, গ্রাম এবং মন্দির গড়িত। সেন্নারের অধিবাসীরা খাল কাটিয়া লইত; জমিতে খাত থাকিত; একরকম বিশেষ ধরনের ইঞ্জিনে খালের জল খাতে আনা হইত। অনেক সময়ে একালের চেয়েও অনেক বেশী সুকৌশলে প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করা হইত। সে সময়ে সেন্নারের জমিতে ফসল হইত বছরে দুইবার; কিন্তু এযুগে একবারের বেশী ফসল উৎপাদন করা যায় না। শ্রমের কৌশল ছিল তখন এত উন্নত।

সমাজের কাঠামোও ছিল অন্যরকম; যাহারা শ্রম করে তাহাদের উপর এখনকার মত অত্যাচার ছিল না। তাহাদের শোষণ করা হইত না। যখন সেন্নারে প্লাবন ঠেকানোর জন্য বাঁধ বাধা, খাল কাটা, ইঞ্জিনে খাতে জল আনা—এসব বিস্ময়কর কাজগুলি হয়, তখন ছিল স্বাধীন যৌথগ্রাম। মনিব বা অত্যাচারী প্রভু বলিয়া কেহ ছিল না।

সারা গাঁয়ের লোকেদের সমবেত শ্রমেই বাঁধ তৈয়ার করা হইত, খাল কাটা হইত। খাল, হ্রদ প্রভৃতির উপর ছিল সকলের অধিকার। জমি যৌথ-গ্রামের লোকদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইত। প্রয়োজনমত জমির পুনর্বণ্টনও করা হইত। উৎকৃষ্ট জমি প্রায়ই নেতা ও বৃদ্ধদের ভাগে পড়িত; এইসব জমি তাহাদের বংশধরেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইত। পুনর্বণ্টনের সময় এসব জমির উপর হাত পড়িত না; এগুলি নেতা ও বৃদ্ধদেরই থাকিয়া যাইত। পুরোহিতদেরও স্থায়ীভাবে ভোগ করার জন্য দেওয়া হইত ভাল ভাল জমি। নেতা, বৃদ্ধ ও পুরোহিতেরা জলাভূমির জল নিকাশ করাইয়া জমি বাড়াইয়া লইত। যেসব লোক ফসল নষ্ট হইলে তাহাদের নিকট হইতে কর্জ লইত, তাহাদেরই ইহারা এসব কাজে খাটাইত। কর্জ যথাসময়ে শোধ দিতে না পারিলেই উহাদের জমির দখলও চলিয়া আসিত নেতা, বৃদ্ধ ও পুরোহিতদের হাতে এবং ওরা দাসত্বে আট্কা পড়িত। এইভাবে সেন্নারের যৌথগ্রাম-ব্যবস্থায় দেখা দেয় ভূমিহীনদাসের দল।

পাহাড় অঞ্চলের পাহাড়িয়াদের ও তৃণভূমির লোকেদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য কৃষকেরা অনেক সময়ই অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইত। সামরিক আয়োজনের ভার থাকিত সর্দার ও বৃদ্ধদের উপর। যুদ্ধের এইসব নেতা ও

তাহাদের ছেলেরাই শুধু ব্রোঞ্জের অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিত। একজন সাধারণ কৃষক কখনও ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত হইতে পারিত না। তাই সর্দারেরা ও বড়লোকেরা সাধারণ কৃষকদের বাদ দিয়াই যুদ্ধে বাহির হইত। ধীরে ধীরে যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারটা ইহাদের একচেটিয়া হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা নূতন উপাধি নেয় 'ইসাক', অর্থাৎ রাজা। কৃষকদের বাদ দিয়া ইহারা নিজেরাই যুদ্ধ করিত; কৃষকদের নিকট হইতে একটা কর লওয়া হইত। এই কর অন্য আর কিছুই নয়,—নূতন রাজাদের জমিতে কৃষকদের কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। স্বাধীন কৃষক এখন বড় বড় জমিদারদের দাস। ইসাকরা ধীরে ধীরে গ্রামের যৌথজমিও দখল করিয়া লয়। গ্রাম্য যৌথজীবন ভাঙিগয়া যায়। নূতন সমাজের উপরের দিকে জমিদারের দল,—নিচে দাস-কৃষক ও দাস-কারিগর। এইরূপ সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ।

সেন্নার ও আক্কাডায় কয়েকশ' জমিদারী ছিল। উৎকৃষ্ট জমিগুলি জমিদাররা নিজেদের দখলে রাখিত, নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিত। সামরিক কর্মচারী ও পুরোহিতদের দেওয়া হইত একটা অংশ। বাকী অংশ অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমিগুলি কৃষকদের। খুব কম কৃষকেরই জমি ছিল; যাহাদের ছিল তাহাদের জমি আবার নিতান্ত ক্ষুদ্র। কৃষকদের উচ্চহারে খাজনা দিতে হইত, তাহাছাড়া জমিদারের জমিতে বাধ্যতামূলক খাটুনি দিতে হইত। কারিগরদেরও এইরূপ খাটিতে হইত। প্রাসাদ ও মন্দিরের চারিদিকে কারিগরদের বসতি। প্রত্যেক মন্দিরে ও প্রাসাদে স্ত্রী ও পুরুষ দাস থাকিত; ইহারা যুদ্ধের বন্দী; ঘরের কাজেই ইহাদের খাটানো হইত বেশী।

বড় বড় কয়েকটি মন্দিরের পুরোহিতরাও ইসাকই। এইরকম একজন ইসাক নিপ্পুরের এন্‌লিল। ইনি ছিলেন সুমেরদের শ্রেষ্ঠ দেবতার প্রধান পুরোহিত। আক্কাডিয়ানদের প্রধান দেবতার পুরোহিত সিপ্পারের সামাসা-ও ছিলেন একজন বড় ইসাক্। পুরোহিতেরা বলিতেন, এই দেবতারা ফসলের কর্তা।

ইসাকেরা কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিত। সাধারণত জমি লইয়াই যুদ্ধ বাধিত। একজন পরাক্রান্ত ইসাক প্রতিবেশী ইসাকদের পরাজিত করিতে পারিলে উহাদের সকলের রাজা হইয়া বসিত। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার চার হাজার বছর আগে কখনো কখনো দেখা যাইত যে সমগ্র সেন্নার একজন রাজার অধীনে এবং সমগ্র জমি দুই কি তিনজনের দখলে আসিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অধীনস্থ ইসাকদের সৈন্য এবং অস্ত্র দিয়া রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। ইসাকরাও আবার রাজার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অনেক সময় তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিত।

রাজা ও ইসাকেরা মনে করিত, তাহারা স্বয়ং ঈশ্বরের বংশধর। ইহারা

ঘোষণা করিত, 'স্বাধীন মানুষেরা ঈশ্বরের ছায়া, দাস মানুষের ছায়া; রাজা প্রায় ঈশ্বরই।' পুরোহিতেরা রাজা ও ইসাকদের দাবি সমর্থন করিয়া নানা-রকম কাহিনী রচনা করিত। সাধারণ লোক এইসব বিশ্বাস করিত। কিন্তু নানারকম প্রপীড়নে যখন কৃষকের জীবন দুঃসহ হইয়া পড়িত, তখন আর পুরোহিতদের প্রচার তাহাদের বেশীদিন দমাইয়া রাখিতে পারিত না। কৃষকেরা মাঝে মাঝেই প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে ছাড়ে নাই।

রাজা, পুরোহিত এবং ইসাকেরা প্রতিবেশী পাহাড়িয়াদের সঙ্গে এবং তৃণ-ভূমির লোকেদের সঙ্গে বাণিজ্য করিত। ইহারা কৃষিপণ্যের বিনিময়ে ধাতু এবং কাঠ সংগ্রহ করিত। বিশেষ একশ্রেণীর লোক দিয়া বাণিজ্য করা হইত। ইহাদের বলা হইত 'ডামকার'। এই ডামকারেরা দাস এবং কারিগরদের সন্তান। ইহারা স্বাধীন ব্যবসায়ী নয়।

সামন্ত প্রভুদের আজ্ঞা মানিয়া ইহাদের চলিতে হইত। উট এবং খচ্চরের পিঠে করিয়া উহারা বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। পাহারা দেওয়ার জন্য ইহাদের সঙ্গে সৈন্য দেওয়া হইত। সৈন্যরা পথে লুঠতরাজ করিত, বিদেশীদের আক্রমণ করিত এবং কিছু কিছু দাস সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিত। কখনো কখনো ইসাকেরা নিতান্ত তুচ্ছ কারণে বিদেশীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইত; লুঠতরাজ করিয়া ধাতুদ্রব্য, কাঠ এবং মূল্যবান পাথর সংগ্রহই থাকিত উদ্দেশ্য। খৃষ্ট-জন্মের তিন হাজার বছর আগে রাজা, পুরোহিতেরা বাণিজ্য এবং লুঠত-রাজদ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল, নিপ্পুর ও সিপ্পারের পুরোহিতেরাই বিশেষভাবে ধনবান্ নয়। বিনিময়ের জন্য উহাদের বাড়্তি মাল থাকিত যথেষ্ট। অনেকে যুদ্ধযাত্রার আগে পুরোহিতদের নিকট তাহাদের ধন মজুত রাখিত। কেহ যুদ্ধে নিহত হইলে তাহাদের গচ্ছিত ধন মন্দিরেরই সম্পত্তি হইয়া যাইত। পুরোহিতেরা রাজাদের এবং ডামকারদের বেশী সুদে ধার দিত।

ডামকারেরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে পারিত না; কিন্তু রাজা এবং পুরোহিত ইহাদের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া আমদানি দ্রব্যের একটা অংশ ডামকারদের দিত। ডামকারেরা কৃষকদের নিকট হইতে এইসব দ্রব্যের বিনিময়ে বার্লি, গম ও অন্যান্য কৃষিজাত জিনিস সংগ্রহ করিত। ধীরে ধীরে বিদেশের সঙ্গে এবং দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হইতে থাকে। সামন্ত প্রভুরা ডামকারদের দিয়াই বাণিজ্যের কাজকারবার চালাইত। ইহাতে ডামকারেরা বেশ লাভবান্ হয়। এই নূতন-অর্জিত ধনদ্বারা তাহারা স্বাধীনতা ক্রয় করার সুযোগ পায়। রাজা-পুরোহিতদের মোটা টাকা দিয়া ডামকারেরা স্বাধীনতা ক্রয় করে; এখন আর তাহারা পরাধীন নয়। ডামকারেরা স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতে থাকে। বাণিজ্য বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে; ফলে

হস্তশিল্পের উন্নতি হয়। হস্তশিল্পীদের এখন রুজী বাড়িয়া যায়; তাহারাও সামন্তপ্রভুদের নিকট হইতে স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লওয়ার চেষ্টা করে। সম্পন্ন কৃষকেরাও একই রকম চেষ্টা করিতে থাকে। এদিকে গরীব কৃষকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়। শ্রেণীসংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়; কৃষক এবং কারিগরেরা অত্যাচারী রাজা, জমিদার, পুরোহিত প্রভৃতি সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একবার নয়, বহুবারই এরকম বিদ্রোহ হয়।

গরীব কৃষকেরাই বিদ্রোহের সৈনিক; নেতাও তাহারাই। অভাবের তাড়নায় এবং অত্যাচারের কষাঘাতে তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হয়। কৃষকের উপর কর ছিল অবিশ্বাস্যরকম উচ্চহারের। এদিকে, পুরোহিতদের দাবি, শস্যের বদলে রৌপ্য চাই। সাধারণ কৃষকের পক্ষে রৌপ্যের দাবি মিটানো কখনো সম্ভব নয়। কৃষকেরা নিয়মিত কর দিতে অসমর্থ হইলেই জমি হইতে বিতাড়িত হইত এবং মনিবের দাসে পরিণত হইত। এদিকে, ধনী কৃষকেরা গরীব কৃষকদের ধার দিতে থাকে; ধার ঠিক সময়ে শোধ দিতে না পারিলেই জমি ছাড়িয়া দিতে হয়।

জমিহীন কৃষকেরা যখন বিদ্রোহ করিত, তখন ইহাদের সঙ্গে কারিগর, সম্পন্ন কৃষক, এমনকি ব্যবসায়ীরাও যোগ দিত। কেহই পুরাপুরি স্বাধীন ছিল না। সম্পন্ন কৃষকেরাও একরকম ভূমি দাসই ছিল। কৃষকের বিদ্রোহ দীর্ঘ দিন চলে। বিদ্রোহ সফল হইলে প্রতিবারই দেখা গিয়াছে, ধনী কৃষকেরা গরীব কৃষকদের ত্যাগ করে। তাহারা নিজেদের পছন্দমতো কাহাকেও সিংহাসনে বসায়। একবার সিংহাসনে বসানো হইয়াছিল মদের দোকানের কোনও কর্ত্রীকে। আক্কাডার কৃষক ও ব্যবসায়ীরা রাজার একজন মালীকে সিংহাসনে বসায়। নূতন রাজারা সিংহাসনে বসিয়াই কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তন করিত বটে, কিন্তু তাহাতে লাভবান্ হয় ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ীরাই বেশী। লাগাস্ অঞ্চলে উরুকাগিন্ যে সব সংস্কার করেন, তাহা এখন ভালরকম জানা গিয়াছে। লাগাসের বিদ্রোহ হইয়াছিল পুরোহিতদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ সফল হইলে উরুকাগিনকে রাজা মনোনীত করা হয়। উরুকাগিন্ রাজা হইয়াই সকলকে স্বাধীনতা দেন। টেক্সও কমে। কিন্তু প্রকৃত লাভ হইয়াছিল যাহারা বড় তাহাদেরই।

সে সময়ে সকলের চেয়ে প্রতিপত্তিশালী সামন্তপ্রভু আক্কাডার রাজা সারুকেন্নু। সেন্নারের সকল সামন্তই তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। সমগ্র সেন্নার হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সীরিয়ার কতক অংশ দখল করেন। যে ইসাকই তাহার অবাধ্য হইত তিনি তাহাকেই সরাইয়া দিতেন। খৃঃ পূঃ ২৬০০ সাল হইতেই সেন্নার সুমের ও আক্কাডিয়ানদের যুক্তরাজ্যে পরিণত হয়। সেন্নারে কেন্দ্রীভূত রাজ্য গড়িয়া উঠে। বড় কৃষক ও ছোট জমিদারদের

লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হয়; পুরোহিতেরা ও ডামকারেরা রাজাকে সকল-রকমে সমর্থন দিতে থাকে। কেন্দ্রীভূত শাসনই ইহারা চায়। কেননা রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকিলেই ভালভাবে শোষণ করার সুবিধা হয়। অবাধ্য ইসাকদের দমন করার জন্য এবং পাহাড়িয়া অঞ্চল আক্রমণ করার জন্য উহারা রাজাকে প্ররোচিত করিত এবং অর্থসাহায্য করিত। পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলি খুব সমৃদ্ধ ছিল; ধাতুদ্রব্য ও মূল্যবান্ কাঠ সেখানে প্রচুর।

এই সব পরিবর্তনের ফলে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে একটা ওলট-পালট হয়। যুদ্ধে এবং বিদ্রোহে অনেক বড় বড় পরিবার ধ্বংস হইয়া যায়। তাহাদের জমি কিছু যায় রাজার হাতে, কিছু যায় রাজার অমাত্যদের হাতে; পুরোহিতেরাও কিছু আত্মসাৎ করে। কোন কোন ব্যবসায়ী নামমাত্র মূল্যে জমিদারী ক্রয় করে। যাহা হউক, ভূম্যধিকারী-প্রথা লোপ পায় নাই; উহার রূপই মাত্র বদল হয়। জমিদার আর এখন নিজের জমিদারীর মধ্যে শাসনক্ষমতা খাটাইতে পারে না; কিন্তু শোষণের কিছুমাত্র বিরাম হয় নাই—শোষণ পূর্বের মতই চলিতে থাকে। রাজার দরবারে ইহারাই প্রধান অমাত্য; ইহাদের গৃহে দাস-দাসীর অভাব নাই। কৃষকেরা নামে মাত্র স্বাধীন ছিল; কৃষকের উপর অত্যাচার কমে নাই। পূর্বেকার সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে প্রভেদ এইখানে যে আগে জমিদাররা নিজেদের জমিদারীতে ছিল রাজা, শাসনক্ষমতা তাহাদেরই ছিল; এখন ইহারা নিজেদের জমিদারী চালায় রাজার অধীনে। এখনকার সামন্ততন্ত্রকে বলা যাইতে পারে কেন্দ্রীভূত সামন্তরাষ্ট্র।

এই নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয় খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগে। সিপ্পারের নিকট ইউফ্রেটীসের তীরে একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল, উহার নাম ব্যাবিলোন। আমুরু নামে আরবের একটি পশুপালক জাতি ব্যাবিলোন দখল করে। ইহারা এখানে বাস করিতে থাকে। আমুরুদের সর্দার ব্যাবিলোনের ইসাক পদে বসে। ইলেমাইটদের আক্রমণে তখন আক্কাডিয়ানরা বিধ্বস্ত। আমুরু-রা ক্রমে ক্রমে সমগ্র আক্কাডিয়া দখল করিয়া লয়। ব্যাবিলোনের আমুরু-ইসাক এখন 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করে। ষষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি খৃঃ পূঃ ১৯৫০ সালে সুমেরদের পরাজিত করে। এইভাবে ব্যাবিলোন-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ধীরে ধীরে ব্যাবিলোন বিশেষ সমৃদ্ধ হয়। সেন্নারের এখন নাম হয় ব্যাবিলোন। সুমের এবং আক্কাডিয়ানদের এখন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুছিয়া যায়।

ব্যাবিলোনের রাজারা জমিদারদের রাজা। অবশ্য পুরোহিত ও বড় বড় ব্যবসায়ীর স্বার্থের দিকেও রাজাদের দৃষ্টি ছিল। রাজারা ইহাদের বিশ্বস্ত পৃষ্ঠপোষক। তাই এমনভাবে উহারা কানুন তৈয়ার করিত যেন জমিদার, পুরোহিত ও ব্যবসায়ী অবাধে গরীব কৃষককে শোষণ করিয়া যাইতে পারে।

রাজা হাম্মুরাবির কানুনের মর্ম ছিল : লাভ সবটাই ধনীর, লোকসান গরীবের।

বড় বড় জমিদারিগুলি প্রায় সবই ছিল রাজার নিজের; তাহা ছাড়া, অমাত্য ও পুরোহিতদেরও বৃহৎ সম্পত্তি ছিল। সামরিক কর্মচারীদের দেওয়া হইত জায়গীর। যুদ্ধে রাজার সহায়তা করিবে, এই শর্তেই জায়গীর দেওয়া হইত। কিন্তু কোন সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইলে অথবা সামরিক চাকুরি ছাড়িয়া দিলে জায়গীর রাজার খাসে চলিয়া আসিত। অবশ্য জায়গীরদারদের সন্তানেরা সামরিক কাজে যোগ দিলে, জায়গীর তাহাদেরই দেওয়া হইত।

জমিদার ও পুরোহিত জমি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে বিলি করিত। কিন্তু জমি দেওয়া হইত কড়া শর্তে। হাম্মুরাবির কানুন অনুসারে খাজনা দিতে হইত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ; ফলের বাগান হইলে দিতে হইত দুই-তৃতীয়াংশ। উহার উপর, রাজার খাজনা ফসলের দশ হইতে পনর ভাগ। খাজনা দিতে দেরী হইলে সুদ ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইত। কৃষক একেবারেই অসমর্থ হইলে হাম্মুরাবির কানুন অনুসারে তাহাকে দাস বানানো হইত।

ভূমিহীন চাষীদের অবস্থাই ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অন্যের জমিতে তাহারা অত্যন্ত কম মজুরিতে খাটিত। তাহাও আবাব, কাজ যোগাড় করা ছিল খুবই শক্ত। কারণ জমিদার এবং পুরোহিতদের দাসের অভাব ছিল না। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের অবস্থাও খারাপ ছিল, কেননা বড় ব্যবসায়ীরা লোকসানের প্রায় সবটাই ছোট ব্যবসায়ীদের উপর চাপাইয়া দিত। রাজার কানুন এবিষয়ে বড় বড় পাইকারদের স্বার্থই দেখিত। হস্তশিল্পীরা স্বাধীনই ছিল বটে, কিন্তু কাহারও কোন ফরমাইস আসিলে মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ চুক্তি করিতে পারিত না। আইনের এবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল; মজুরি কখনো কয়েক পয়সার বেশী হইতে পারিবে না।

বাবিলোন, সিপ্পার, নিপ্পুর, প্রভৃতি বড় বড় শহরে স্বায়ত্তশাসন ছিল। হাম্মুরাবি বলিতেন, তাহার কানুনদ্বারা তিনি ধনী এবং বড় লোকদের স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। বাবিলোন-রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র ইহা হইতে পরিস্কার ফুটিয়া উঠে।

বাবিলোনীয়দের রাজত্ব শেষ হইলেও, সামাজিক কাঠামোর কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। রাজবংশের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু নূতন রাজারা মোটেই ভুলে নাই যে তাহারা জমিদার ও পুরোহিতদের স্বার্থের রক্ষক। টাইগ্রীসের উপরিভাগে ইরান সীমান্তের দিকে পাহাড় অঞ্চলে এসীরিয় জাতি বাস করিত। হাম্মুরাবির আমলে এসীরিয়া ছিল তাহার অধীনস্থ

স্থানীয় একজন ইসাকের জমিদারী। এসীরিয়ায় প্রায় সবরকমের প্রয়োজনীয় ধাতু পাওয়া যাইত। শিল্পকার্যে এবং যুদ্ধে এসীরিয়ানরা যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করে; তাহাদের উৎপাদনের যন্ত্র এবং যুদ্ধের অস্ত্র ছিল ধাতুর।

এসীরিয়ায় কাঁচামাল প্রচুর; তাই সেখানকার অধিবাসীরা প্রথমটায় ব্যবসায় করিত। নিনেভ শহরে তাহাদের একটা বড় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এসীরিয়ার শাসকেরাও বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিত। প্রতিবেশীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের পর-রাজ্য দখলের লোভ জন্মে।

এসীরিয়ায় লোকসংখ্যা বেশী, কিন্তু জমি কম। খৃঃ পূঃ ৮০০-৬৬৮'র মধ্যে এসীরিয় বাহিনী সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও আর্মেনীয়া জয় করে। বাবিলোন স্বেচ্ছায় এসীরিয়ানদের বশ্যতা স্বীকার করে। এসীরিয়ার রাজারা যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য অমাত্য, পুরোহিত ও সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিত। সৈন্যবাহিনীর উপর-ই এই রাজাদের একান্ত নির্ভর ছিল। বিজিত দেশ-গুলির শাসনভার অর্পণ করা হইত সমর-নায়কদের উপর।

অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ এবং উচ্চহারের টেক্স প্রভৃতির চাপে বিজিত দেশের লোকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এসীরিয়ানদের তাহারা ঘৃণা করিত, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হইত। নির্মমভাবে এইসব বিদ্রোহ দমন করা হইত।

এসীরিয়ানদের রাজত্বকালে যুদ্ধবন্দী ও দাসদের সংখ্যা খুবই বাড়িয়া যায়। ইহারাই বিদ্রোহ করিত। দাসদের খনির মধ্যেই খাটানো হইত বেশী। কৃষকদের প্রসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণের কাজে বাধ্যতামূলকভাবে খাটিতে হইত। বিদ্রোহের সময়ে কৃষকেরাও দাসদের সঙ্গে যোগ দিত। অবিরত শ্রেণীসংঘর্ষে এসীরিয় রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে; পরিশেষে উহার পতন ঘটে। এসীরিয় শক্তির পতন হয় খৃঃ পূঃ ৬০৬ সনে। বাবিলোনীয়রা পুনরায় তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। কালডিয়ান জাতির রাজা এখন বাবিলোনের শাসক। এইভাবে কালডিয়ান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

কালডিয়ান রাজত্ব টিঁকিয়াছিল মাত্র নব্বই বছর। পারস্যের কোন একটি জাতির রাজা কাইরুস খৃঃ পূঃ ৫৩৭ সনে টাইগ্রীস্-ইউক্রেটীস অঞ্চল, এশিয়ামাইনর, সীরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন জয় করেন। তিনি পরে মিশরও জয় করিয়াছিলেন। কালডিয়ান ও পারসীক শাসনের ভিত্তি ছিল সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক। বিজিত প্রদেশগুলিকে শাসকেরা এক একটি উপনিবেশে পরিণত করে। পারসীক রাজারা প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন সেট্রাপ নিযুক্ত করিত; সেট্রাপের হাতেই প্রদেশের শাসনভার। শুধু রাজকোষের জন্যই নয়, নিজেদের জন্যও এই শাসকেরা উচ্চহারে টেক্স বসাইত। কালডিয়ান ও পারসীক সামন্তপ্রভুদের আমলে বিজিত দেশের লোকেদের নির্মমভাবে শোষণ করা হইত।

পারসীক রাজারা পুরোহিতদের খুসী রাখিতে চেষ্টা করিত। মন্দিরের জন্য পৃথক জমি দেওয়া হইত, পুরোহিতদের নানারকমের সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হইত। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পুরোহিতেরাও ঘোষণা করে: রাজা কাইরুস ও তাহার উত্তরাধিকারীরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি; অতএব সাধারণ লোক ঈশ্বরকে যেমন ভয় করে, রাজাকেও তাহাদের তেমনি ভয় করা উচিত।

পারসীক রাজারা তাহাদের কোষাগারে প্রভূত স্বর্ণ সঞ্চয় করে। কর ও শুল্ক হইতেই এই সঞ্চয় সম্ভব হয়। রাজারা নিজেরাও বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিত। কলডিয়ান ও পারসীক রাজত্বে অবশ্য বাবিলোনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। বাবিলোন ছিল সমগ্র প্রাচ্যের বাণিজ্যের ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। কালডিয়ান রাজা নেবুচেড্‌নেজরের সময়েই বাবিলোন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। নেবুচেড্‌নেজর দাস মজুর খাটাইয়া মন্দির, অট্টালিকা ও প্রমোদকুঞ্জ তৈয়ার করান। বাবিলোনে তখন প্রতিপত্তিশালী কয়েকটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানেরও আবির্ভাব হয়। ব্যাঙ্কারদের তত্ত্বাবধানে বহুশিল্প গড়িয়া উঠে। পারসীক রাষ্ট্রশক্তির পতনকাল পর্যন্ত বাবিলোন অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৩৩০ সনে গ্রীকেরা বাবিলোন দখল করে।

(২)

সেন্নারের মতই মিশরেও শ্রেণীসমাজ ছিল সভ্যতার সূচনা হইতেই। নীল-নদের অববাহিকায় সংকীর্ণ সমতলক্ষেত্রই মিশর। মিশরের পূর্ব ও পশ্চিমে সুবিস্তৃত পর্বতমালা। পশ্চিমের পর্বতমালার অপর দিকটাতে সাহারা মরুভূমি। মরুভূমির গায়ে-লাগা এই সমতলক্ষেত্র যেন একটা সুবিস্তৃত ওয়েসিস। মিশরে বৃষ্টি নাই বলিলেই হয়; দৈবাৎ কখনও বৃষ্টি হইলে মিশর-বাসী ভাবিত, উহা অশুভ। বছরে একবার নীলনদের প্লাবন হয়। প্লাবন না হইলে মিশর দেশ শুষ্ক অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হইত।

প্লাবনের সময় চারিদিক জলে ভরিয়া যায়; গ্রামগুলি মনে হয় যেন দ্বীপ। দীর্ঘ চার মাস এই প্লাবন স্থায়ী হয়। বন্যায় জমিতে পলি পড়ে, উহা উত্তম সার। এই কারণেই মিশরের জমি খুব উর্বর। চাষ খুবই সহজ, কেননা বন্যার পর মাটি নরম হয়। কৃষিই মিশরবাসীর প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন মিশরীয়রা গম, বার্লি ও শণের চাষ করিত।

অতি প্রাচীনকালেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল জানা ছিল; বাঁধ তৈয়ার করিয়া জল ঠেকানো হইত। গ্রীষ্মকালে জমির সেচের জন্য কিছু জল আটকাইয়া রাখা হইত। বড় বড় কৃত্রিম হ্রদ তৈয়ার করা হইত; বন্যার সময়

সেগুলি জলে ভরিয়া থাকিত। খাল কাটিয়া জমিতে নদীর ও হ্রদের জল আনা হইত। বাড়ি-ঘর, মন্দির ও প্রাসাদ—এসব তৈয়ার করা হইত উঁচু-জায়গায়। জল ঠেকানোর জন্য এগুলির চারিদিকে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

খৃষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর ত্রিশ কি চল্লিশটি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কোন না কোন পশুর নামে ছিল প্রদেশগুলির নাম। তাই মনে হয় টোটেম সমাজ হইতেই প্রদেশগুলি প্রথম গড়িয়া উঠে। টোটেম সমাজ শিকার ছাড়িয়া কৃষি আরম্ভ করে; যৌথ পরিবার গড়িয়া উঠে; তারপর যৌথগ্রাম—কিন্তু এত ওলটপালট সত্ত্বেও টোটেম নাম থাকিয়াই যায়।

প্রাচীন যৌথগ্রামগুলিই বন্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল আবিষ্কার করিয়া জল ঠেকানোর ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহারাই পরে সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়; ছোট ছোট এক একজন রাজা এই সব রাজ্য শাসন করিত। ধীরে ধীরে প্রদেশগুলি এক হয়। খৃঃ পূঃ ৩৩০০ সনে সারা মিশর একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়; কিন্তু উহার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর কিছুই বদল হয় নাই।

মিশরের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সকলের উপরে ছিল রাজা, তারপর সামন্ত জমিদার ও মন্দিরের পুরোহিত। মিশরের রাজাকে বলা হইত 'ফেরায়ো'। রাজারা মনে করিত, স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজত্ব পাইয়াছে। কোন কোন সামন্ত নৃপতির এত বড় জমিদারী ছিল যে রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাহাদের পক্ষে মোটেই শক্ত ছিল না। নেহুর নামে একজন সামন্ত নৃপতির অধীনে ছিল ছাব্বিশটি শহর; সঙ্গে জমিও ছিল সেই পরিমাণ।

পুরোহিতেরাও ছিল বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক। পুরোহিতেরা আবার অনেকেই রাজবংশের-ই। ফেরায়ো এবং সামন্ত নৃপতিরা মনে করিত, মৃত্যুর পরেও তাহাদের আত্মা অমরই থাকে, উহাদের আহারের প্রয়োজন হয়, তাই ফেরায়ো এবং সামন্তনৃপতিরা পুরোহিতদের জমিজমা দিত; উহার আয় হইতে পুরোহিতেরা রাজার এবং সামন্তনৃপতিদের আত্মার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিত।

ফেরায়ো রাজা হইলেও নিজের খেয়ালমতো চলিতে পারিত না; তাহাকে নির্ভর করিতে হইত সামন্তনৃপতি ও পুরোহিতদের ইচ্ছার উপর। ইহাদের সব সময়ই তুষ্ট রাখিতে হইত। রাজপ্রতিনিধিরা সাধারণত সীমান্তের দিকের দেশগুলিই শাসন করিত; মিশরের বাকী অংশে প্রকৃতপক্ষে সর্বেসর্বা ছিল সামন্ত ও পুরোহিত। সামন্ত এবং পুরোহিতেরা অনেক সময়ই ফেরায়োকে সিংহাসনচ্যুত করিত। মিশরে রাজবংশের পরিবর্তন হইয়াছে বার বার।

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো যতদিন ছিল, সে সময়ের মধ্যে সাতাশটি রাজবংশের উত্থান-পতন হইয়াছে।

কৃষক স্বাধীনভাবে চাষ আবাদ করিতে পারিত না; তাহারা ছিল প্রকৃত-পক্ষে ভূমিদাস। রাজা পুরোহিতকে জমি দান করিলে, দানপত্রে উল্লেখ থাকিত—গরু-মহিষ ও কৃষকসহ জমিদান করা হইয়াছে। জমির মালিক কৃষককে গরু-মহিষের মতই উৎপাদনের উপায় মনে করিত। কৃষকের যদি কিছুটা স্বাধীনতা থাকিতও, তাহাও আবার ঋণের দায়ে চলিয়া যাইত। অজন্মার সময়ে কৃষক মালিকের নিকট হইতে শস্য কর্জ লইত; কিন্তু ঠিক সময়ে শোধ দিতে না পারিলেই তাহাকে দাস বানানো হইত। কৃষক ছাড়াও মনিবদের নানাজাতের দাস থাকিত। নিগ্রো, লিবিয়ান ও যাযাবর আরবদের ধরিয়া আনিয়া খাটানো হইত। অনেক মনিবই নিজের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করিয়া দিত; কিন্তু ফসলের মোটা অংশ কৃষকের কর হিসাবে দিতে হইত।

ইহার উপর ছিল বাধ্যতামূলক শ্রম। প্রাসাদ, মন্দির, কবর প্রভৃতির নির্মাণকার্যেই দিতে হইত এই খাটুনি। ফেরায়ো, সামন্তনৃপতি ও পুরোহিতেরা প্রায় নিত্য নূতন অট্টালিকা তৈয়ার করাইত। পিরামিড্ তৈয়ারীই ছিল সবচেয়ে শক্ত। পিরামিড্ পাথরের তৈয়ারী। ফেরায়োরা তাহাদের মৃতদেহ রক্ষার জন্য পিরামিড্ বানাইত। ফেরায়ো হুফুর তৈয়ারী পিরামিড-ই সকলের চেয়ে বড়; উচ্চতায় উহা প্রায় ১৫০ মিটার; উহার প্রত্যেকটি পার্শ্ব দৈর্ঘে অন্তত ২৪০ মিটার। এই পিরামিডটির কাজের জন্য সারা মিশর হইতে শ্রমিক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ত্রিশ বছর ব্যাপিয়া ইহার কাজ হয়। পাহাড় হইতে শ্রমিকেরা পিঠে করিয়া পাথরের বোঝা আনিত; সর্দারেরা সকল সময় চাবুক লইয়া প্রস্তুত থাকিত। কোন রকম ত্রুটি দেখিলেই চাবুক মারা হইত।

শ্রমিকের উপর নির্যাতনের জন্য ফেরায়োহুফু ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। পুরোহিতেরা অবশ্য তাহার প্রশংসা করিত। সাধারণ লোক যাহাতে শান্ত থাকে, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, সেজন্য পুরোহিতেরা সর্বদা তাহাদের মনে ধর্মের ভয় ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। এককথায়, ধর্মকে ইহারা শোষণের উপায়রূপে কাজে লাগাইয়াছে।

ফেরায়োদের কাঠের অভাব ছিল। তাই তাহারা নদীপথে কাঠ আনাইত নিগ্রোদের দেশ হইতে। ফেরায়োর লোকেরা সেখানে সোনার সন্ধান পায়। ফেরায়োরা সৈন্য পাঠাইয়া নিগ্রোদের দেশ জয় করে এবং তথাকার সমস্ত সোনা হাত করে। নিগ্রোদের দেশকে বলা হইত 'নুবিয়া' বা সোনার দেশ।

সীরিয়ার গেবেল শহর হইতেও মিশরে কাঠ আসিত। গেবেল শহর ছিল সমুদ্র তীরে; গেবেলের রাজা সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিত। গেবেল প্রদেশের এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অন্যান্য শহরের জমি শক্ত, শুকনো ও অনুর্বর; তাই এসব জায়গার অধিবাসীরা কাঠ, তামা প্রভৃতির বিনিময়ে মিশর হইতে রুটি সংগ্রহ করিত। ফেরায়োরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য সমুদ্রপথে এইসব শহরে বড় বড় নৌকা পাঠাইত। নৌকাগুলি সবই দাস-শ্রমের তৈয়ারী।

কৃষকেরা তাহাদের নির্যাতনকারীদের ঘৃণা করিত; তাই যখনই সুযোগ উপস্থিত হইত তাহারা বিদ্রোহ করিত। বিদ্রোহ সারা মিশরে ছড়াইয়া পড়িত। বিদ্রোহ বলিলে কম বলা হয়, অন্তত দুই দুইবার কৃষকের বিদ্রোহ ব্যাপক যুদ্ধের আকার ধারণ করিয়াছিল।

প্রথম কৃষকের যুদ্ধ হয় খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে। গোড়ায় মিশরের সামন্তনৃপতিরা ফেরায়োদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফেরায়োরা পিরামিড নির্মাণের জন্য কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে খাটাইত। ইহাতে অসুবিধা হইত সামন্তনৃপতিদের; কেননা নিজেদের কাজের জন্য তাহারা লোক পাইত না। রাজবংশের পতন ঘটাইয়া তাহারা সিংহাসন অধিকারের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে কৃষকেরা বিদ্রোহ করিয়া বসে। কৃষকের সশস্ত্র বিদ্রোহ সারা মিশরে ছড়াইয়া পড়ে।

নিম্ন মিশরে কৃষকেরা তাহাদের মনিবদের পরাজিত করে। 'রা-'র মন্দিরের কৃষকেরা পুরোহিতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। মৃত রাজাদের আত্মার উদ্দেশ্যে যে সব জমি উৎসর্গ করা হইত—অর্থাৎ পিরামিডের সঙ্গে যে সব জমি থাকিত কৃষকেরা সেগুলিও অধিকার করে। পুরোহিতদের তাহারা তাড়াইয়া দেয়। কৃষকেরা নিম্ন মিশরের কতকগুলি সামন্তনৃপতিকে তাহদের স্বপক্ষে পায়। কিন্তু উহাদের একজন—থিবের সামন্তরাজা—বিদ্রোহ দমন করিয়া সারা মিশর নিজের দখলে আনে। তখন হইতে থিবই হইয়া উঠে মিশরের রাজধানী এবং থিবের রাজারাই হয় ফেরায়ো। নূতন ফেরায়োরা ছোট ছোট পিরামিড্ তৈয়ার করাইত; এই কাজের জন্য তাহারা নিজেদের কৃষক ও দাসদেরই খাটাইত; অন্য জায়গা হইতে লোক আনাইত না।

আরও একবার কৃষক বিদ্রোহ হয় খৃষ্টের জন্মের আঠারশ' বছর আগে। কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয় হস্তশিল্পী কারিগরেরা এবং দাসেরা। কারিগরেরা ক্ষমতা হাত করে। শাসন নিজেদের হাতে লইয়াই তাহারা কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তন করে। রাজা, সামন্তরাজা এবং অন্যান্য অমাত্যদের দেশ হইতে তাড়ানো হয়। উহাদের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের

মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হয়। সারা দেশেই বিদ্রোহ হয়। একমাত্র মিশরের দক্ষিণাংশের কতক জায়গায় বিদ্রোহ ছড়ায় নাই।

কিন্তু কৃষকেরা বেশীদিন ক্ষমতা হাতে রাখিতে পারে নাই। আরবদেশের একটা পশুপালক জাতি মিশর আক্রমণ করে। সম্ভবত যে-সব সামন্তরাজা বিদ্রোহের সময়ে দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া আরবদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারাই উহাদের মিশর আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। এই বিতাড়িত সামন্তরা বিদেশীর সহায়তায় কৃষকদের দাবাইতে সমর্থ হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে উহাদের নিজেদের কোন সুবিধা হয় নাই। আক্রমণকারী আরবদের সর্দার মিশরের 'ফেরায়ো' পদে বসে। মিশরীয়রা আরবরাজাদের বলিত হাইকসস্ অর্থাৎ বিদেশী রাজা। হাইকসস্‌দের রাজত্ব একশ' পঞ্চাশ বছর টিঁকিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ১৬০০ সনে মিশরের দক্ষিণাংশের সামন্তনৃপতিরা থিবের রাজার নেতৃত্বে হাইকসস্‌দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। প্রথমত থিবের রাজা আহ্‌মোসি মিশরের দক্ষিণাংশের সমস্ত সামন্তদের তাহার অধীনে আনেন; এবং শেষ পর্যন্ত হাইকসস্‌দের মিশর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। আহ্‌মোসির সময় হইতে মিশরের সামন্ত ব্যবস্থা নূতন আকার লয়।

আহ্‌মোসি সামন্তরাজাদের ধ্বংস করিয়া তাহাদের জমিজমা নিজের দখলে আনেন; তিনি এখন মিশরের একচ্ছত্র রাজা। অবশ্য পুরোহিতদের প্রভাব কমে নাই। থিবের দেবতা এম্মনের পুরোহিতেরই প্রভাব সবচেয়ে বেশী। অনেক সময়ই এই পুরোহিতটি প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতেন।

ফেরায়োর সেনাবাহিনী এখন অন্যরকম। পূর্বে সেনাবাহিনীতে ছিল সামন্ত অধিপতিরা। ইহারাই নিজেদের লোকজন লইয়া রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিত। এখন আর সামন্তরাজার অস্তিত্ব নাই। ফেরায়ো কৃষকদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষকেরা বিদ্রোহ করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া রাজা এই চেষ্টা ছাড়েন। ফেরায়ো লিবিয়া ও নুবিয়া হইতে ভাড়াটে নিগ্রো আমদানি করিয়া সেনাবাহিনী গঠন করেন। ফেরায়ো এখন পুরামাত্রায় স্বৈরাচারী। তাহার প্রত্যেকটি আদেশই আইন। এই নূতন রাজবংশ দাবি করিতে থাকে যে তাহারা স্বয়ং ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী। অবশ্য, সাধারণ লোকের নিকট ফেরায়ো স্বয়ং ঈশ্বরই; কিন্তু শোষণকারী বড়লোক এবং পুরোহিতদের নিকট তিনি তাহাদের 'প্রধান সেবক'।

বিদ্রোহের সময়ে কৃষকেরা যে সমস্ত অধিকার আদায় করে এখন আর তাহার কিছুই নাই। পুরোহিতদের জমিদারীর কৃষকেরা প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাসই। যে-সব কৃষক রাজার জমি চাষ করিত টেক্সর উপরেও তাহাদের আরও একটা খাজনা দিতে হইত। এই খাজনা নির্মমভাবে আদায় করা হইত।

কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়, অনেক জায়গায়ই কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। বহু কৃষক জমি ছাড়িয়া দিনমজুরের জীবন যাপন করিতে থাকে। অনেকেই আবার দস্যুদের দলে যোগ দেয়।

থিবের ফেরায়োদের সীরিয়া জয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল বরাবরই। পূর্বে সীরিয়া হইতে কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে মূল্যবান্ পণ্য সংগ্রহ করা হইত। এখন ফেরায়োরা বাণিজ্যের ঘোরা পথে না গিয়া সোজাসুজি সীরিয়ার ধাতু, কাঠ প্রভৃতি হাত করিতে উদ্যত হয়। খৃষ্টজন্মের পনরশ' বছর পূর্বে এম্মন-দেবতার পুরোহিত তৃতীয় টাট্‌মস্ সীরিয়া জয় করেন। রাশি রাশি লুণ্ঠিত দ্রব্য মিশরে আসিতে থাকে; রাজা এবং পুরোহিত ছাড়াও সৈন্যরা এই লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পায়।

সামরিক কর্মচারীরা কখনো ইহা বরদাস্ত করিতে পারিত না যে পুরোহিতেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিয়াই লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগী হয়। পুরোহিতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সামরিক অভিজাতদের মধ্যে উহা বাঁটিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা ক্রমাগত ফেরায়োকে প্ররোচিত করিতে থাকে। আহ্‌মোসির মৃত্যুর পরে দুইশ' বছরের মধ্যে ফেরায়োদের খাসের জমি অনেকখানি কমিয়া যায়। নূতন জমি হাত করার লোভে এবং সামরিক অভিজাতদের প্ররোচনায় তাহারা পুরোহিতদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

পুরোহিতদের নিজেদের মধ্যে ছিল ঝগড়া। ফেরায়ো এমনিফিস্ তাহাদের এই কলহের সুযোগ নেন। থিবের পুরোহিত যখন দাবি করিল যে এম্মনই শ্রেষ্ঠ দেবতা তখন অন্য জায়গায় পুরোহিতেরা তাহাতে সায় দিতে পারিল না; প্রত্যেক পুরোহিতই নিজ নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। ফেরায়ো এমনিফিস্ তখন নূতন একটা ধর্মব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে সূর্য বা এটন-ই একমাত্র দেবতা; এটনের তিনি প্রতিনিধি; এটনের নিকট হইতে তিনি নূতন নাম পাইয়াছেন এখ্‌নাটন।

পুরোহিতেরা ইহাতে রুষ্ট হয়; তাহারা কৃষকদের বলিতে থাকে, এখ্‌নাটনই তাহাদের দুঃখ ও দারিদ্রের কারণ। কেননা, দেবতা ওসিরিস্ যিনি ফসলের কর্তা—তাহার পূজা ফেরায়ো এখ্‌নাটন উঠাইয়া দিয়াছেন। পুরোহিতদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। ফেরায়ো বিদেশী সৈন্যের সহায়তায় বিদ্রোহ দমন করেন: কিন্তু কিছুদিন পরই তাহার মৃত্যু হয়। পুরোহিতেরা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যায় এবং পরিশেষে হারমাহিব্ নামে একজন পুরোহিতকে ফেরায়োর পদে বসায়। হারমাহিব্ পুরাতন ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুরোহিতদের সকল প্রকার সুবিধা দেন। কিন্তু যে কৃষকেরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রক্ত ঢালিয়াছে, নূতন ফেরায়ো তাহাদের প্রতি তাকান নাই। বরং পুরোহিতেরা

যে ক্ষতি দিয়াছে, তাহা পুরাইয়া লওয়ার জন্য কৃষকদের উপর নূতন নূতন কর ধার্য করেন।

কিন্তু মিশর আর বেশীদিন একজন ফেরায়োর অধীনে ঐক্যবদ্ধ রহিল না। সীরিয়া প্রভৃতি রাজ্য আগেই ফেরায়োর হস্তচ্যুত হইয়াছে। মিশর বহুভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পরিশেষে, এসীরিয়ান্‌রা এবং পরে পারসীকরা মিশর দখল করে।

(৩)

চীনের সভ্যতা বাবিলোনের ও মিশরের সভ্যতার মতই খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বে বিকাশ পায়। হোয়াংহো অথবা পীতনদীর তীরই প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার কেন্দ্র।

নদীর প্লাবনে চারিদিক ভাসিয়া যায়, তাই হোয়াংহো অঞ্চল খুব উর্বর; এখানকার মাটির রং পীত। সেন্নার এবং মিশরের অধিবাসীদের মত চীনাদেরও জলের প্রাচুর্যের সঙ্গে লড়িতে হইত। তাহারা বাঁধ বাঁধিয়া কৃত্রিম উপায়ে জল ঠেকাইত। বাঁধ না বাঁধিলে হোয়াংহো চীনাদের কোন উপকারে না আসিয়া বরং দুঃখের ও সর্বনাশের কারণই হইত। শুধু বাঁধই নয়, খাল কাটিয়া গ্রীষ্মকালে জমির সেচের জন্য চারিদিকে জল ছড়াইয়া দেওয়া হইত।

হোয়াংহো উপত্যকায় খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগেই সামন্তনৃপতিরা রাজত্ব করিত। কিন্তু চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ১১২২ সাল হইতে—তখন এই সামন্তরাষ্ট্রের শাসক ছিল, চৌ-রাজবংশ।

চৌ-রাজবংশের সময়ে একশ' বড় সামন্ত এবং পনরশ' ছোট সামন্ত ছিল। বড় সামন্তরা নামেই শুধু রাজার অধীন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজেদের ইচ্ছামতো চলিত। ছোট সামন্তরা ছিল প্রকৃতপক্ষে বড় সামন্তদের অধীনে জায়গীরদার। কৃষকের অবশ্য সকলের জন্যই খাটিতে হইত; তাহার পরিশ্রমের ফল ভোগ করিত সকলেই।

কৃষক কর দিত রাজা এবং জমিদার দুইজনকেই। সিল্ক এবং কৃষিজাত-দ্রব্যে কর দিতে হইত। হোয়াংহো উপত্যকায় সে সময়ে তুঁতগাছের চাষ হইত; তুঁতগাছের পাতাই গুটিপোকার খাদ্য। গুটিপোকা হইতেই রেশম হয়। চীনের কৃষক সিল্ক তৈয়ার করিত; রাজা জমিদারদের ব্যবহারের জন্য সিল্ক বুনিত, কিন্তু তাহারা নিজেরা পরিধান করিত খড়ের তৈয়ারী আচ্ছাদন।

করের উপরে ছিল বাধ্যতামূলক শ্রম। মনিবের জমি চাষ করিতে হইত, ফসল কাটিয়া মাড়াইয়া দিতে হইত। তাহা ছাড়া,—রাস্তাঘাট তৈয়ার, বাঁধ বাঁধা, মনিবের বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর তোলা—এসব কাজ তো ছিলই। ঋণের দায়ে যাহাদের জমি হাতছাড়া হইত, নানারকম অপরাধে যাহারা শাস্তি পাইত, অথবা যুদ্ধে যাহাদের বন্দী করিয়া আনা হইত—তাহারাই দাস। বাজারে দাস বেচা-কেনা হইত।

জমিদারেরা ব্যবসায়ও করিত; সিল্ক ও কৃষিপণ্যের বদলে পাহাড়িয়াদের নিকট হইতে হাতীর দাঁত এবং মূল্যবান্ পাথর সংগ্রহ করিত। যে সব ব্যবসায়ীদের দিয়া এসব কাজ করানো হইত তাহারা দাস, মনিবের আজ্ঞাবহ। ইহাদের উপর অত্যাচার ছিল নির্মম।

চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালে সামন্তরাজারা ক্রমাগত কিছুদিন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে। শুধু যে বড় সামন্তরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহা নয়, ছোট সামন্তরাও বড়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সকল দলই কৃষককে এই সকল যুদ্ধে টানিয়া আনে। কৃষকের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। ছোট সামন্তরা জয়লাভ করে। ইহাদের নেতারাই এখন সামন্তরাজা হয়, অসংখ্য সামন্তরাজ্য এখন মাত্র সাতটি বড় রাজ্যে পরিণত হয়।

এইসব যুদ্ধে কৃষকদের সর্বনাশ হয়; তাহারা কয়েকবারই সামন্তরাজাদের যুদ্ধের সময়ে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ কোন কোন সময়ে সফলও হয়। কিন্তু কৃষকদের দাবানোর উদ্দেশ্যে সামন্তরাজারা সাময়িকভাবে নিজেদের যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া সকলে মিলিয়া তাহাদের শায়েস্তা করিত। বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহারা আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। এইভাবে কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। অনেকে ধ্বংস হইয়া যায়, অনেকে নিজেদের জমিজমা ছাড়িয়া হোয়াংহো উপত্যকার পশ্চিমদিকে পাহাড় অঞ্চলে চলিয়া যায়।

চীনের পশ্চিম দিকটাতে যেখানে হোয়াংহো উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়াছে—সেখানে একটা সামন্তরাজ্য ছিল, উহার নাম সিং। সিংয়ের রাজা সামন্তদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নাই। কেহ তাহার রাজ্যও আক্রমণ করে নাই। কেননা সেস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্গম। খৃঃ পূঃ ২৪৬ সনে সিংয়ের রাজা চেং পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া চৌ-দের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং পঁচিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের পর হোয়াংহো উপত্যকা দখল করেন। চেং এখন চীনের সম্রাট; কৃষকেরা মনে করিল দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে; তাহারা খুসীই হইল। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। চীনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকটা—যে অংশটা একেবারেই খোলা ছিল—

সম্রাট প্রাচীর তুলিয়া ঘিরিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। এটাই চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর। প্রাচীর নির্মাণের কাজে চার লক্ষ লোক নিয়োগ করা হয়। ইয়াংসি নদীর তীরও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়। এসব কাজের জন্য যে বিরাট খরচের প্রয়োজন তাহা কৃষককেই যোগাইতে হইবে। সুতরাং উচ্চহারে টেক্স ধার্য হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। হেং-রাজারা সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এখন নিজেরা চীনের সম্রাট হয়। আগেকার সামন্ততন্ত্র লোপ পায়। নূতন সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা হয়।

চীন সাম্রাজ্য তেরটি প্রদেশে বিভক্ত হয়, প্রত্যেকটি প্রদেশের আবার কয়েকটি জেলা। সম্রাট তাহার অমাত্যদের মধ্য হইতে প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন; এই শাসনকর্তাকে বলা হইত 'মান্দারিন'। মান্দারিনের অধীনে থাকিত জিলার শাসনকর্তা ও সামরিক কর্মচারী। মান্দারিন শুধু শাসনকর্তাই নয়, বিচারের ভারও তাহারই। এইসব সরকারী কর্মচারীরা রাজকোষ হইতে কোনরূপ বেতন পাইত না। আদালতের জন্য যে টাকা আদায় করা হইত তাহা হইতেই ইহাদের বেতন দেওয়ার রীতি ছিল। সাধারণ টেক্সর উপরেও এই উদ্দেশ্যে কৃষকের উপর বিশেষ টেক্স ধার্য হইত।

বড় লোকেরা কৃষকদের দ্রব্যাদি একরকম লুঠ করিয়াই দখল করিত। কিন্তু আদালতের বিচারে ইহারা নির্দোষ! এই সকল লুঠের মাল প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রয় করা হইত। ব্যবসায়ীরা তখন খুব ফাঁপিয়া উঠে। দুর্ভিক্ষের সময় চাউল ও গমের দালালী করিয়া তাহারা বড়লোক হয়। সম্রাটের নিজেরই ছিল ব্যবসায়। পূর্ব তুর্কীস্থান জয় করিয়া সম্রাট সেখানকার সঙ্গে বাণিজ্য করিতে থাকেন। পরে সম্রাট কোরিয়া, টঙ্কিন প্রভৃতি দেশও জয় করেন এবং সে সব দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসায়ও চালান।

খৃষ্টের জন্মের কয়েক বছর আগে চীনের কৃষকদের অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠে। অভাবের তাড়না তীব্র হইয়া দাঁড়ায়; তাহারা সন্তান বিক্রয় করিতে থাকে। কৃষকেরা সদ্যোজাত শিশুদের হত্যা করিয়া ভার লাঘব করিতে দ্বিধা করিত না; বন্যায় অথবা অজন্মায় ফসল নষ্ট হইলে এমনকি মানুষের মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত। ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু বেপরোয়া তাহারা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই দস্যুদের নেতৃত্বেই আবার অনেক সময় কৃষকেরা বিদ্রোহ করিত।

অনেক ভূস্বামী ও মান্দারিনই কৃষকদের বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা করিয়া সম্রাটকে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরিশেষে, ইহারা তাহারই এক আত্মীয় ভ্যানম্যানকে সিংহাসনে

বসায়। ভ্যানম্যান সম্রাট হইয়াই জমিব্যবস্থার সংস্কার করিতে উদ্যোগী হন। তিনি ঘোষণা করেন যে জমি সবই রাষ্ট্রের, ভূস্বামীরা মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি পাইবে নিজেদের ব্যবহারের জন্য। বাকী জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সম্রাটের এসব সংস্কার কার্যে পরিণত না হইয়া কাগজেপত্রেই থাকিয়া যায়।

কৃষকেরা বেশীদিন এরকম অবস্থা চলিতে দেয় নাই। ফেন-চুং নামক একজন দস্যু সর্দারের নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহ করে। ভ্যানম্যানের সেনাবাহিনী কৃষকদের নিকট পরাজিত হয় এবং সম্রাট স্বয়ং নিহত হন। কৃষকেরা নিজেদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে সম্রাটের পদে বসায়; কিন্তু নূতন সম্রাট কৃষকদের দুঃখমোচনের কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া মান্দারিনদের দলে ভিড়িয়া পড়েন এবং নির্মমভাবে কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করেন।

এবার কৃষকেরা পুনরায় বিদ্রোহ করে চেনদের নেতৃত্বে—চেনেরা তিন ভাই। ইহাদের একজন ঘোষণা করে, স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার যোগ; ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই সে সম্রাটের বিরুদ্ধে কৃষকের অভিযান পরিচালনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। সাধারণ লোক তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহার নেতৃত্ব মানিয়া লয়। কৃষকের বিদ্রোহ যখন প্রায় সফল হইতে চলিয়াছে, কৃষকেরা বহু জিলা হস্তগত করিয়াছে,—তখন এই ব্যক্তি নিজের দল ছাড়িয়া মান্দারিনদের দলে চলিয়া যায়। চেন কৃষকদের শান্ত থাকিতে উপদেশ দেয়। মান্দারিনেরা এই সুযোগ পাইয়া কৃষকদের বিদ্রোহ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। ধর্ম সবসময়ই শোষকদেরই সহায়ক হয়—শুধু অতীত ইতিহাসেই যে এইরূপ হইয়াছে তাহা নয়, আজিও তাহাই হইতেছে। কিন্তু কৃষকেরা থামে নাই; তাহারা ক্রমাগত কিছুদিন বিদ্রোহ জীয়াইয়া রাখে। নিজেদের মতভেদ ও ঘরোয়া বিবাদের ফলে বিদ্রোহ প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। যাহা হউক, ক্রমাগত শ্রেণী সংঘর্ষের দরুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। চীন অনেকগুলি সামন্তনৃপতির অধীনে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। অবশেষে মঙ্গোলদেশের কিদানুরা চীন দখল করে।

(৪)

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে আমরা তথ্যাদি পাই বেদ হইতে। ঋগ্বেদের সময়ে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এখন আমরা যে অর্থে বর্ণ বুঝি, শ্রেণীগুলি তাহা নয়। বৈদিকযুগে শ্রেণীগুলির মধ্যে মেলামেশা অথবা বিবাহ সম্পর্কের নিষেধ ছিল না। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত, প্রকৃতপক্ষে বৃত্তির ভেদ হইতেই

সামাজিক মর্যাদার তারতম্য হইয়াছে, এই বৃত্তির ভেদ হইতেই শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদে আমরা 'বিশ্' কথাটি দেখিতে পাই—'বিশ' অর্থ সাধারণ লোক। ঋগ্বেদে 'মঘবন্' 'মহাকুল' প্রভৃতি কথারও উল্লেখ আছে। ইহাদের অর্থ ধনবান্ উচ্চশ্রেণী।

'বিশ্' বা সাধারণ লোক হইতেই ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি হয়। আবার ক্ষত্রিয়দের মধ্য হইতেই হইয়াছে পুরোহিত শ্রেণী বা ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বিশ্‌রা অর্থাৎ সাধারণ লোকেরাই বৈশ্য; ইহাদের মধ্যে যাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নিচের স্তরের তাহারা শূদ্র।

বৈদিকযুগে গোষ্ঠী সমাজের যৌথজীবনের ভিত্তি ভাঙিয়া গিয়াছে। রাজতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সে সময়কার সমাজের বনিয়াদ। রাজার চতুর্দিকে একদল যোদ্ধা, রাজারই আবার তখন পুরোহিতেরও কাজ। ক্রমশ পুরোহিতদের একটা পৃথক শ্রেণী গড়িয়া উঠে। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বৈশ্যদের কথাও বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় রাজাদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৈশ্যদের নিজেদের সংঘ বা গিল্ড গঠনেরও উল্লেখ আছে। শূদ্র অথবা কর্ষকদের একটি পৃথক শ্রেণীর কথাও এই সব গ্রন্থ হইতে জানা যায়। বেদের 'স্তি' এবং 'উস্তি' কথায় মনে হয় বৈদিক সমাজে ভূমিদাসদেরও শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বৈদিক সমাজের একটা প্রধান বিশেষত্ব, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেণী প্রাধান্যের জন্য সংঘর্ষ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখা যায়, রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় অন্য সকল শ্রেণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে চেষ্টা করে। আবার অথর্ব বেদে উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতেছে। উচ্চশ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে,—বিভিন্ন সংহিতায় তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী একটা যুদ্ধ হয়,—পুরাণে এই যুদ্ধকে ব্রাহ্মণ ভার্গব ও ক্ষত্রিয় হৈহয় পরিবারের যুদ্ধ বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের নেতা পরশুরাম ও হৈহয়দের নেতা কার্তবীর্জার্জুন। এসব নিদর্শনগুলি হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায়, পৌরহিত্যের কাজ ও ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হাতে পাওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ভারতীয় পুরোহিতেরা যে নিঃস্বার্থ ভোগশূন্য জীবন যাপন করিত এমন মনে করার কারণ নাই। বৈদিক এবং বৌদ্ধযুগের গ্রন্থাদি হইতে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন ঋষিদেরও ঐহিক ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। শাসক ক্ষত্রিয় এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা প্রথমটায় পরস্পরের মধ্যে কলহ করিলেও পরে উভয়ের স্বার্থের সমন্বয় হইয়াছিল: উভয়শ্রেণীই পরস্পরের অধিকার

মানিয়া নেয়। নিচের শ্রেণীগুলির মধ্যে যেন উচ্চশ্রেণীর প্রতি বিরোধীভাব না থাকে সেজন্য ব্রাহ্মণেরা পরলোক, স্বর্গ-নরক ও পরিশেষে জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব রচনা করে।

ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি বৌদ্ধযুগেও প্রকাশ হয়। ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, —গৌতমবুদ্ধ অনেক জায়গায়ই এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। খৃষ্টজন্মের ৫০০ বৎসর পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম 'অনার্য' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'অনার্য' কথাটি 'কিকাত' অর্থাৎ মগধদেশকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাহারা ব্রাহ্মণদের অনুশাসন মানে না তাহাদেরই অনার্য বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী বৌদ্ধধর্ম প্রথম মগধেই প্রচার হয়। মগধবাসীরাই প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। সুতরাং ব্রাহ্মণরা যে মগধের অধিবাসীদের অনার্য আখ্যা দিবে তাহা আশ্চর্য নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; ইহা ধর্মের আবরণে শ্রেণীসংঘর্ষেরই প্রকাশ।

মগধে সৈসুণ্ডগদের পরে নন্দবংশ সিংহাসন অধিকার করে। নন্দরা ক্ষত্রিয় নয়। পুরাণে বলা হইয়াছে, মহাপদ্মনন্দ ক্ষত্রিয়দের নির্মূল করেন। তাঁহার আত্মীয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে শূদ্র ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। পুরাণ আরও একজন রাজার কথা বলিয়াছে—যিনি উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয়দের নির্মূল করিয়া কৈবর্ত, পঞ্চক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী হইতে নূতন একটা ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করেন। এই রাজাটি যে কে ঐতিহাসিকেরা তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবুও এইরূপ উক্তি হইতে সেকালের সামাজিক অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নশ্রেণী যে উচ্চশ্রেণীকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই তাহার প্রমাণ হয়। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ব্রাহ্মণমন্ত্রী কৌটিল্য কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অশোকের সময়েই প্রথম সামাজিক অসমতা দূর করার চেষ্টা হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা সকলের পক্ষে একই রকম করা হয়। অশোক ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারগুলি ক্রমে ক্রমে খর্ব করিয়া দেন।

সমাজের উচ্চশ্রেণীর পক্ষে এসব সহিয়া যাওয়া শক্ত। পুষ্যমিত্রের অধীনে ব্রাহ্মণেরা ক্ষমতা হাত করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সমাজের সর্বোচ্চশ্রেণী বিশাল রাজ্যের শাসক হয়। ইহাদের রাজত্বে গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা কায়েম হয়; প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতার ব্যবস্থাদি এই সময় হইতেই প্রবর্তিত হয়। মনুসংহিতার শূদ্র-বিরোধিতা সুস্পষ্ট, ইহার বিধান অনুসারে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ছাড়া কেহই রাষ্ট্রের কর্মচারী হইতে পারে না। অশোকের গণতান্ত্রিক বিধান ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থার নিকট পরাজিত হয়। ইহার পর হইতে যতই আমরা নিচের দিকে

যাই—আমরা দেখি যে শূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থা ক্রমেই কঠোরতর হইয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে উচ্চ ও নীচের শ্রেণীগুলির এই বিরোধিতা এবং কখনো কখনো নীচের শ্রেণীগুলি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল যে সামাজিক বিপ্লবের অবস্থাই প্রকাশ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসের এদিকটার গভীরতর আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গ্রীসে দাসত্বপ্রথা

প্রাচীন গ্রীক সমাজের বিশেষত্ব দাসপ্রথা, গ্রীকদের আগে আর কোন সমাজই দাসত্বের বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠে নাই। গ্রীকদের আদি বাসস্থান গ্রীসে নয়। গ্রীকেরা বসতি স্থাপন করার আগে এখানে অন্য জাতির বাস ছিল, ইহাদের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক।

খৃষ্ট জন্মের পনরশ' বছর পূর্বে গ্রীকেরা এদেশে আসে; দুইশ' বছরে তাহারা গ্রীসের আদিম অধিবাসীদের নির্মূল করে। দেশান্তরে আসার পূর্বে ইহারা থিসালি ও এপিরাসে বাস করিত। প্রথমটায় ইহারা আদিম অধিবাসী-দের পাশেই শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিতে থাকে, কিন্তু ক্রমশ—একপ্রকার জবরদস্তি করিয়াই উহাদের জমি দখল করিয়া লয়।

গ্রীসে আসার সময়টাতে গ্রীক সমাজে ছিল পরিবার সংঘ অথবা গ্রীক-ভাষায় 'ফ্রেট্রীয়াস্'। ইহাদের প্রধান বৃত্তি পশুপালন, কৃষি ছিল গৌণ। ক্রমশ লোকসংখ্যা বাড়িয়া যায়, পরিবারের প্রসার হয়,—সুতরাং থিসালি ও এপিরাসের সংকীর্ণ ভূমি এখন আর পশুচারণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই পরিবার সংঘগুলি নিজেদের নেতা নির্বাচন করিয়া উহাদের অধীনে গিরিপথে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। নেতাদের বলা হয় বেসিলিয়া। প্রত্যেক পরিবার সংঘেই সকলের একটা পরিষদ থাকে, এই পরিষদের নির্দেশেই বেসিলিয়া অথবা সেনাপতির চলিতে হয়।

গ্রীকেরা যে সব দ্রব্য লুণ্ঠন করিত অথবা যে সব ভূমি দখল করিত তাহা সমানভাবে সকলের মধ্যে বিলি করা হইত না। ছোট-বড় ভেদে বাঁটিয়া দেওয়া হইত। নেতারা পাইত সকলের বেশী ভাগ—বেশী দাস, বেশী ভূমি, বেশী লুঠের মাল। ফ্রেট্রীর শাসক, সেনাপতি এবং দেবতাসমাজে এই তিনেরই ছিল বিশেষ-অধিকার। এইভাবে দেশান্তরে আসার সময়েই বিত্তের অসমতা দেখা দেয়। বেসিলিয়া বা সেনাপতি এবং শাসকেরাই সমাজের মাথা এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি; ইহারা অভিজাত। অভিজাতদের পশুও থাকিত বেশী; তাহারা দাস খাটাইয়া এই সব পশু দিয়া জমি চাষ করাইত। একজন বড় অভিজাতের থাকিত ত্রিশ কি চল্লিশটি দাস। পরিবার সংঘের সাধারণ লোকেরা নিজেরাই জমি চাষ করিত, উহারা কৃষক। কৃষকদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; জমি উর্বর নয়; অনেক সময়ই ফসল নষ্ট হইত।

কৃষকের অবস্থা যাহাই হউক, ধনী অভিজাতেরা ক্রমেই ধনবান হইতে থাকে।

নূতন দেশে আসিয়া গ্রীকেরা সাধারণত বসতিস্থাপন করিত সমুদ্রের তীরে, উঁচু জায়গায়—বিশেষত পাহাড়ের গায়ে। এই রকম জায়গায় তাহারা নগর তৈয়ার করিত। এইসব নগরে বড় বড় প্রাসাদে অভিজাতেরা বাস করিত। প্রাসাদের পাশেই মন্দির। একটা চতুষ্কোণ ফাঁকা জায়গা থাকিত সভার জন্য; এরকমই আর একটা জায়গায় বাজার। বাজারের চারিদিকে কারিগরদের ঘরবাড়ী। নগরগুলি পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। শত্রুর আক্রমণের সময়ে কৃষকেরা নগরের অভ্যন্তরে প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইত। গ্রীকদের এক একটি নগর এক একটি রাষ্ট্র।

কালক্রমে গ্রামের লোকেদের শহরের অভিজাতদের শরণাগত হইতে হয়; এদিকে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু জমি কম। এইভাবে সৃষ্টি হয় ভূমিহীন কৃষকের। অভিজাতদের নিকট কাজের প্রার্থী হওয়া ছাড়া ইহাদের উপায় নাই; অনেকেই আবার দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে থাকে। যাহাদের কিছু জমি আছে তাহাদেরও দুর্দশার শেষ নাই; অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অভিজাতদের নিকট খাদ্য, বীজ প্রভৃতি কর্জ লইতে হয়। যথাসময়ে শোধ দিতে না পারিলেই জমি অভিজাতদের হাতে চলিয়া যায়। কৃষক এইভাবে অভিজাতদের দাসে পরিণত হয়, জমিও হইয়া যায় অভিজাতদের সম্পত্তি। অভিজাতেরা বেসিলিয়ার পদ উঠাইয়া দিয়া নিজেদের মধ্য হইতে একবছরের জন্য কয়েকজন শাসক নিযুক্ত করিতে থাকে। গ্রীকদের রাষ্ট্র এখন অভিজাত-রিপাব্লিকে পরিণত হয়।

আগে পিতার সম্পত্তি সকল ছেলের মধ্যেই ভাগ হইত। কিন্তু এখন বড় ছেলেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তাই অন্য ছেলেরা দল বাঁধিয়া সমুদ্র-পথে দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। ভাল জায়গা পাইলেই, উহারা সে সব জায়গা দখল করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিত। ইজিয়ান সাগরের তীরে, থ্রেসিয়ায় এবং ক্রিমিয়ায় এরকম অনেকগুলি উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। উপনিবেশগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্যের অভাব নাই, সেখান হইতে এখন স্বদেশে কৃষিপণ্য আমদানির সুবিধা হয়; স্বদেশে তাই কৃষির পরিবর্তে হস্তশিল্পের কাজই হইতে থাকে বেশী। এইভাবে, স্বদেশ ও উপনিবেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের চলাচল হইতে থাকে।

গ্রীসে এখন গড়িয়া উঠে হস্তশিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের নূতন শ্রেণী। হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক বিদেশীও ছিল। ইহাদের কোন-প্রকার রাজনৈতিক অথবা নাগরিক অধিকার ছিল না। কিন্তু বিদেশীরা

ধনবান, সুতরাং ক্ষমতা ও অধিকারের জন্য ইহারা লড়িবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। স্থানীয় কারিগর ও ব্যবসায়ীদেরও রাজনৈতিক অধিকার-লাভের দাবি ছিল; তাই বিদেশীর সঙ্গে তাহারা যোগ দেয়। এই যুক্ত-সংগ্রামে কৃষকেরাও বাদ থাকে নাই; ইহারা পূর্বেই জমিহারা হইয়াছে। এইভাবে খৃষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে অভিজাতদের বিরুদ্ধে কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী এবং বিদেশীদের যুক্তবাহিনী গড়িয়া উঠে। অভিজাত ও গণবাহিনীর সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে, অবশেষে গণবাহিনীরই জয় হয়। সর্বত্র অভিজাতেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। গণবাহিনীর জয় হইল বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা এবং বড় কৃষকেরা জয়ের ফল নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিতে থাকে।

গ্রীকরাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্সের শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিহাসই ভালরকম জানা যায়। এথেন্সই ছিল গ্রীসের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মধ্যগ্রীসের দক্ষিণপূর্ব কোণটিতে এই শহর; এথেন্স এবং উহার সংলগ্ন যে জমি তাহাকে বলা হয় এটিকা। জমি সবই অভিজাতদের। স্বাধীন কৃষক বলিতে খুব কমই ছিল। কৃষকেরা হয় অভিজাতদের আশ্রিত, নয়ত তাহাদের দাস। কোন কোন কৃষককে জমির ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ ফসলই পাওনাদারকে দিতে হইত—উহাদের বলা হয় 'ষষ্ঠভাগ কৃষক'। কোন কোন জমিতে পাথর বসাইয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইত—এগুলি বন্ধকী জমি।

এঙ্গেলস্ এসম্পর্কে বলিয়াছেন, "...অভিজাতদের অর্থের শাসন উহার পূর্ণ প্রসারের মুখে এমন একটা নূতন রীতির সৃষ্টি করে, যাহার দ্বারা দেনাদারের বিরুদ্ধে পাওনাদারের স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে এবং ক্ষুদ্র কৃষকের উপর টাকার মালিকের শোষণ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। এটিকার সকল মাঠই বন্ধকী জমি; প্রত্যেক জমিতে প্রোথিত এক-একটি ফলকে লিখিত থাকে 'অমুকের' নিকট 'অত' টাকার জন্য জমি বন্ধক আছে। যে-সব জমিতে এরূপ চিহ্ন নাই তাহার অধিকাংশই অনাদায় হেতু অথবা সুদের দরুন পূর্বেই বিক্রয় হইয়াছে এবং অভিজাত সুদখোরদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। ফসলের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ নূতন মনিবকে দিয়া বাকী এক ভাগের উপর জীবন-ধারণের শর্তে কৃষক যদি জমিতে থাকার অনুমতি পাইত, তবে সে নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করিত। তাহাই সব নয়। জমি বিক্রয়ের দ্বারা যদি ঋণ শোধ না হইত, অথবা কোন বন্ধক ব্যতিরেকেই যদি ঋণ লওয়া হইত, তবে খাতককে পাওনাদারের দাবি মিটানোর জন্য দাস হিসাবে নিজের সন্তানদের বিদেশে বিক্রয় করা ছাড়া অন্য উপায় থাকিত না। পিতা কর্তৃক সন্তান বিক্রয়......! ইহাতেও যদি রক্তশোষক পরিতৃপ্ত না হয়, তবে সে তাহার দেনাদারকেই বিক্রয় করিতে পারিত।" এই রকম অসহনীয় অবস্থার চাপে

জমির প্রত্যাশী কৃষকেরা এবং স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা একত্র হইয়া এথেনীয় অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

দীর্ঘকালব্যাপী তিক্ত সংগ্রামের পর গণবাহিনীর জয় হয়। অভিজাতদের তাহারা একজন নূতন এক-নায়কের নিয়োগে সম্মতি দিতে বাধ্য করে। এই এক-নায়কই সোলোন। সোলোন অভিজাত হইলেও ব্যবসায়ী; তাই উভয় পক্ষই তাঁহাকে এক-নায়কত্বে বসাইতে রাজী হয়। তিনি কতকগুলি সংস্কার-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কিন্তু এগুলি কৃষকের দাবি মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে সব কৃষক ঋণের দায়ে জমি হারাইয়াছে তিনি তাহাদের জমি ফিরিয়া পাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু ঋণের দরুন যাহারা দাসে পরিণত হইয়াছে তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন নাই। সোলোন গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার ব্যবস্থায় বড় বড় পদগুলির নির্বাচনে জনগণও ভোট দিতে পারে; কিন্তু শাসক নির্বাচিত হইবে শুধুমাত্র বড় বড় ভূস্বামীদের মধ্য হইতে। অতএব কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ী প্রকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল। সোলোনের মাঝামাঝি ব্যবস্থায় অভিজাত অথবা জনগণ কেহই খুসী হয় নাই। সুতরাং পুনরায় তীব্র সংগ্রাম সুরু হয়।

ব্যবসায়ীরা জাহাজের কারিগর, নাবিক, ধীবর প্রভৃতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে, ইহাদের নেতা পাইসিস্ট্রেটাস্। ইনি রৌপ্যের খনির মালিক; আবার রাষ্ট্রের একজন বড় সামরিক নেতা। পাইসিস্ট্রেটাস্ খুব বড় বাগ্মী ও আন্দোলনকারী। খৃঃ পূঃ ৫৫০ সালে তিনি গণবাহিনীর সহায়তায় এথেন্স দখল করেন এবং পলাতক অভিজাতদের জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষকদের কোন সুবিধা হয় নাই। যাহাদের হাল গরু বেশী তাহারাই পাইসিস্ট্রেটাসের ব্যবস্থায় জমির মালিক হয়। পূর্বেকার ভূমিদাসেরা বড় বড় কৃষকদের অধীনে কাজ পায়; স্বাধীনভাবে জমি চাষের কোন সুবিধা তাহাদের হয় নাই। বহু জমিহীন কৃষক এথেন্সের উপনিবেশগুলিতে চলিয়া যায়।

পাইসিস্ট্রেটাসের মৃত্যুর পর অভিজাতেরা পুনরায় ক্ষমতা হাত করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা ব্যর্থ হয়। জাহাজের কারিগর, নাবিক ও ধীবরদের নেতা ক্লাইস্থিনিস্ এখন নূতন শাসনকাঠামো রচনা করেন। কিন্তু তিনি যেভাবে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, তাহাতে গণপরিষদে কৃষক প্রতিনিধিদের সংখ্যা হয় কম; বেশী প্রতিনিধি জাহাজের কারিগর, নাবিক ও ধীবরদের। ইহাদের উপর ব্যবসায়ীদের প্রভাব বেশী; ব্যবসায়ীরা কারিগর, নাবিক ও ধীবরদের ভোটে বড় বড় পদগুলি দখল করার সুযোগ পায়। ক্লাইস্থিনিসের শাসনতন্ত্র তাই নামেমাত্র গণতান্ত্রিক, প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা এখন বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের।

গ্রীসের সব রাষ্ট্রগুলিতেই সংঘর্ষ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত, প্রায় সর্বত্রই ক্ষমতার অধিকারী হয় ব্যবসায়ীরা। শাসনক্ষমতা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাতে আসায় ব্যবসায়ের খুব উন্নতি হয়। পুরাতন পদ্ধতিতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে এখন আর সামুদ্রিক বাণিজ্যের চাহিদা মিটিতে পারে না। তাই উৎপাদনে দাসশ্রমের আবির্ভাব হয়। শিল্পপতিরা বাজারে দাস কিনিয়া কারখানায় ইহাদের খাটায়। এখন বড় আকারে উৎপাদন হইতে থাকে। দাসের চাহিদা এত বাড়িয়া যায় যে দাস বেচাকেনার জন্য একটা বড় রকমের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। এশিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশ হইতে দাস কিনিয়া দেশে আমদানি করা হইতে থাকে। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে দাসশ্রমদ্বারা উৎপাদন সারা গ্রীসের অর্থনীতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রীসের পিলোপনেসাস্ প্রদেশের দক্ষিণ দিকে স্পার্টা রাষ্ট্র। শ্রেণী-সংগ্রামের সময় এথেন্স, কোরিন্থ্ প্রভৃতির পলাতক অভিজাতেরা স্পার্টায় আশ্রয় পাইত। স্পার্টার শাসনক্ষমতা ছিল অভিজাত এবং সামরিক প্রধানদের হাতে। ইহারা সবসময়ই গণতন্ত্রবিরোধী। পিলোপনেসাসে আসিয়া স্পার্টানরা স্থানীয় অধিবাসীদের দাস বা হিলট্ বানায়। ছোটবেলা হইতেই স্পার্টানরা তাহাদের ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিত। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইলেই নাগরিক অধিকার দেওয়া হইত।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কৃষকদের যে সব বিদ্রোহ হইত, স্পার্টান অভিজাতেরা তাহা অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখিত। কোরিন্থ্ এবং পিলোপনেসাসের কতিপয় রাষ্ট্র স্পার্টার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই সন্ধির উদ্দেশ্য, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের দাবানো।

ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে পারস্যের রাজারা এশিয়ামাইনরস্থিত গ্রীকরাষ্ট্র-গুলি দখল করে। বিজিত রাষ্ট্রগুলির উপর অত্যধিক কর চাপানো হয়; অত্যাচারও হইতে থাকে ভয়ঙ্কর। মিলেটাস-নগরের নেতৃত্বে উহারা বিদ্রোহ করে। এথেন্স কতকগুলি জাহাজ পাঠায়; কিন্তু পারস্যবাহিনী সহজেই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হয়। এখন পারস্যের রাজারা বলকানস্থিত গ্রীকরাষ্ট্রগুলি দখল করিতে অগ্রসর হয়। তের বছরে তিনবার গ্রীসের বিরুদ্ধে পারস্যের অভিযান হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই গ্রীকরাষ্ট্রগুলির হাতে তাহাদের পরাজয় হয়। পারস্যের রাজা শেষবারের অভিযানে শুধু স্থল-পথেই অগ্রসর হন নাই, জলপথেও গ্রীস আক্রমণ করেন।

পারস্যরাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রীকরাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু এথেন্স ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রই ধারণা করিয়া উঠিতে পারে নাই যে একমাত্র সমুদ্রের যুদ্ধেই পারস্যকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব। থেমিস্টকল্সের অধীনে এথেন্সের নাবিকেরা নৌবাহিনী গড়ার জন্য প্রস্তুত

হয়। কিন্তু ভূস্বামী এবং কৃষকেরা এইরূপ আয়োজনের বিরোধী। তাহাদের ধারণা, ইহাতে নিরর্থক ধনক্ষয় হইবে, গ্রামের লোকদের সর্বনাশ হইবে। থেমিস্টকল্‌স দমেন নাই, তাহার আয়োজনের স্বপক্ষে তিনি দেবতা এপোলো-কে পাইলেন। মন্দিরের পুরোহিতদের তিনি ঘুষ দেন এবং দেবতার পক্ষ হইতে তাহাদের দিয়া বলাইলেন, 'কাঠের প্রাচীরের পিছন হইতে আত্মরক্ষা দ্বারাই গ্রীস বাঁচিবে।' কাঠের প্রাচীর বলিতে বুঝায় জাহাজ, থেমিস্ট-কল্‌সেরই জয় হয়। গণপরিষদ নৌ-বহর গঠনের আদেশ দেয়। সেলামিসের নিকট নৌ-যুদ্ধে পারস্যের নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হইল। এথেন্স এখন শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি।

এথেন্স গ্রীকরাষ্ট্রগুলিকে যুক্ত নৌ-বাহিনী গঠনের জন্য আহ্বান করে; এই উদ্দেশ্যে একটি যুক্ত-কাউন্সিল গঠিত হয়। যুক্ত নৌবাহিনীতে সকল রাষ্ট্রেরই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী জাহাজ এবং নাবিক যোগাইতে হইবে। পারস্য যুদ্ধের পর এথেন্সই হইয়া দাঁড়ায় গ্রীসের প্রধান নৌ-শক্তি; শুধু তাহাই নয় বাণিজ্যের ব্যাপারেও এথেন্সই প্রধান। সমুদ্রে এথেন্সেরই প্রাধান্য, সুতরাং বাণিজ্যপথগুলিও উহারই আয়ত্তে।

কৃষি ও শিল্পের জন্য যে কায়িকশ্রমের দরকার দাসদ্বারাই তাহা চলিতে পারে। বাণিজ্যের চাহিদা মিটানোর জন্য শিল্পের প্রসার হয়, সুতরাং দাসের প্রয়োজন বাড়িয়া যায়। এথেন্সের পক্ষে এখন যে কোন সংখ্যায় দাস পাওয়া কঠিন নয়। পারস্যযুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীও ধরিয়া আনা হইয়াছে অসংখ্য। এথেন্সের দাস-ব্যবসায়ীরা এশিয়ামাইনর, সীরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দাস আমদানি করিতে থাকে। ফিনিসীয়ার দাস-ব্যবসায়ীরা গ্রীসের বাজারে নিজেরাই দাস লইয়া আসে। সীরিয়া, মিশর, আরব প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও এথেন্সের এবং অন্যান্য গ্রীকরাষ্ট্রের দাস ব্যবসায় চলিতে থাকে। এথেন্স এইভাবে পুরাপুরি দাস-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এথেন্সের নির্দেশে গ্রীকরাষ্ট্রগুলির যে ঐক্য হইয়াছিল, এথেন্স উহারই সুযোগ লইয়া বিরাট দাস-ব্যবসায় চালায়। অনেক রাষ্ট্র এই ঐক্য ভাঙিগয়া দিয়া পৃথক হইয়া যাইতে চায়। কিন্তু এথেন্স ইহাদের জোর করিয়া দাবাইয়া দেয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধি এথেনীয় রাষ্ট্রশক্তি প্রভুত্ব বিস্তারেরই যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতপক্ষে এথেন্সের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

খৃষ্টের জন্মের পূর্বে পঞ্চম শতকে এথেন্স এবং এটিকায় দাস-শ্রমের নিয়োগ উৎপাদনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। এথেন্স যে নিজেই শুধু দাসদের খাটাইত তাহা নয়, অন্য রাষ্ট্রগুলিকেও দাস যোগাইত।

এথেন্সই তখন দাস-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে দাস বেচা-কেনার বাজার বসিত।

দাসদের বেশী করিয়া নিয়োগ করা হইত খনির মধ্যে। রৌপ্য, তামা ও মর্মর পাথরের এইসব খনি। খনিগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, কিন্তু সেগুলি সাধারণত ইজারা দেওয়া হইত। খনির কাজ খুবই শক্ত, কিন্তু দাসদের খাটিতে হইত রোজ বার ঘণ্টা হইতে চৌদ্দ ঘণ্টা।

খনিজাতদ্রব্য অন্য রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয় করা হইত, কিন্তু উহার বেশীর ভাগই এথেন্সের শিল্পেই ব্যবহার হইত। পাইসিস্ট্রেটাস্ ও ক্লাইস্থিনিসের সময়েই এথেন্সে বড় বড় কারখানার আবির্ভাব হয়, এগুলিকে বলা হইত ইরগাস্টেরিয়া। এথেন্সে এরকম কয়েকশ' কারখানা ছিল—প্রত্যেক কারখানায়ই ত্রিশ কি চল্লিশজন দাস খাটিত। কারখানায় লোহার ও তামার দ্রব্য, ধাতুর পাত্র, অস্ত্র এবং অন্যান্য নানারকম জিনিসই তৈয়ার হইত। অস্ত্র এবং তামার জিনিস গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রেই নয়, প্রাচ্যদেশগুলিতেও রপ্তানি করা হইত। এথেন্সে বড় বড় জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা ছিল, দাসেরাই জাহাজ তৈয়ার করিত।

ছোট ছোট কারিগরেরা বড় কারখানা বা ইরগাস্টেরিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এখনকার তুলনায় ইরগাস্টেরিয়া মোটেই বড় প্রতিষ্ঠান নয়, তবে তখনকার গ্রীসে ইরগাস্টেরিয়াই ছিল বৃহত্তম কারখানা; বড় আকারে উৎপাদনই উহার বিশেষত্ব। অল্প টাকায় দাস কিনিয়া আনা হইত, উহাদের জন্য খরচও বেশী নয়; সুতরাং কারিগরের উৎপাদনের চেয়ে কারখানার উৎপাদনের খরচ কম, এই কারণেই কারিগরের উৎপাদিত দ্রব্যের দর বেশী; বাজারে উহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায়। হস্তশিল্পীরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

মন্দির ও প্রাসাদ তৈয়ার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পাথরের প্রাচীর তোলা—এসব ভারী কাজগুলি দাসেরাই করিত। অনেক সময়, দাসের মালিকেরা অন্যদের নিকট দাস ভাড়া দিত; এইরকম এক একজন মালিকের ৩০০ হইতে ৬০০ দাস থাকিত। বড় বড় ভূস্বামীরা অনেকেই কৃষির কাজের জন্য ভাড়াটে দাস নিয়োগ করিত।

গ্রীসে এই সময়ে কৃষির অবনতি হইতে থাকে; গমের চাষ প্রায় উঠিয়াই যায়। উপনিবেশ এবং বিদেশ হইতেই গমের আমদানি হয়। কৃষি উৎপাদনে ফলের চাষ এবং উদ্যানই এখন প্রধান স্থান গ্রহণ করে। এইসবের চাষেও দাসশ্রম নিয়োগ করা হইত।

সকল রকম উৎপাদনেই দাসশ্রম নিয়োগের ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়, বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। বেকারদের অসন্তোষ

দূর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র উহাদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে; কিন্তু কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। বেকারদের অসন্তোষ চাপা দেওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু দাসদের বিদ্রোহ ঠেকানো যায় নাই। পঞ্চম শতাব্দীতে সারা গ্রীসে দাসেরা বিদ্রোহ করে, দাসের মালিকেরা যখনই কোনরকম বিপদে পড়িত তখনই ছিল দাসদের সুযোগ। স্পার্টানরা আরগস্ আক্রমণ করিলে আরগসের দাসেরা বিদ্রোহ করে এবং আরগস্ দখল করিয়া বসে। কয়েক বৎসরের যুদ্ধের পর আরগসের দাস-মালিকেরা বিদ্রোহীদের তাড়াইয়া রাজ্য পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হয়।

খৃঃ পূঃ ৪৩১ সালে এথেনীয়রা সমগ্র গ্রীস দখলের জন্য অগ্রসর হয়। প্রথমটায় এথেনীয়রা পরাজিত হয়। দাসদের নিকট ইহা বড় রকমের সুযোগ। তাহারা সমুদ্রতীরের দুর্গ দখল করে, অবশ্য খাস এথেন্স দুর্গটি দখল করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দাস-বিদ্রোহীরা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এইরকম বিদ্রোহ সেমস্ প্রভৃতি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতেও দেখা দেয়।

দাসদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ, তাহাদের অস্ত্রের অভাব। যুদ্ধবিদ্যায়ও তাহাদের অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। তাহা ছাড়া দাসেরা ছিল নানা জাতির, তাহাদের ভাষা ছিল নানা রকমের। এই কারণেই পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়ার অসুবিধা হইত। যাহা হউক, ক্রমাগত এইসব বিদ্রোহের ফলে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে; গ্রীকরাষ্ট্রের পতন অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রীসে দাসপ্রথার যুগে মুষ্টিমেয় লোক বিলাসিতায় জীবন যাপন করিত; অন্যদিকে হাজার হাজার দাস মনিবের জন্য খাটিয়া প্রাণপাত করিত। ইহাদের ছিল পশুর জীবন।

এই রকম পরগাছা সামাজিক ব্যবস্থা গ্রীসের মনীষী দার্শনিকেরা সমর্থন করিতেন: একজন দার্শনিক বলিয়াছিলেন, "বিলাসিতার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন স্বাধীন মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক; দাস এবং নিকৃষ্টস্তরের লোকদেরই যে খাটিতে হয়, তাহা প্রকৃতিরই বিধান।" অন্য একজন দার্শনিক এই সঙ্গে যোগ করেন, "গ্রীসের প্রধান দেবতা 'জিউস'* স্বয়ং এই রকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।" গ্রীসের প্রধান দার্শনিক ছিলেন এরিস্টট্ল; তিনি এথেন্সে থাকিতেন। তিনিও দাসত্বপ্রথার সমর্থন করেন; তাঁহার মতে দাসত্বব্যবস্থা প্রকৃতিরই নিয়ম। এরিস্টট্ল দাসকে উৎপাদনের যন্ত্ররূপে দেখেন; কতকগুলি যন্ত্র জড়,—যেমন, হাতুড়ি, কাস্তে—কতকগুলি যন্ত্র

* Zeus

সজীব,—যেমন, দাস। এরিস্টট্লের গুরু প্লেটো; তিনি এবং তাঁহার শিষ্য বলিতেন—যদি উচ্চচিন্তা করিতে হয়, তবে অবসর জীবন একান্ত আবশ্যক। শ্রমের প্রতি এই ঘৃণা দাসত্বব্যবস্থারই বিষময় ফল।

এঙ্গেলস্ বলেন, 'এথেন্সের যখন চরম সমৃদ্ধি তখন স্ত্রী ও পুরুষসহ সমগ্র নাগরিকের সংখ্যা সেখানে ৯০,০০০। হইাদের ছাড়াও ছিল ৩৬৬,০০০ স্ত্রী ও পুরুষ দাস এবং ৪৫,০০০ বিদেশী এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আশ্রিত। অতএব, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিকের অনুপাতে ছিল অন্তত আঠার জন দাস এবং দুইজনের অধিক আশ্রিত। দাসেরা পরিদর্শকদের অধীনে কারখানায় কাজ করিত। বাণিজ্য ও শিল্প তখন প্রসার লাভ করিতে থাকে; এবং উহা কতিপয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই কারণে স্বাধীন নাগরিকদের একটা বড় অংশ দরিদ্র হইয়া পড়ে। এখন একমাত্র উপায় রহিল, হস্তশিল্পী-রূপে দাস শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। কিন্তু স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে হস্তশিল্পীর কাজ নীচ। প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সম্ভাবনাও ছিল নিতান্ত কম। ইহারা সমাজে সংখ্যা গরিষ্ঠ—ইহারাই এথেনীয় রাষ্ট্রের পতন ঘটায়। পদলেহী চাটুকার ইওরোপীয় ঐতিহাসিকেরা তাহাদের রাজাদের খুসী করার জন্য বলিয়া থাকে—গণতন্ত্রই এথেন্সের পতনের কারণ; কিন্তু তাহা নয়। ইহার কারণ দাসত্ব, দাসত্বই সাধারণ নাগরিকদের কাজের পথ রোধ করিয়াছিল।'

এথেনীয় রাষ্ট্র ও সমাজ

(১)

বর্বরযুগে সমাজের সংগঠনগুলির ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক। মূল সংগঠন জেন্স, জেন্সের সমবায়ে গড়িয়া উঠে ফ্রেট্রী। কতকগুলি ফ্রেট্রী লইয়া হয় গোত্র। এটিকায় চারটি গোত্র ছিল। হোমারের কবিতায় আমরা জানিতে পারি, অধিকাংশ গোত্র হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তখন গ্রীকেরা মাত্র সভ্যতার দুয়ারে পৌঁছিয়াছে।

প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত শহরে তাহারা পূর্বেই বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গৃহপালিত পশুপালের বৃদ্ধি, কৃষির প্রসার ও হস্তশিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বাড়িয়াছে। ধনের অসমতা এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুপ্রাচীন গণতন্ত্রের মধ্যে আভিজাত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। জাতিগুলি উৎকৃষ্ট জমি নিজের দখলে পাওয়ার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; যুদ্ধের বন্দীরা হয় দাস।

প্রত্যেকটি জাতির থাকিত একটি পরিষদ*; সম্ভবত গোত্রের প্রধানদের লইয়াই পরিষদ গঠিত হইত। লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেলে কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তিই ইহার সভ্য হইতে পারিত। মনোনয়ন প্রথায় পরিষদে অভিজাতদের শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ হয়। গণপরিষদে† সকলে অংশ গ্রহণ করিত। একজন থাকিত জাতির সেনাবাহিনীর অধিনায়ক‡। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এই সেনাপতিকে আধুনিক অর্থে রাজা আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। সেনাপতি নির্বাচিত হইত। সামরিক কাজ ছাড়াও সেনাপতি পুরোহিত এবং বিচারকের কাজ করিত।

অতএব গ্রীক শাসন পদ্ধতির মধ্যে আমরা বর্বরযুগের ব্যবস্থাকেই দেখি। কিন্তু আমরা উহার ভাঙ্গনেরও সূচনা দেখিতে পাই। সমাজে পিতৃ-অধিকারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, শাসন কাঠামোর উপর ধনের অসমতার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে; আভিজাত্য ও রাজতন্ত্র শিকড় গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দাসত্ব প্রথমটায় ছিল যুদ্ধবন্দীদের, এখন গোত্রের অথবা জাতির লোকেরাও দাসে পরিণত হইতেছে। লুণ্ঠন ধনোপার্জনের একটা সাধারণ পথ হইয়া

---

* Boule ; † Agora ; ‡ Basileus.

দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অভাব ছিল একটি ব্যবস্থার। তখনও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর প্রয়োজনের রাষ্ট্র অচিরেই গড়িয়া উঠে। এঙ্গেলস্ বলেন, 'এই সংগঠন সমাজের দুই শ্রেণীর বাড়ন্ত ব্যবধানকে শুধু জীয়াইয়াই রাখে নাই, বিষয়াধিকারী শ্রেণীকর্তৃক সর্বহারা শ্রেণীকে শোষণের অধিকার দিয়াছে, সমাজে অভিজাতশ্রেণীর প্রভুত্ব কায়েম করিয়াছে।'

এই সময়ে যে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, থিসিউস্‌কে বলা হয় উহার উদ্ভাবক। এই শাসনতন্ত্রদ্বারা এথেন্সে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থাদ্বারা সমগ্র জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—ইউপাট্রিদাই বা অভিজাত, জে'ওর্গয় বা কৃষক, দেমিওর্গয় বা কারিগর। রাষ্ট্রের পদগুলি অবশ্য অভিজাতশ্রেণীরই একচেটিয়া।

কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিবারের লোককে কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ ও অধিকার দেওয়াই এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্বেকার গোত্রের লোকগুলিকে অধিকারবিশিষ্ট ও অধিকারবিহীন, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা; অধিকার-বিহীনদের আবার দুইটি উৎপাদকশ্রেণীতে ভাগ করা এবং এইভাবে একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা—এসকলের মধ্যেই রহিয়াছে রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার প্রথম প্রচেষ্টা।

সোলোনের সময় পর্যন্ত এথেন্সে রাষ্ট্রের বিকাশের ইতিহাস অস্পষ্ট। সেনাপতির পদ তখন পরিত্যক্ত হইয়াছে, রাষ্ট্রের বড় বড় পদগুলি দখল করিত অভিজাতদের দ্বারা নির্বাচিত আর্কনেরা। অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমেই এতবেশী বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের দিকে উহা অসহনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সর্ব সাধারণের অধিকারগুলিকে দাবানোর প্রধান উপায় ছিল অর্থ ও কুসীদ। এথেন্সের অভিজাতেরা সামুদ্রিক বাণিজ্য ও কতকাংশে জলদস্যুতাদ্বারা বিত্তশালী হইয়া উঠে। সম্পত্তি তাহাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। এঙ্গেলস্ বলেন, 'যে পুরাতন ব্যবস্থা কৃষকদের রক্ষা করিত, তাহা শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটিকার কৃষকদের ধ্বংস সুরু হয়।...... অভিজাতদের অর্থের শাসন উহার পূর্ণপ্রসারের মুখে এমন একটা রীতির সৃষ্টি করে যাহা দ্বারা দেনাদারের বিরুদ্ধে পাওনাদারের স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে, ক্ষুদ্র কৃষকের উপর টাকার মালিকের শোষণ অব্যাহত থাকিবে।'

পূর্বে সকলেই ছিল সৈনিক, সকলে মিলিয়া সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য আগাইয়া আসিত; সমাজের সকল লোকেরই থাকিত অস্ত্র। কিন্তু নবীন রাষ্ট্রের নিজস্ব একটা সশস্ত্রশক্তি চাই, ইহা জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন একটা সংগঠন; অভিজাতদের শাসনক্ষমতা কায়েম রাখার প্রধান উপায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এবং মালবাহী জাহাজগুলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য নাবিকের জাতি এথেনীয়রা প্রথম নৌবাহিনীই গঠন করে। সোলোনের

পূর্বেই এটিকার জনসমষ্টি কতকগুলি 'নৌক্রেরারিয়াই' বা জিলায় বিভক্ত হয়; প্রত্যেকটি জিলার লোককে একটি যুদ্ধ-জাহাজ দিতে হইত ও উহার জন্য লোক যোগাইতে হইত। অশ্বারোহীও দিতে হইত কয়েকজন। এই ব্যবস্থায়,—একদিকে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের স্বকীয় সামরিক শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে বাসস্থানের ভিত্তিতে জনগণ কতকগুলি সমষ্টিতে বিভক্ত হইয়াছে।

নূতন রাষ্ট্র নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে নাই, তাই জনগণ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। এঙ্গেলস্ বলেন, 'সোলোন কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র নির্যাতিতদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করে'।

সোলোনের শাসনতন্ত্র যেরূপই কার্যকরী হউক না কেন, উহা যে একটির পর একটি বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল বিপ্লবই একপ্রকার বিত্তকে অন্যপ্রকার বিত্তের বিরুদ্ধে রক্ষা করার বিপ্লব; বিপ্লবমাত্রই একটিকে রক্ষা করিতে গিয়া অন্যটিকে খর্ব না করিয়া পারে না। সোলোনের প্রবর্তিত সংস্কারে দেনাদারের বিত্তকে বাঁচানোর জন্য পাওনাদারের বিত্তকে ক্ষুন্ন করা হয়। সোলোন ঋণ বাতিল করিয়া দেন।

শাসনতন্ত্রের নূতন সংস্কার করা হয়। পরিষদের সদস্য করা হয় ৪০০, সোলোন ভূসম্পত্তি ও ভূসম্পত্তির উৎপাদন অনুসারে নাগরিকদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেনঃ ৫০০; ৩০০; ১৫০ মেডিমনি (১) মেডিমনি = ৯ গ্যালন) শস্য প্রথম তিনশ্রেণীর সর্বনিম্ন উৎপাদন। যাহাদের দখলে কম জমি, অথবা কোন জমিই নাই তাহারা চতুর্থ শ্রেণী। উচ্চতর তিনটি শ্রেণী হইতেই শুধু রাষ্ট্রের প্রধান পদগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা হয়। চতুর্থ শ্রেণীর অধিকার শুধু গণপরিষদে বক্তব্য বলার ও ভোট দেওয়ার। কিন্তু এই গণপরিষদেই সমস্ত কর্মচারী নির্বাচিত হইত। চারিটি শ্রেণী হইতে একটি সামরিক সংগঠনও গড়িয়া উঠে। প্রথম দুইটি শ্রেণী হইতে অশ্বারোহী এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতে ভারী পদাতিক বাহিনী গঠিত হয়; চতুর্থটি হইতে গঠিত হয় হাল্কা পদাতিক, নৌবাহিনীর লোকও এই শ্রেণীকেই যোগাইতে হইত।

এইভাবে শাসনতন্ত্রে সম্পূর্ণ নূতন একটি উপাদান যোগ করা হয়; এই উপাদানটি ব্যক্তিগত স্বত্ব। ভূসম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে এখন রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হয়। ইহার পরে ক্লাইস্থিনিস্ শাসনতন্ত্রের আরও সংস্কার করেন। পূর্বে জনসমষ্টিকে বিভাগ করা হইয়াছিল, এখন জনপদকে বিভাগ করা হয়। সমগ্র এটিকাকে ১০০ বিভাগে বিভক্ত করা হইল, ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বায়ত্তশাসিত। ইহাদের নাম

'ডেমেস্'*। প্রত্যেকটি ডেম-এর নাগরিকেরা ডেমার্ক বা সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও ত্রিশজন বিচারক নির্বাচন করিত। দশটি ডেম-এর একটি মণ্ডলী থাকিত; মণ্ডলীর সভাপতি ফাইলার্ক। প্রত্যেকটি মণ্ডলী এথেনীয় পরিষদে ৫০ জন সদস্য নির্বাচন করিত। এথেনীয় রাষ্ট্র দশটি মণ্ডলীর ৫০০ সদস্যের একটি পরিষদ দ্বারা শাসিত হইত; সকলের শেষে ছিল গণপরিষদ—ইহাতে প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিকেরই উপস্থিত থাকার ও ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল; আর্কন এবং অন্যান্য কর্মচারীরা শাসন এবং বিচারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিত। এই নূতন শাসনতন্ত্র বিদেশীদের ও মুক্ত দাসদের নাগরিক অধিকার লাভের সুযোগ দেয়।

কিভাবে রাষ্ট্র বিকাশ লাভ করিয়াছে, কিভাবে সমাজের পুরাতন গণ-তান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তে অভিজাতদের স্বার্থের পরিপোষক নূতন শাসনকাঠামোর আবির্ভাব হইয়াছে, কিভাবে অভিজাতের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও শাসনতন্ত্রের সংস্কার করা হইয়াছে, কিরূপে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের একটা স্বকীয় সশস্ত্র শক্তির জন্ম হইয়াছে—গ্রীসের ইতিহাসে তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

(২)

যদিও দাসপ্রথাই গ্রীকসমাজের ভিত্তি, তথাপি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে স্বাধীন চিন্তাবাদী দার্শনিকের অভাব ছিল না। দার্শনিক জেনোফেন বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের উদ্ভাবক হোমার ও হিসিয়ড্; সবচেয়ে কৌতুকের বিষয়, ইঁহারা ঈশ্বরের উপর আরোপ করিয়াছেন মানুষের নিজের দোষ-গুণ। মানুষ মদ খায়, দেবতারাও মদ খায়; মানুষ মিথ্যা কথা বলে, দেবতারাও মিথ্যা কথা বলে। মানুষের মধ্যে উচ্চনীচ আছে, দেবতাদের মধ্যেও উচ্চনীচ আছে।'

প্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক ডিমক্রিটাস্। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মানুষ অবশ্য ভাগ্য, স্বপ্ন ও দেবতার কোপদৃষ্টি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে; কিন্তু এসব অলীক,—মানুষের অজ্ঞতা ও কল্পনার সৃষ্টি।' ডিমক্রিটাস্ একজন বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বস্তুই'† আসিদত্ত্বা; উহার মূল উপাদান পরমাণু‡; পরমাণু নিয়ত গতিশীল—গতির ক্রমের মধ্যে পরমাণু-গুলি এক হয়, আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। বিশ্বের সকল অচেতন ও চেতন পদার্থ পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হয়।' ডিমক্রিটাস আত্মার অস্তিত্ব

* Demes; † Matter; ‡ Atom

অস্বীকার করেন। তাঁহার অনেক মতই ভুল, কিন্তু তিনিই জগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক। কেননা ধর্মের আশ্রয়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক মত গড়িয়া উঠে নাই, বাস্তবের ভিত্তির উপরেই তিনি বিজ্ঞানের গবেষণা করেন।

দাস-মালিকদের ছেলেরা স্বাধীন-চিন্তাবাদী দার্শনিকদের মত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইত; তাহারা ধর্মের কাহিনী এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডকে উপহাস করিত। কিন্তু দাস-মালিকেরা স্বাধীনচিন্তা ও ধর্মের প্রতি বিরূপ-ভাব নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিত। নিজেদের গণ্ডীর বাহিরে—শোষিতদের মধ্যে—ইহারা ধর্মকে সমর্থন করিত; কেননা ধর্মদ্বারা দাসদের ভুলাইয়া রাখা সহজ।

বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটীস্ দেবতায় বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু নগর-দেবতার পূজা দিতে এবং ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড পালন করিতে তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। পেরিক্লিসের শত্রুরা অভিযোগ করে যে পেরিক্লিস্ এবং তাঁহার বন্ধু দার্শনিক এনাক্সাগোরাস্ ঈশ্বরবিরোধী; পেরিক্লিস্ দেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য বন্ধু এনাক্সাগোরাসকে আদালতে উপস্থিত করেন। আদালতের বিচারে এনাক্সাগোরাস্ এথেন্স হইতে বহিষ্কৃত হন।

গ্রীসে নগরে এবং গ্রামে একইরকম ধর্মের প্রচলন ছিল না। গ্রামের লোকেরা যে সব দেবতাদের ফসলের কর্তা মনে করিত তাহাদেরই পূজা দিত, গ্রামের লোকেদের নিকট ডিমিটার ও ডিয়োনিসুস্‌ই প্রধান দেবতা। গ্রীকেরা ভাবিত শীতের সময়ে ডিয়োনিসুস্ বাঁচিয়া থাকে না, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি ম্লান হইয়া পড়ে। বসন্ত আসিলেই ডিয়োনিসুস্ আবার জীবন্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি সজীব হইয়া উঠে। কিছু-কাল পর পরই গ্রীকেরা ডিয়োনিসুসের উৎসব করিত। এইসব উৎসবে নৃত্যগীতের ও মদের ছড়াছড়ি হইত।

শহরের ছিল অন্যরকম ধর্ম। প্রত্যেকটি শহরের থাকিত এক একজন নগর-দেবতা। সকলকেই ইহার পূজা করিতে হইত, কেননা নগর-দেবতা শহরের সকলের রক্ষক। এথেন্সের দেবতা থিসিয়ুস্; এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথিন*। এথিনের মন্দিরেই থাকিত রাষ্ট্রের কোষাগার। ইহাদের ছাড়া, অন্যান্য দেবতাও ছিল; সকল গ্রীকই এই দেবতাদের পূজা করিত। জিয়ুস্ শুধু সকল মানুষেরই দেবতা নয়, জিয়ুস্ দেবতাদেরও অধিপতি। অলিম্পাস্ পাহাড়ে তাহার বাস। চার বৎসর পর পর জিয়ুসের সম্মানার্থে সকল গ্রীকেরা একসঙ্গে উৎসব করিত—এই উৎসবে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা

* Athene

হইত। এপোলোর পূজাও সকল গ্রীকেরাই করিত। গ্রীকেরা এপোলোর নিকট হইতে আকাশবাণী শুনিত। পুরোহিতেরাই অবশ্য দেবতার নামে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিত। থেমিস্টকলস্ কিভাবে এপোলোর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শাসকেরা পুরোহিত-দের ঘুষ দিত, তাহাদের সঙ্গে চুক্তি করিত এবং তাহাদের মনোমত আকাশ-বাণী পুরোহিতের মুখ দিয়া বাহির করাইত।

সকল গ্রীকমন্দিরেরই ধনসম্পত্তি থাকিত প্রচুর। মন্দিরের নিজস্ব আয় তো ছিলই, তাহা ছাড়া বড়লোক এবং রাষ্ট্রের দানও থাকিত। পুরোহিতেরা উচ্চহারে সুদে টাকা খাটাইত। সবচেয়ে বড় সুদখোর ছিল এপোলোর মন্দিরের পুরোহিতেরা। সুদখোর পুরোহিত এবং দাসের মালিক এইসব পরগাছারাই গ্রীসের সবচেয়ে বড় শোষণকারী।

শুধু গ্রীসেই নয়, সর্বত্র—মালিকশ্রেণীর হাতে ধর্ম শোষণের একটা বড় উপায়। গ্রীসের শাসকেরা নিজেরা হয়ত ধর্মে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু সাধারণলোককে শোষণের উদ্দেশ্যে ধর্মের ভাণ করিত। স্বাধীনচিন্তাবাদী, ধর্ম-বিরোধী ব্যক্তিদের ইহারা প্রাণদন্ড পর্যন্ত দিতে ছাড়ে নাই। সক্রেটীসের কি দশা হইয়াছিল তাহা সুবিদিত।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠশতকে গ্রীক্ কলাবিদ্যা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। আজও সারা পৃথিবীর ভাস্কর ও স্থপতিরা গ্রীক কলানৈপুণ্য ও কারুকর্মের অনুকরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও গ্রীকশিল্পীরা প্রকৃত-পক্ষে দাস-মালিকদেরই চাকুরি করিতেন। ফিডিয়াসের বিস্ময়কর প্রতিভা দাস-মালিকদের ফরমাইস মতো নিয়োজিত হইত। এথেনীয় 'এক্রপোলিস্' ফিডিয়াসের পরিকল্পনানুযায়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। ফিডিয়াস্ এবং অন্যান্য শিল্পীরা নিজেরাই বণিক; বড় বড় মর্মর মূর্তি এবং প্রাসাদ নির্মাণে উহারা দাসদের খাটাইতেন; শিল্পীরা পরিকল্পনা দিতেন, কাজের নির্দেশ দিতেন। ভারী কাজ দাসেরাই করিত, সূক্ষ্ম কাজ ছিল শিল্পীদের।

প্রথম নাটকের জন্ম প্রাচীন গ্রীসে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকেই সারা গ্রীসে নাটক বা থিয়েটার হইত। থিয়েটার শব্দটি গ্রীক। নাটকের মঞ্চ এত বড় করিয়া তৈয়ার করা হইত যে ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার শ্রোতা একসঙ্গে বসিতে পারিত। দেবতা ডিয়োনিসুস্‌কে কেন্দ্র করিয়া যে বসন্তকালীন উৎসব হইত তাহা হইতে থিয়েটারের জন্ম। কবিরা এইসব উৎসবের জন্য গান রচনা করিতেন।

গ্রীক নাট্যকারেরা সাধারণত নাটকের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতেন ধর্মের কাহিনী হইতে। অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ দেবতাদের দ্বারা পৃথিবী শাসিত হইতেছে, তাহাদের ইচ্ছায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, বিধির বিধানের

উপর মানুষের হাত নাই—নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রোতাদের মনের উপর এইরূপ দাগ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ধর্মীয় উৎসবগুলি হইতেই নাটকের জন্ম, সুতরাং নাটক যে ধর্মের সমর্থন করিবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। গ্রীক থিয়েটার গ্রীক ধর্মেরই মতো দাসমালিকদের হাতে ছিল একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র। ইহার সহায়তায় দাসমালিকেরা সাধারণ লোকের মধ্যে নিজেদের ভাব, নিজেদের আদর্শ প্রচার করিত; সকল সময়ই উদ্দেশ্য থাকিত নিজেদের শ্রেণীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা।

(৩)

গ্রীকদের পৌরানিক কাহিনীতে স্ত্রী দেবতাদের যেরূপ পদমর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় কোন একটা সময়ে গ্রীকদের মধ্যে নারীর স্থান ছিল সম্মানজনক। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখিতে পাই যে পুরুষের প্রাধান্য এবং দাসীমেয়েদের প্রতিযোগিতার দরুন নারীর মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে। হোমারে দেখা যায় যে যুবতী মেয়েরা লুঠের মালে পরিণত হইয়াছে; বিজয়ী বীরের সম্ভোগের জন্য নারীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পদ মর্যাদার ক্রম অনুসারে সেনাধ্যক্ষরা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বাছিয়া লয়। একটি দাসী-মেয়েকে লইয়াই একিলিস ও এগামেম্ননের বিবাদ বাধিয়াছিল। পুরুষেরা যাহাই করুক বিবাহিতা স্ত্রীকে সবই সহিয়া যাইতে হইবে; তাহাকে খাঁটি পাতিব্রত্য ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। স্বামীর নিকট স্ত্রী বৈধ সন্তানদের মাতা, তাহার প্রধান গৃহকর্ত্রী—স্বামীর রক্ষিতাদের তত্ত্বাবধায়ক।

এথেন্সে মেয়েরা শুধু সুতাকাটা, বয়ন, সেলাই—আর খুব বেশী হইলে—একটু লিখিতে ও পড়িতে শিখিত। তালাবন্ধ ঘরে তাহাদের বাস করিতে হইত; মেয়েরা ছাড়া মেয়েদের অন্যকোন সাথী থাকিতে পারিত না। বাড়িতে পুরুষ আগন্তুক আসিলে মেয়েরা অন্দরে সরিয়া যাইত। দাসী সঙ্গে না লইয়া তাহারা কখনও বাহিরে যাইত না, গৃহের অভ্যন্তরে তাহাদের কড়া পাহারায় রাখা হইত। পুরুষের ছিল খেলাধুলা এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য কাজ; নারীর পক্ষে সেগুলি মানা। এথেন্সের চরম উন্নতির দিনগুলিতে ব্যাপক আকারে বেশ্যাবৃত্তির প্রচলন ছিল; রাষ্ট্র ইহার পোষকতা করিত। যে সমাজের ভিত্তিই ছিল দাসত্ব, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে উহার প্রতিফলন হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

গ্রীকরাষ্ট্রের পতন

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ হইতেই এথেন্সের দাসমালিকেরা কোরিন্থ এবং গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি জয় করার জন্য উদ্যোগী হয়। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেন্সের শাসকেরা এই অভিযানের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করে। পেরিক্লিস ভাবিয়াছিলেন, স্পার্টার দাস বা হিলট্‌দের বিদ্রোহের উস্কানি দিয়া সেখানে অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি করিবেন এবং পরে স্পার্টা আক্রমণ করিয়া সহজেই তাহা দখল করিয়া লইবেন। স্পার্টা পরাজিত হইলে কোরিন্থ সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিবে, কেননা স্পার্টার সাহায্য ছাড়া কোরিন্থ একাকী কখনও এথেনীয়দের আক্রমণ ঠেকাইতে সমর্থ হইবে না।

কোরিন্থবাসীরা এথেনীয়দের মতলব বুঝিতে পারিয়া নিজেরাই প্রথম অগ্রণী হয় এবং খৃঃ পূঃ ৪৩১ সনে এথেন্স আক্রমণ করে। ইহাই বিখ্যাত পিলোপনেসিয়ান যুদ্ধ; এই রক্তাক্তসংগ্রাম সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। পেরিক্লিসের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়; এথেন্সের সেনাবাহিনী পরাজিত হইতে থাকে।

এই সমস্ত বিপর্যয়ের ফলে এথেন্সে আপসকামী একটা দলের আবির্ভাব হয়। কৃষক ও ভূস্বামীরাই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বেশী, তাই ইহারাই শান্তির জন্য আন্দোলন চালায়। কিন্তু বণিক ও দালালেরা যুদ্ধের দরুন অন্যায় মুনাফা যথেষ্টই অর্জন করে। এই শ্রেণীর দাস মালিকেরা যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার পক্ষপাতী। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে যুদ্ধবন্দী দাস ধরিয়া আনার সুযোগ হয়, দাস-ব্যবসায়ও ফাঁপিয়া উঠে। সুতরাং এথেনীয় বাহিনীর ক্রমাগত বিপর্যয় সত্ত্বেও ইহারা শান্তি ও সন্ধির বিরোধিতা করিতে থাকে।

যাহা হউক, দশ বছর পর ৪২১ সনে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কোন পক্ষ হারেও নাই, জিতেও নাই; জয়-পরাজয় ছাড়াই এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়।

কিন্তু ছয় বছরের মধ্যেই যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। সম্মুখ যুদ্ধে কোরিন্থকে হারানো সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন নেতা এল্‌সিবিয়াডিস্‌ পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। সিসিলি হইতে কোরিন্থে গম চালান হয়; সিসিলির গম কোরিন্থের বাজার হইতে পিলোপনিসাসের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কোরিন্থের শিল্পদ্রব্যের বাজারও সিসিলি। অতএব

সিসিলি আক্রমণ করিয়া যদি তাহা হস্তগত করা যায়, তবে কোরিন্থ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, পিলোপনিসাসের বাজার তখন আপনা হইতেই এথেন্সের দাসমালিকদের মুঠায় আসিয়া পড়িবে।

দাস মালিকেরা এল্‌সিবিয়াডিসের প্রস্তাব সমর্থন করে। এল্‌সিবিয়াডিস্‌ গণপরিষদকে বুঝাইলেন যে এই যুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করা যাইবে এবং যুদ্ধ জয়ের ফলে এথেন্স প্রচুর সম্পদ হাত করিতে পারিবে। এথেন্স এত ধনবান হইবে যে প্রত্যেকটি এথেনীয়কে তখন রাষ্ট্র হইতে বেতন দেওয়া সম্ভব হইবে। এথেনীয় গণপরিষদ এইসব অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ হইয়া যুদ্ধের প্রস্তাবে সায় দেয়। এথেন্স সিসিলি আক্রমণ করিল সত্য, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই পরাজিত হয়। এদিকে কোরিন্থিয়ান এবং স্পার্টানরা একযোগে এথেন্স আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। ইহারা পুরাতন শত্রু পারস্যরাজের সঙ্গে এথেন্সের বিরুদ্ধে চুক্তি করে। পারস্যরাজ স্পার্টা ও কোরিন্থকে অর্থ ও নৌবহর দিতে সম্মত হয়; বিনিময়ে তাহাকে এশিয়ামাইনরের দ্বীপ ও শহর-গুলি ফিরাইয়া দিতে হইবে। এথেনীয়রা এই সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখে হটিতে বাধ্য হয়। স্পার্টা যে-সব শর্ত উপস্থিত করে এথেন্সের পক্ষে সবই মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

জয়দৃপ্ত স্পার্টা এখন অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি আক্রমণ করে; সমস্ত গ্রীস পদানত করাই স্পার্টার উদ্দেশ্য। কিন্তু এইসব রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে স্পার্টার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এই যুদ্ধ পঁয়ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। স্পার্টা এই সুদীর্ঘ যুদ্ধে নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

ষাট বছরব্যাপী যুদ্ধে সারা গ্রীসের অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়।

সকলের আগে ধ্বংস হয় গ্রীক কৃষক। সৈন্যরা অভিযানের সময় চাষের জমি, ফলের বাগান নষ্ট করিয়া দেয়। বিধ্বস্ত গ্রামগুলি একপ্রকার পরিত্যক্তই হয়। কৃষক এবং ক্ষুদ্র গৃহস্থরা জীবনধারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সামান্য মূল্যে তাহাদের ভিটা ও জমি ছাড়িয়া দেয়। শহরের বড় বড় দাস-মালিকেরা তাহা কিনিয়া লয়। ইহারা এইসব জমি একত্র করিয়া, বড় আকারে কৃষি-উৎপাদনের ব্যবস্থা করে; দাসশ্রমিকের তো অভাব নাই।

শহরেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যবসায়ীর হাতে টাকার পুঁজি এখন খুব বাড়িয়া যায়। যুদ্ধে রাষ্ট্র যে টাকা খরচ করিয়াছে তাহার অধিকাংশই ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে। যুদ্ধের সময়ে দাস ব্যবসায়েও খুব লাভ হয় । এই ব্যবসায়ীরা শিল্পোৎপাদনে পুঁজি খাটায়। যুদ্ধের পরের দশ বৎসরের মধ্যে

এথেন্সের শিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়। কারখানা বা ইরগাস্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়ে; এক একটি কারখানায় এখন ৮০ হইতে ১০০ দাস খাটে।

এথেন্সে নূতন একটা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়, সারা গ্রীসে ইহাই সবচেয়ে বড় ব্যাংক। এই ব্যাঙ্কের কর্তা পেসিয়নুস; আমাদের টাকায় এই ব্যাঙ্কের পুঁজি ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। আরও কতকগুলি ব্যাঙ্ক ছিল। রাষ্ট্র, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সকলেরই এইসব ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে হইত। পেসিয়নুসের যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারীর একটা বড় কারখানাও ছিল।

সারা গ্রীসেই শহরের হস্তশিল্পীরা বেকার হইতে থাকে। বড় বড় কারখানাগুলির সংগে আঁটিয়া উঠা খুবই শক্ত। পঞ্চম শতকের পরে চতুর্থ শতকে প্রতিযোগিতা আরও কঠোর হইয়া দাঁড়ায়। কৃষকেরা পূর্বে শহরের কারিগরদের জিনিস ব্যবহার করিত, এখন তাহাও বন্ধ হইয়াছে। কেননা কৃষকেরা নিজেরা সর্বস্বান্ত। অতএব বেকারজীবন ছাড়া কারিগরদের অন্য আর উপায় কি?

পিলোপনিসাসের যুদ্ধের পরে দাস অর্থনীতির যেরূপ বিকাশ হইয়াছে তাহার ফলে শ্রেণীবিরোধ তীব্র হইতে বাধ্য। সকল রাষ্ট্রেই নিম্নমধ্যবিত্ত হয় বেকার হইয়াছে, নয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পরের জমিতে কিংবা পরের কারখানায় যে কাজ করিবে তাহারও উপায় নাই, মাঠেই হউক আর কারখানায়ই হউক, দাস-শ্রমিকের সংগে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা কঠিন। দাস-শ্রমিকদের খাটানো হয় বেশী, আবার উহাদের জন্য খরচও কম, ফলে, সমাজে এখন দুইটি বিরোধী শ্রেণী পরস্পরের মুখোমুখী হয়। একটি ধনবান মালিকদের, অপরটি বেকার সর্বহারাদের। বেকার সর্বহারাদের পক্ষে বিদ্রোহের পথ বাছিয়া নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

গ্রীসের বেকারের দলের নির্দিষ্ট কোন কার্যসূচী, নীতি এবং রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। তাহারা এইটুকু মাত্র বুঝিত,—যে ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক ধনবান এবং অধিকাংশ লোক গরীব সেরূপ ব্যবস্থার অবশ্য লোপ হওয়া চাই। তাহারা দাবি করিতে থাকে—ঋণ বাতিল করিতে হইবে, জমি এবং দাস-মালিকদের টাকা সকলের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে, রাষ্ট্রের কোষাগার হইতে গরীবদের নিয়মিত ভাতা দিতে হইবে।

কিন্তু গ্রীসের এই বিপ্লবী জনসাধারণ দাসত্বপ্রথার বিলোপ দাবি করে নাই। প্রকৃতপক্ষে, দাসত্ব তাহারা সমর্থনই করিত। কেননা আচার্য এবং দার্শনিকেরা তাহাদের শিখাইয়াছে—'যাহাদের অবসর আছে একমাত্র তাহারাই রাষ্ট্র-কার্যে অংশ নিতে পারে।' যাহারা দাস খাটাইতে সমর্থ তাহাদেরই অবসর জীবন সম্ভব। বিপ্লবের পরে দাসদের রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইবে, এইরূপই ইহারা মনে করিত। দাসেরা এখন যেমন কতিপয়ের জন্য

খাটে, তখন সকলের জন্য খাটিবে। এইরূপ ব্যবস্থায় সকলেই অবসর লাভ করিবে এবং রাষ্ট্র কার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাইবে। সুতরাং এই বেকারের দল প্রকৃত সর্বহারাদের বিপ্লবী দল নয়, উহা বিধ্বস্ত নিম্ন-মধ্য-বিত্তের দল, ইহারা স্বপ্ন দেখিত যে বিপ্লব সার্থক হইলে সকলেই দাসমালিক হইতে পারিবে।

খৃঃ পূঃ ৩৭০'র দিকে বেকারদের বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। আরগসের বিদ্রোহীরা ১২০০ দাস মালিককে হত্যা করে। কোরিন্থের বিদ্রোহীদের হাতে ১২০ জন ভূস্বামী নিহত হয়; বহু দাসমালিক অন্য রাষ্ট্রে পলাইয়া যায়। বিদ্রোহীরা কোন কোন জায়গায় সাফল্য লাভ করিলেও, বিদ্রোহের নেতারা নিজেরাই আত্মসাত করে অধিকাংশ জমি। ক্ষুদ্র কৃষকদের অবস্থার কিছুই পরিবর্তন হয় নাই।

এদিকে দাসমালিকদের আরও একটা বিপদে পড়িতে হয়। বেকার কৃষক ও কারিগরদের বিদ্রোহ তো আছেই, তাহা ছাড়া দাসেরাও এখন আর মালিকের অত্যাচার চুপ করিয়া মানিয়া লইতে রাজী নয়। ইহাদের বশে রাখা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। দাসেরা দলে দলে মনিবের আশ্রয় ছাড়িয়া পাহাড়ে পলাইয়া যাইতে থাকে; পাহাড় হইতে মাঝে মাঝেই তাহারা শহর গুলির উপর চড়াও হয়। কিয়স দ্বীপের পলাতক দাসদের নেতা ড্রিমাক দাসদের সংগঠিত করিয়া অনেক জায়গায়ই রাষ্ট্রের সশস্ত্র ফৌজের জোর প্রতিরোধ করে। দাস মালিকেরা ড্রিমাকের প্রাণ লওয়ার জন্য অনেকবার চেষ্টা করে; অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের হাতে ড্রিমাক নিহত হন। গ্রীসের সর্বত্র পলাতক দাসেরা ড্রিমাককে মনে করিত তাহাদের দেবতা; তাহার মৃত্যুর পরেও দাসেরা ড্রিমাকের পূজা করিত। দাসদের বিদ্রোহ থামে নাই, সর্বত্রই উহা কিছু না কিছু চলিতে থাকে।

বিদ্রোহের ভয়ে কোন কোন জায়গার সুদখোরেরা নিজ হইতেই ঋণ বাতিল করিয়া দেয়; কোন কোন রাষ্ট্র গরীবদের ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। অনেক ধনী ভূস্বামী নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী ও দেহরক্ষী নিযুক্ত করে। এসব সত্ত্বেও দাস-মালিকেরা বুঝিতে পারিয়াছিল, সমস্ত গ্রীসকে একজন রাজার অধীনে সংঘবদ্ধ না করিতে পারিলে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দূর করা সম্ভব নয়। স্বদেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পজাতদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়; দস্যুর আক্রমণে জলপথে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়েরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সমস্ত গ্রীস্ একজন রাজার অধীনস্থ হইলে বাণিজ্য এবং শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব। তাহা ছাড়া, শক্তিশালী রাজার অধীনে বড় সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠিলে কৃষকদের উহাতে ভর্তি করিয়া অসন্তোষ দূর করা সম্ভব হইতে পারে। এইসব বিবেচনা

করিয়া দাস-মালিকেরা রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। এরিস্টট্‌লের মত দার্শনিককেও দাস-মালিকেরা তাহাদের মতের স্বপক্ষে পায়। এরিস্টট্‌ল প্রচার করেন, রাজতন্ত্রই সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা।

মেসিডোনিয়ার ফিলিপকেই মনে করা হইল সারা গ্রীসের রাজা হওয়ার উপযুক্ত। ফিলিপ একদিকে এক একটি করিয়া গ্রীক রাষ্ট্র দখল করিতে থাকেন; অন্যদিকে গ্রীসের রাজতন্ত্রীদলগুলির সঙ্গেও চুক্তি করেন। একমাত্র এথেন্সেই তিনি কিছুটা বেগ পান; যাহা হউক এথেন্সের প্রতিরোধ ভাঙিয়া পড়িলে সকল রাষ্ট্রই স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ফিলিপ গ্রীক-রাষ্ট্রগুলির একটা সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে সারা গ্রীসের একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক থাকিবেন ফিলিপ স্বয়ং। ফিলিপ ঘোষণা করেন, ব্যক্তিগত স্বত্বের উপর আক্রমণ রাজদ্রোহ বিবেচিত হইবে। দাস-মালিকেরা এইরূপ ব্যবস্থাই চাহিয়াছিল। সম্মেলনে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার প্রস্তাব নেওয়া হয়। নূতন দেশ ও নূতন বাজার হাত করাই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

কিন্তু কিছুকাল পরই ফিলিপ নিহত হন; ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার প্রাচ্যদেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের ভার গ্রহণ করেন। আলেকজাণ্ডার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমরনায়কদের অন্যতম। খৃঃ পূঃ ৩৩৭ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হয়; সাতবছর যুদ্ধের পর তিনি সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য দখল করেন। আলেকজাণ্ডাব এখন পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সীরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের সম্রাট। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর মেসিডোন সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। গ্রীকেরা বিজিত দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে; বড় বড শহরগুলি গ্রীক বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রীসের বেকারেরা এসব দেশে ভিড় করিতে থাকে। সৈন্য ও বেকারদের মধ্যে জমি বাঁটিয়া দেওয়া হয়। ভূ-স্বামীশ্রেণীরও সৃষ্টি হয়। গ্রীক ভূ-স্বামীদের জমিতে স্থানীয় কৃষককে জোর করিয়া খাটানো হইত। আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের ত্রিশ চল্লিশ বছবের মধ্যে গ্রীসের সকল শ্রেণীর লোকই ধনসঞ্চয়ের সুবিধা পায়। কিন্তু শীঘ্রই প্রাচ্যের বণিক ও শিল্পপতিদের প্রতিযোগিতার নিকট গ্রীকদের পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

প্রাচ্যের গ্রীকদের তিনটি সাম্রাজ্যের প্রধান তিনটি কেন্দ্র ছিল, নীলনদের মুখে আলেকজাণ্ড্রিয়া, টাইগ্রীসের তীরে সেলিউসিয়া এবং সীরিয়ায় অরোণ্টাসের তীরে এণ্টিয়োক। বড় বড় ভূ-স্বামীরাই এইসব সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণী। গ্রীক এবং মেসিডোনীয় ভূ-স্বামী তো ছিলই, তাহা ছাড়া উপরে পাশাপাশি ছিল দেশীয় ভূ-স্বামী ও রাজারা। তখনকার অর্থ-

নৈতিক কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। গ্রীক ভূ-স্বামীরা প্রাচ্যে বিলাস ও আলস্যের জীবন যাপন করিত। দাস-শ্রমিকদের খাটাইয়া বিশাল প্রাসাদ, সুরম্য অট্টালিকা, মনোরম উদ্যান তৈয়ারই ছিল ইহাদের একমাত্র কাজ। স্থাপত্য-কার্যের জন্য এইসব বিদেশী ভূ-স্বামীরা গ্রীস হইতে ভাস্কর ও শিল্পীদের আনাইত। সামন্ত-পরগাছাদের অলস, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের ভিত্তি ছিল দাস ও ভূমিদাসকে শোষণ।

প্রাচ্যে গ্রীকদের বাণিজ্যপথগুলি এখন পরিবর্তিত হইয়াছে। এই রাস্তাগুলি ভারতবর্ষ, আরব ও সুদানকে একদিকে গ্রীসের সঙ্গে এবং অন্যদিকে ইটালির সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। এইসব রাস্তার উপরে যেসব নূতন বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে, সেগুলি আগেকার গ্রীককেন্দ্রগুলির গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দেয়।

আলেকজাণ্ড্রিয়াই এখন শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়; সমগ্র প্রাচ্যের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ। আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে মালবোঝাই বাণিজ্য জাহাজ-গুলি রোড্স্ দ্বীপে যাইত; রোড্স্ হইতে মাল চালান হইত কোরিন্থে; সেখান হইতে গ্রীস এবং ইটালির বিভিন্ন স্থানে তাহা ছড়াইয়া দেওয়া হইত। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে এথেন্সের গৌরব চিরদিনের মত ম্লান হইয়া যায়। আলেকজাণ্ড্রিয়ার পরই সীরিয়ার অরোণ্টাস্ নদীর তীরে এণ্টিয়োক প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। আরব, সীরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার অভ্যন্তর হইতে উটের পিঠে বাণিজ্যদ্রব্য এই বন্দরে চালান হইত। সেখান হইতে পাঠানো হইত রোড্সে। আলেকজাণ্ড্রিয়ায় শিল্পকারখানাও অনেক-গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার তৈয়ারী শিল্পজাত দ্রব্য সস্তা, তাই গ্রীস ও ইটালির বাজারে আলেকজাণ্ড্রিয়ার জিনিসের চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। দাস-ব্যবসায়েরও একচেটিয়া বাজার আলেকজাণ্ড্রিয়া-ই।

প্রাচ্যের গ্রীক সাম্রাজ্যগুলিতে ছোট ব্যবসায়ী এবং ছোট কারিগরদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। রাজকীয় কর্মচারীরা তাহাদের নিকট হইতে বে-আইনীভাবে নানারকমে অর্থ আদায় করিত; রাজকীয় ব্যাঙ্কগুলিরও অত্যাচার কম নয়। কৃষকদের উপর শোষণ ছিল একদিকে তাহাদের উপরি-ওয়ালা মনিবদের, অন্যদিকে রাষ্ট্রের। গ্রীক শাসনে প্রাচ্যের ভূমিদাসদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। নূতন শাসকেরা আগেকার টেক্সের হার শুধু বৃদ্ধিই করে নাই; তাহাদের উপর আরও কয়েকরকমের নূতন টেক্স চাপাইয়া দেয়।

গ্রীসের এবং মেসিডোনিয়ার সৈন্যদের মধ্যে যাহারা কৃষক ছিল তাহারা অনেকেই প্রাচ্যে ঔপনিবেশিকরূপে থাকিয়া যায়। উহাদের অবস্থাও তেমন

ভাল ছিল না। ইহারা অবশ্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমি পায়, কিন্তু তাহাতে উহাদের চলা কঠিন হইত। যে-সব রক্ষীদলের নিয়মিত বেতন ছিল, আবার জমিও ছিল—তাহারাই কতকটা স্বচ্ছল। ধীরে ধীরে ইহাদের অবস্থা ভাল হয়; রাষ্ট্র ইহাদের নানারকম সুবিধাও দেয়। এইসব বড় কৃষকেরা দাস কিনিয়া খাটাইতে পারিত। কিন্তু অধিকাংশ ঔপনিবেশিক কৃষকই গরীব, হয় বড়-ভূস্বামীদের নিকট, নয়ত ব্যাঙ্কের নিকট কর্জের জন্য ইহাদের হাত পাতিতে হইত। ঋণ শোধ করিতে না পারিলেই এইসব কৃষকেরা জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত। এইভাবে অনেকেই দাসে পরিণত হইত, এই বিধ্বস্ত কৃষকের দল অনন্যোপায় হইয়া শহরের দিকে যাইত, কিন্তু সেখানে কাজ পাওয়া কঠিন। আলেকজান্দ্রিয়া, এণ্টিয়োক ও সেলিউসিয়া বেকারদের ভিড়ে ভরিয়া যায়।

ঔপনিবেশিকদের অনেকেই দলবদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝেই রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত—ঋণ বাতিল করিয়া দেওয়া এবং রাষ্ট্র হইতে সাহায্য দেওয়াই থাকিত উহাদের দাবি। শহরে এইসব বিদ্রোহ দেখা দিলেই অন্যান্য অভাবগ্রস্ত লোকেরাও তাহাতে যোগ দিত। বেকার, ভাড়াটে শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগর কেহই বাদ থাকিত না। শাসকেরা নিগ্রো, আরব ও সীরিয়ান ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারা বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিত।

ঔপনিবেশিক গ্রীকেরাই শুধু নয়, বিজিত দেশের নিপীড়িত কৃষকেরাও বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইত। স্থানীয় শাসকেরা নানারকমের শোষণ তো করিতই, তাহা ছাড়া উহাদের উপর লুণ্ঠনও চলাইত। বিদ্রোহের বিরাম ছিল না; জনগণের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ফলে প্রাচ্যের গ্রীক সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়ে ও ক্ষয় পাইতে থাকে।

মেসিডোনশক্তির আবির্ভাবের পর হইতেই গ্রীকরাষ্ট্রগুলি তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। বড় বড় কয়েকটি শহরের কিছুটা অধিকার তখনো ছিল বটে, কিন্তু বেশীরভাগই তাহা পৌর-অধিকার মাত্র; রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে বড় একটা কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গ্রীক দাস-মালিকদের ইহাতে কিছুই আপত্তি ছিল না; বরং তাহারা মেসিডোনিয়ার শাসনে সন্তুষ্টই ছিল। কেননা, তাহারা ভাবিত মেসিডোনিয়ার রাজারা বিদ্রোহীদের দমাইয়া তাহাদের স্বার্থ নিরাপদ করিয়াছে। গ্রীস ছাড়িয়া অসন্তুষ্ট জনগণের অনেকেই প্রাচ্যের গ্রীক সাম্রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রেণী সংঘর্ষের বিরাম হয় নাই। তখনও গ্রীসে বহু বেকার, বহু জমিহীন কৃষক ছিল। দাসদের প্রতিযোগিতা, সুদখোরের অত্যাচার আগের মতই চলিতে থাকে; তাই বিদ্রোহ কখনও থামে নাই। মাঝে মাঝে আবার দাসেরাও বিদ্রোহ করিত।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে মেসিডোনীয় শাসকেরা অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িলে বিপ্লবী আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়, সফলও হয়। গ্রীসের অনেক রাষ্ট্রেই বিদ্রোহীরা ভূস্বামীদের জমি দখল করে, দেশ হইতে তাহাদের বহিষ্কার করে। গ্রীসের দাস মালিকেরা অনন্যোপায় হইয়া রোমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমতীরে তখন রোমান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমানরা গ্রীস, মেসিডোনিয়া এবং প্রাচ্যের গ্রীকরাজ্যগুলি দখল করিয়া দাসত্বের ভিত্তির উপর নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে।

রোমান রাষ্ট্রের উত্থান

(১)

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে রোমানরা গ্রীস এবং গ্রীক সাম্রাজ্য দখল করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে তাহারা সারা ইটালি এবং ইটালির পশ্চিম-দিককার ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশগুলি জয় করে। ল্যাটিনদের একটি ক্ষুদ্র জাতি হইতেই এত বড় সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিকাশ হয়; মধ্য ইটালির ল্যাটিয়ামে রোম ছিল ইহাদের প্রধান শহর।

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতক হইতেই রোমানদের কথা জানা যায়। কিন্তু তখন রোমানরা ছিল দুর্বল এবং দরিদ্র জাতি। সেদিনের ইটালির সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতি ছিল ইট্রুরিয়ানরা। ইহারা ছিল বণিকের জাতি; বাণিজ্য করিত অভিজাতেরা এবং রাজা স্বয়ং। ইটালির পাহাড়গুলিতে আরও কতক-গুলি জাতির বাস ছিল; কৃষিই তাহাদের প্রধান উৎপাদন; তাহাদের উপর তখনও মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের ছাপ ছিল।

খৃঃ পূঃ অষ্টমশতকে ইটালির জাতিগুলির মধ্যে আদিম সমাজকাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বেশীর ভাগ জমিই তখন অভিজাতদের দখলে; ল্যাটিনেরা অভিজাতদের বলিত পেট্রিসিয়ান। কৃষকদের জমি খুবই ক্ষুদ্র। অতএব, কৃষকদের মধ্যে দারিদ্র ও অভাব দেখা দেয়। কিছু কিছু জমি থাকিত সাধারণ সম্পত্তি। এই যৌথ সম্পত্তি হইতে কৃষকেরা ইচ্ছা করিলে কিছু অংশ লইতে পারিত। কিন্তু যাহাদের হাল, গরু, বীজ নাই—তাহাদের পক্ষে যৌথ সম্পত্তির জমি লইয়া লাভ হয় না কিছুই। সুতরাং অভাবগ্রস্ত কৃষক সহজেই ঋণের জালে জড়াইয়া পড়িত।

দেউলিয়া কৃষকের অন্য উপায় ছিল না। তাহাকে ত্রিশদিনের সময় দেওয়া হইত। ত্রিশদিন পার হইলেই পাওনাদার তাহাকে বাজারে লইয়া যাইত। পাওনাদার সাধারণত অভিজাতই। সেখানে পাওনাদারের পক্ষ হইতে ডাকিয়া বলা হইত—দেনাদার কৃষকের ঋণ শোধ করিতে কেহ প্রস্তুত কিনা। তিনবার এইভাবে বলা হইত; দেনাদারের পক্ষ হইতে কেহ অগ্রসর না হইলে, তাহাকে হয় বধ করা হইত, নয়ত দাস-রূপে কাহারো নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইত। কোন ধনীব্যক্তি কৃষকের ঋণ শোধ করিয়া দিলে, কৃষক

নিজে তো তাহার দাস হইতই; তাহা ছাড়া কৃষকের বংশধরদেরও পুরুষানু-ক্রমে এই ধনীব্যক্তির আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া থাকিতে হইত।

অভিজাত পেট্রিসিয়ানদের দাসের অভাব হইত না। যৌথসম্পত্তির জমি দখল করিয়া তাহারা বড় আকারে কৃষি করিত। দাসশ্রমদ্বারা অভিজাতেরা মদ এবং লবণ তৈয়ার করাইত। উৎপাদনের বাড়্তি অংশ বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইত। পেট্রিসিয়ানরাই প্রথম দাসব্যবসায়ী।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকের শেষের দিকে ল্যাটিনজাতিগুলির মধ্যে শ্রেণী-সমাজ গড়িয়া উঠে। গ্রীকদের মতই পৃথক পৃথক শহরকে কেন্দ্র করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে রোমানজাতি এবং রোমান রাষ্ট্রই প্রধান এবং প্রভাবশালী।

ইটালির পশ্চিম দিকটাতে টাইবার নদীর তীরে মোহনা হইতে ২০ মাইল দূরে রোম নগর। ইট্রুস্কান বণিকেরা রোমের বাজার দিয়াই সমুদ্র পথে তাহাদের মাল বিদেশে চালান দিত; কার্থেজ এবং সিসিলির বণিকেরাও রোমেই তাহাদের মাল লইয়া আসিত। ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে রোমের বাণিজ্য এত প্রসার লাভ করে যে রোমানেরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সন্ধি পর্যন্ত স্থাপন করে।

প্রথমটায় রোমের শাসক ছিল রাজা; কিন্তু ইতিহাস সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিতে পারে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে রোমের রাজারা ব্যাবিলোন, মিশর কিংবা পারস্যের রাজাদের মত নিয়মিত রাজা ছিল না। সম্ভবত রোমের রাজা ছিল গ্রীসের বেসিলিয়াসেরই মত, যুদ্ধের সময়ে তাহার থাকিত অসীম ক্ষমতা, শান্তির সময়ে অবশ্য শাসনকার্য সিনেটের নির্দেশ অনুসারেই চলিত। সিনেট অভিজাতদের পরিষদ; অভিজাতদের ছেলেরা উত্তরাধিকারসূত্রে উহার সদস্য হইত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে রোমানরা রাজার পদ উঠাইয়া দেয়; সিনেট এখন হইতে একজনের পরিবর্তে দুইজন শাসক বা সেনাপতি নিযুক্ত করিতে থাকে। উহাদের বলা হইত কন্সাল। কন্সালরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন; সিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারেই তাহাদের চলিতে হয়। এইভাবে একটা অভিজাত-প্রধান রাষ্ট্রের পত্তন হয় রোমে। সমস্ত ক্ষমতা অভিজাততন্ত্রের—জমি, ধন, দাস প্রভৃতির মালিক অভিজাত; ব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া।

পেট্রিসিয়ানেরা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়িয়া তোলে; শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলেরই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না; সৈন্যসংগ্রহ করা হইত শুধুমাত্র ধনী উচ্চশ্রেণী হইতে যাহারা নিজেদের ব্যয় নিজেরাই বহন করিতে সমর্থ। সৈন্যরা নিজেরাই তাহাদের সেনাপতি নির্বাচন করিত; একশ' সৈন্যের একটা দলের থাকিত এক ভোট। যাহাই

হউক, অভিজাতেরা এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল যে অভিজাত ছাড়া অন্য কেহ সেনাপতি নির্বাচিত হইতে পারিত না।

পেট্রিসিয়ানরা কিভাবে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিত এঙ্গেলস্ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন : 'যাহারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিবে সম্পত্তির ভিত্তিতে তাহাদের পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) ১০০,০০০ এসেস্, (২) ৭৫,০০০ এসেস্, (৩) ৫০,০০০ এসেস্, (৪) ২৫,০০০ এসেস্, (৫) ১১,০০০ এসেস্। যাহাদের সম্পত্তি পঞ্চমশ্রেণী অপেক্ষাও কম, তাহারা প্রলিটেরিয়ান; সৈনিকবৃত্তি হইতে তাহারা বাদ। সিনেটে নাগরিকেরা সেনাবাহিনীর রূপে একশতজনের এক একটি দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক একশ'র এক ভোট, প্রথম শ্রেণীর আশীটি শতক*, দ্বিতীয়টির বাইশটি, তৃতীয়টির কুড়িটি, চতুর্থটির বাইশটি, পঞ্চমটির ত্রিশটি, এসকল ছাড়াও থাকে সকলের চেয়ে ধনীব্যক্তিদের একটি অশ্বারোহী বাহিনী; উহার আঠারটি শতক। মোট শতক ১৯৩; নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ৯৭ ভোট; কিন্তু প্রথমশ্রেণী এবং অশ্বারোহী বাহিনীর একত্র ভোট আটা-নব্বই। সুতরাং ইহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহারা নিজেদের মধ্যে একমত হইলে আর অন্যদের জিজ্ঞাসা করিত না; নিজেরাই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিত এবং ইহাই চূড়ান্ত।'

সেনাবাহিনী সবরকমে অভিজাতদের কর্তৃত্বাধীন; এই সেনাবাহিনীর সহায়তায়ই রোম-রিপাব্লিক সমস্ত লাটিন জাতিগুলিকে পদানত করে।

খৃঃ পূঃ পঞ্চমশতকে রোমে শ্রেণীবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। অভিজাতের পাশে কৃষক; কৃষক হয় জমিহীন, নয়ত তাহার জমি এত ক্ষুদ্র যে পরিবারের ভরণপোষণের পক্ষে তাহা অত্যল্প। এইসব গরীব কৃষকদের রোমে বলা হইত প্রলিটেরিয়ান' অভিজাতদের ইহারা দেনাদার। ধনীব্যক্তিরা আশ্রয় না দিলে দাসরূপে ইহাদের বিদেশীর নিকট বিক্রয় করা হইত।

জমিহীন দেনাদার কৃষকের পাশে ছিল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিহীন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের চলিতে হইত অভিজাতের আজ্ঞাধীনে। সুতরাং পেট্রিসিয়ানের বিরুদ্ধে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা জোট বাঁধিত। রোমে সাধারণ লোককে বলা হইত প্লেব্ বা প্লিবিয়ান্। প্লিবিয়ানশ্রেণীর সকল দলই অভিজাতদের শাসনের সংস্কার চাহিত। এই কারণেই তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া অনেক সময় পেট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের শ্রেণীসংঘর্ষকে রোমে বলা হইত পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানের সংঘর্ষ। দুইশ' বছর ব্যাপিয়া এই সংঘর্ষ চলে; কিন্তু রোমে গ্রীক রাষ্ট্রের

---

* Centuries

মত গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অভিজাত-প্রধান সিনেটের শাসনই থাকিয়া যায়। পেট্রিসিয়ানরা প্লিবিয়ানদের কিছু কিছু সুবিধা দিয়া অসন্তোষ দূর করিতে চেষ্টা করে। প্লিবিয়ানেরা নিজেদের পরিষদ গঠনের অধিকার লাভ করে। এই পরিষদকে বলা হয় ট্রাইবিউনেল; গ্রামের ও শহরের প্লিবিয়ানেরা উহাতে সদস্য নির্বাচন করে; সদস্যদের বলা হয় ট্রিবিউন। ট্রিবিউনদের মধ্যস্থতায়ই সিনেটের সঙ্গে প্লিবিয়ানদের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়; ইহারাই সিনেটে তাহাদের দাবিগুলি উপস্থিত করে। আদালতে প্লিবিয়ানের পক্ষ সমর্থনও করে ট্রিবিউনেরাই। খৃঃ পূঃ ৩৫২'র দিকে ঋণ বাতিল করা হয়; ঋণ আদায়ের জন্য দাস বিক্রয়ের রীতিটিও উঠাইয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল সংঘর্ষের পর ঠিক হয়, একজন কন্সাল পেট্রিশিয়ানদের মধ্য হইতে, অপর জন প্লিবিয়ানদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। এসমস্ত ব্যবস্থায় কৃষকদের কোন সুবিধা হয় নাই। জমির সমস্যা কিছুটা মিটমাট হয় দেশ জয় দ্বারা; বিজিত দেশগুলিতে কৃষকদের উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

রোম ইটালি জয়ের অভিযান সুরু করে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর প্রথম রোমানরা জয় করে ইট্রুরিয়া। কিন্তু ইট্রুরিয়া জয় দ্বারা কৃষির দিক হইতে রোমের কিছুই সুবিধা হয় নাই। জমি অনুর্বর, তদুপরি ঘনবসতি। কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পের দিক হইতে রোম লাভবান নয়; কেননা ইট্রুরিয়া খনিবহুল দেশ। রোমের সেনাবাহিনীর জন্য এখন যথেষ্ট লোহার অস্ত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। তারপর হয় সেমনাইটদের সঙ্গে যুদ্ধ; দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এই যুদ্ধ চলে। সেমনাইটরা পাহাড়িয়া জাতি। সেম্নিয়া ও কেম্পেগনিয়া তৃতীয় শতকে রোমের দখলে আসে। পঁচিশ বছরের মধ্যে দক্ষিণ ইটালির গ্রীক শহরগুলিও রোমানরা দখল করে। খৃঃ পূঃ ২৬৬'র দিকে সমগ্র ইটালি রোমানরাজ্যে পরিণত হয়। রোমানদের সামরিক দক্ষতার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। বিজয়ী রোমানদের হাতে এখন জমি, খনি, জঙ্গল; ইহারা ধাতু, লবণ, কাঠ প্রভৃতি প্রচুর সম্পদের অধিকারী। বিজিত দেশগুলিতে রোমানদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। পদানত জাতি-গুলির উপর নানারকম কর চাপানো হয়।

রোমানরা এই সকল যুদ্ধে বহু যুদ্ধবন্দী ধরিয়া আনে। এই যুদ্ধ-বন্দীরা রোমানদের দাস; বিজিত দেশগুলি হইতে ইহাদের রোমে চালান দেওয়া হয়। দাসদের একটা অংশ রাষ্ট্রের সম্পত্তি—ইহাদের খনিতে খাটানো হয়; অট্টালিকা—মন্দির—রাস্তাঘাট তৈয়ারীর কাজেও নিয়োগ করা হয়। অপর অংশ নীলামে উঠাইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। পেট্রিসিয়ান এবং ধনী প্লিবিয়ানরা ইহাদের ক্রয় করে। ধনী ব্যক্তিরা দাস ক্রয় করিয়া চাষের

কাজে, ব্যবসায়ে এবং গৃহকার্যে তাহাদের খাটায়। এখন হইতে দাসত্বের ভিত্তির উপর উৎপাদনের কাজ চলিতে থাকে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রোমের উৎপাদনের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায় দাস-শ্রম নিয়োগ।

ভূ-মধ্যসাগরের পশ্চিম অঞ্চলে কার্থেজের বণিকেরা বাণিজ্য করিত। কার্থেজ একটি ফিনিসীয় নগর। আফ্রিকা ও স্পেনের সমুদ্রতীরবর্তী ফিনিসীয় উপনিবেশগুলি কার্থেজের অধীনে। কার্থেজিয়ানরা কোর্সিকা, সার্ডিনিয়া ও সিসিলির পশ্চিম অংশও দখল করে। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে কার্থেজ বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায়।

কার্থেজিয়ানরা রোমের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখিয়া চলিত। কিন্তু রোমানরা যখন একটির পর একটি গ্রীক রাষ্ট্র দখল করিতে থাকে, তখন তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। কার্থেজিয়ানরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। রোমানরা টেরেণ্ট আক্রমণ করিলে কার্থেজ আক্রান্ত-রাষ্ট্রের সহায়তায় একটি নৌবহর পাঠায়। খৃঃ পূঃ ২৬৪ সনে কার্থেজ এবং রোমের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হয়। এই যুদ্ধ সুদীর্ঘ ষাট বছর চলে। রোমানরা এই যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ বলিত; কেননা রোম সহরে কার্থেজের অধিবাসীকে বলা হইত 'পিউন্।' রোম ও কার্থেজের মধ্যে দুইবার তীব্র সংগ্রাম হয়; দুইবারই রোমানরা জয়লাভ করে। এই যুদ্ধের ফলে কার্থেজ এবং ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলেব পশ্চিমের দেশগুলি রোমের পদানত হয়।

কার্থেজিয়ানরা মনে করে যে রোমানরা সিসিলি দখল করিতে অগ্রসর হইবে—সিসিলিতে প্রচুর গম উৎপাদন হয়। কার্থেজিয়ানরা অগ্রণী হইয়া সিসিলির প্রধান শহর মেসিনিয়া ও সিরাকিউজে সৈন্য পাঠায়। রোমানেরাও অগ্রসর হইতে থাকে; পরিশেষে কুড়ি বছরের যুদ্ধের পর কার্থেজ-বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। উভয় পক্ষের সন্ধি হয়; সন্ধির শর্ত অনুসারে সার্ডিনিয়া ও সিসিলি রোমের অধিকারভুক্ত হয়; কার্থেজ বহু টাকা ক্ষতি-পূরণ দেয়; তাহা ছাড়া রোমানরা প্রায় কুড়ি হাজার দাস লইয়া দেশে ফিরে।

কিন্তু কার্থেজিয়ানরা দমে নাই; তাহারা নূতন উদ্যমে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। স্থলপথে রোম আক্রমণের একটা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা লওয়া হয়। এই পরিকল্পনা রচনা করেন হানিবল; পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি সামরিক প্রতিভার জন্য অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হানিবল স্পেন দখল করেন এবং একলক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া পিরানিজ পর্বতের পথে ইটালি অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। উত্তর দিক হইতে কোন বিপদ আসিতে পারে রোমানরা তাহা মোটেই আশঙ্কা করে নাই। তাই সেই দিকটা একরকম অরক্ষিতই ছিল। হানিবল ক্রমান্বয়ে

তিনটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। রোমের পথ এখন উন্মুক্ত। কিন্তু তিনি সোজা রোমে না গিয়া ইটালির পূর্ব-সীমান্তের এপিনাইনে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন জাতিগুলিকে ইটালির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেন। রোম আক্রমণের জন্য তিনি স্বদেশে আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠান। হানিবল চতুর্থবার রোমানদের পরাজিত করেন। কার্থেজের বণিক-শাসকেরা যদি হানিবলের সহায়তার জন্য আরও সৈন্য পাঠাইত, তবে এক বৎসরের মধ্যেই রোম কার্থেজবাহিনীর দখলে আসিয়া পড়িত। কিন্তু ইহারা আশংকা করে যে হানিবল রোম জয় করিয়া স্বয়ং কার্থেজের রাজা হইয়া বসিতে পারেন। এদিকে রোমের প্রতিভাশালী সেনাপতি সিপিয়ো নূতন বাহিনী গঠন করিয়া সিসিলির বিদ্রোহীদের দমন করেন এবং পরে স্পেন জয় করিয়া বিনা-বাধায় আফ্রিকায় উপস্থিত হন। আফ্রিকা হইতে তিনি কার্থেজ অভিমুখে অভিযান সুরু করেন। কার্থেজিয়ানরা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। কার্থেজ রোমের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

ইহার পর গ্রীকরাষ্ট্রগুলি একটির পর একটি রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমের আর এখন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সারা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোম প্রাধান্য বিস্তার করে; দাসত্বের ভিত্তির উপরে বিরাট রোমান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

(২)

যে-সব প্রদেশ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেখানকার ভাল জমি, জঙ্গল ও খনি রোমরাষ্ট্র নিজের হাতে রাখে। রাষ্ট্র যে কোন সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিত। ইটালীয়ানদের কোন রকম স্থায়ী কর দিতে হইত না; বিজিত দেশের লোকেদের উপর কর চালাইয়া তাহা পুরাইয়া লওয়া হইত। রোমান এবং ইটালীয়ানদের জন্য ছিল আইনের শাসন; কিন্তু বিজিতদেশে আইনের বালাই কিছুই ছিল না; স্বেচ্ছাচারী শাসকের ইচ্ছাই ছিল আইন। শাসককে বলা হইত প্রোকনসাল। প্রজার ধন-সম্পত্তির উপর তাহার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাহার নিজের এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের সবরকম খরচ প্রজার বহন করিতে হইত। প্রদেশগুলি হইতে শাসকেরা দাস সংগ্রহ করিয়া রোমে পাঠাইত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এক গ্রীস হইতেই সংগ্রহ করা হয় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার দাস।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় এবং প্রথম শতকে শুধু রোমেই নয়, সারা ইটালিতে দাস-শ্রমের নিয়োগ ব্যাপক আকার ধারণ করে। দাসদের খাটানো হইত বেশীর

ভাগই জমি এবং খনিতে। রোমানরা দাসদের শিল্পে বড় একটা খাটাইত না। গ্রীসের কারখানাগুলি হইতেই তাহারা শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিত। দাসদের তাহারা এমন সব উৎপাদনে খাটাইত যাহা হইতে সহজে এবং শীঘ্র মুনাফা পাওয়া যায়, ব্যবসায় এবং কৃষিতেই তাহারা দাস খাটাইত বেশী।

সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠার পর হইতেই রোমে বড় বড় কৃষি প্রতিষ্ঠান দেখা দেয়। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়। কার্থেজ যুদ্ধের পর সিসিলি দখল হইলে কৃষকের নূতন একটা বিপদ দেখা দেয়। সিসিলির কৃষকদের প্রায় বিনামূল্যেই রোমে গম পাঠাইতে হইত। বড়লোকেরা এখন এই সব গমই অল্পমূল্যে কিনিয়া ব্যবহার করিতে থাকে। কিন্তু কৃষককে কিনিতে হইত বেশী দরে। ইটালিতে কৃষির কাজ প্রায় বন্ধই হইয়া যায়। ছোট কৃষকেরা তাহাদের জমি ছাড়িতে বাধ্য হয়।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ইটালিতে হাজার হাজার বিঘার বড় বড় কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহাদের বলা হয় লাটিফানডিয়া। এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিক সিনেটের সভ্য দাস-মনিব অভিজাতেরা। লাটিফানডিয়ায় একমাত্র দাস-শ্রমিকই নিয়োগ করা হইত। কয়েকশ' হইতে কয়েক হাজার শ্রমিক এক একটি লাটিফানডিয়ায় খাটিত। পরিদর্শকের অধীনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দাসেরা কাজ করিত। কোন রকমে ত্রুটি দেখিলেই পরিদর্শকেরা দাসদের কঠোর শাস্তি দিত। অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিলে, অনেক দাসই পালাইতে চেষ্টা করিত; তাই অনেক দাসমনিব রাত্রিতে দাসদের ব্যারাকে আটকাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিত। মনিবেরা বলিত, দাসদের চামড়া গাধার চামড়ার চেয়ে শক্ত; সুতরাং উহাদের আরও শক্ত বেতমারা দরকার। পলাতক দাসদের কখনো কখনো আগুনে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইত। লোহা পুড়াইয়া গায়ে দাগ দেওয়া একটা সাধারণ রীতি ছিল।

কৃষির চেয়ে খনির কাজে দাসদের শোষণ করা হইত আরও বেশী। প্রতিদিন দাসকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ দেখাইতে হইত; যদি কম কাজ দেখাইত তবে তাহাকে বেত মারার নিয়ম ছিল। খনির কাজ এতই শক্ত ছিল যে গৃহকার্যে অথবা কৃষিতে যে সব দাস থাকিত তাহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য খনিতে পাঠানো হইত।

শ্রমিকদের যে শুধু খনির ইজারাদার এবং জমির মালিকেরাই শোষণ করিত তাহা নয়,—যাহাদের নিজেদের জমি কিংবা খনি নাই এমন সব দালালেরাও শোষণ করিত। হয়ত একটা লাটিফানডিয়ার ফসল তোলার সময় হইয়াছে; অল্প সময়ের মধ্যে ফসল উঠানোর কাজ শেষ করিতে হইবে। অনেক দাস একসঙ্গে খাটানো প্রয়োজন। দালালেরা ভূস্বামীর সঙ্গে দাস সরবরাহ

করার চুক্তি করিত। ফসলের এক পঞ্চমাংশ মাত্র ভূস্বামী পাইত; বাকী অংশ আত্মসাত করিত দালাল।

রোমে যাহারা রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করিত তাহাদের বলা হইত 'নোবিলিস্'। অভিজাতদের মধ্যে যাহারা উপরের স্তরের তাহারাই 'নোবিলিস্'। ইহাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় ভূস্বামীরাই হইত কনসাল্ বা রাষ্ট্রের কর্ণধার।

সর্বস্বান্ত কৃষকেরা 'নোবিলিস্'-এর এই বিশেষ অধিকার কখনও ভাল চক্ষে দেখিত না। এই সম্ভ্রান্তশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ও সাহায্য দিয়া ইহাদের হাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। ট্রিবিউনের ক্ষমতা কিছুটা বাড়াইয়া দিয়াও তাহাদের খুশী করার চেষ্টা হয়। মাঝে মাঝে শাসকশ্রেণী প্রদেশগুলিতে লুঠের অভিযান চালাইত। লুঠের মালদ্বারা কৃষকদের প্রলুব্ধ করা হইত। যাহা হউক, বেকার সমস্যা কোন কিছুতেই দূর করা সম্ভব হয় নাই। বেকারেরা দলে দলে শহরে আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। শাসকেরা ইহাদের অনেকেরই আহারের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইত। কনসাল্ নির্বাচনের সময় ইহারা বহু অর্থ খরচ করিত; বেকার কৃষকদের ভুরিভোজনে তৃপ্ত করিত। কনসাল্ নির্বাচনে অনেক প্রার্থী ভোট হাত করার জন্য সর্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিত। তাহারা জানে কন্সাল নির্বাচিত হইতে পারিলে এক বৎসর পরই তাহারা প্রোকনসাল হইয়া প্রদেশগুলি শাসন করিতে যাইবে। সেখানে তাহারা প্রজার ধনদৌলত লুঠের অবাধ স্বাধীনতা পাইবে। সর্বহারাদের মন ভুলানোর জন্য আরও একটি ফন্দী ছিল খেলাধুলা। সার্কাসে দাস আর হিংস্র পশুর খেলা দেখানো হইত। এইরকম যোদ্ধা দাসকে বলা হইত 'গ্লেডিয়েটর'। এই নিষ্ঠুর খেলায় হয় পশু নিহত হইত, নয়ত গ্লেডিয়েটর প্রাণ হারাইত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে এই সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা বেকার কৃষককে প্রলুব্ধ করিতে এবং শান্ত রাখিতে চেষ্টা করা হয়।

বেকারদের শান্ত করিতে সমর্থ হইলেও দাস মালিকেরা দাসদের দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই। সশস্ত্র রক্ষী প্রহরীর দ্বারা পাহারা, শিকল পরাইয়া কয়েদখানাতুল্য ব্যারাকে আটকাইয়া রাখা—কোন কিছুতেই দাসদের ঠেকানো সম্ভব হয় নাই। এত নির্মম ছিল তাহাদের উপর শোষণ যে তাহাদের সহ্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই দাসবিদ্রোহ সুতীব্র হইয়া উঠে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট বিদ্রোহ দেখা দেয়। দাস-মালিকেরা সহজেই তাহা দাবাইতে সমর্থ হয়। খৃঃ পূঃ ১৪৮ সন হইতেই বিদ্রোহ ব্যাপক এবং ভীষণ আকার ধারণ করে। রোমে কয়েকশ' বিদ্রোহীর প্রাণ লওয়া হয়। এটিকার রৌপ্যখনির দাসেরা বিদ্রোহ করে; ডিলবোয় শহরে যখন দাসদের বিক্রয়ের জন্য আনা হয়, তখন

তাহারাও বিদ্রোহ করে। শহর প্রায় দাসদের দখলে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। এসিয়া মাইনর, সিসিলি সর্বত্রই রোমান শাসকেরা দাসদের বিদ্রোহ দমাইতে গিয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়।

এসিয়ামাইনরের কোন একটি লাটিফানডিয়ার দাসবিদ্রোহীরা সেখানকার কয়েকটি শহর অধিকার করে; এবং নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রও গঠন করে। দাসেরা এরিষ্টনিক নামে এক ব্যক্তিকে নেতা-রূপে পায়। উহার ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা; এরিষ্টনিক মেসিডোন রাজপরিবারের লোক। দাস-বিদ্রোহীদের বাহিনী গঠন করিয়া এরিষ্টনিক রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। রাজা হওয়াই ছিল তাহার উচ্চাভিলাষ। প্রথমটায় রোমান কনসাল পরাজিত হয়; যাহা হউক অত্যন্ত নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়। বহু দাস হতাহত হয়; অনেক দাসকেই পুরাতন মনিবদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সিসিলিতে বিদ্রোহ আট বছর চলে। রোমান বিজয়ের পর অনেক গ্রীক সৈন্য এবং সামরিক কর্মচারী দাসের জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়; ইহাদের নেতৃত্বে সত্তর হাজার দাসের একটা বিরাট বাহিনী গড়িয়া উঠে। সমগ্র সিসিলি ইহারা অধিকার করে। কিন্তু বেশীদিন তাহা হাতে রাখিতে পারে নাই। এই যুদ্ধে কুড়ি হাজার দাসবন্দীকে রোমানরা বধ করে।

এইসব বিরামহীন আভ্যন্তরিক বিদ্রোহে রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে; ধীরে ধীরে উহার চূড়ান্ত পতনের পথ পরিষ্কার হইতে থাকে।

রোমান দাসমালিকেরা গ্রীকদের মতই দাসকে মানুষ মনে করিত না। এ সম্পর্কে তাহাদের মত সহজ, সরল। কোনরূপ দার্শনিক তত্ত্ব রচনার চেষ্টা তাহারা করে নাই। উৎপাদনের জন্য মানুষ তিন রকমের যন্ত্র ব্যবহার করে; দাস উহাদেরই একটি। দাস ছাড়া আর দুইরকমের যন্ত্র পশু এবং জড় বস্তু। কোন একটি যন্ত্রে যখন কাজ হয় না, তখন তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। দাসও যখন কাজ করিতে অক্ষম হয়, তখন উহাকে পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

দাসদের বিবাহিত পারিবারিক জীবন-যাপন করিতে দেওয়া হইত না। দাস প্রথার বিরুদ্ধে কোন রোমান দার্শনিকই প্রতিবাদ জানান নাই। গ্রীক দাসদের মধ্য হইতে দার্শনিক সেনেকা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেন;—তাঁহার মতে দাস অন্যান্যদের মতই মানুষ; নিজেদের স্বার্থের দিক হইতেই দাসকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া দাস মালিকের উচিত। তিনি দাসমালিকদের স্মরণ করাইয়া দেন, 'যত দাস তত শত্রু'। অবশ্য সেনেকাও বেশীদূর অগ্রসর হন নাই; তিনি দাসপ্রথা বিলোপের কথা বলেন নাই।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন

(১)

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ইটালির কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। রোম এবং অন্যান্য বড় সহরগুলিতে সর্বহারার দল ভিড় করিতে থাকে। উহাদের মনে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা; কৃষকেরা প্রচার করিতে থাকে পশুপাখীর জায়গা আছে, কিন্তু তাহাদের কোথাও ঠাঁই নাই। অথচ রোমের জন্য পৃথিবী জয় করিতে রক্ত ঢালিয়াছে তাহারাই। বিদ্রোহ অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। দাসমালিকদের উভয়-সঙ্কট। সিসিলিতে দাসদের বিদ্রোহ তখনও থামে নাই; অথচ সর্বহারাদের বিদ্রোহ আসন্ন।

এদিকে দাসমালিকদের নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে মিল নাই। বিরোধ বাঁধিয়াছে ভূস্বামী মালিকদের সঙ্গে ব্যবসায়ী, তহশীলদার ও সুদখোরদের। ইহারা যথেষ্ট ধন ও দাসের মালিক—কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদগুলি হইতে বঞ্চিত। নাগরিকদের তালিকায় ইহাদের লেখা হইয়াছে 'ঘোড়-সওয়ার'* ভূস্বামী নয়। প্রকাশ্যে ইহারা ভূস্বামী অভিজাতদের শাসনের বিরুদ্ধে বলিতে থাকে।

বিজিত প্রদেশগুলিতে প্রোকনসালদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। লুঠের পর প্রজারা সর্বস্বান্ত হইয়া যায়, তাহাদের হাতে কিছুই থাকে না। তাই ব্যবসায়ীদের মাল বাজারে বিক্রয় না হইয়া অমনি পড়িয়া থাকে। 'ঘোড়-সওয়ার' নাগরিকেরা এখন কনসাল পদের দাবি করিতে থাকে। তবেই তাহারা নিজেরা লুঠের সরিক হইতে পারিবে।

অভিজাত শাসকেরা জনগণের অসন্তোষ দেখিয়া প্রোকনসালদের বিচারের জন্য কমিশন নিযুক্ত করে। কিন্তু অভিজাত ছাড়া অন্য কেহ কমিশনের সদস্য হইতে পারে না। অভিজাত ও 'ঘোড়-সওয়ার'দের মধ্যে বিরোধ থাকায় ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সর্বহারার দলের রুটির সংগ্রামের সুবিধা হয়। একশ' বছর ব্যাপিয়া এই সংঘর্ষ চলে; গৃহযুদ্ধ ও শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে দাসত্বের ভিত্তির উপর খাড়া রোম রিপাব্লিকের পতন হয়।

* Horsemen

শাসকেরা সর্বহারাদের ব্যাপারে এতটা চিন্তিত হয় নাই; তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে অপর একটা ব্যাপারে। রোমের সেনাবাহিনীতে সৈনিক অধিকাংশই কৃষক-শ্রেণীর, কিন্তু এখন আর সেনাবাহিনীর জন্য কৃষকদের মধ্য হইতে সৈন্য পাওয়া যায় না। শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছাড়া দাস এবং বিজিত দেশের প্রজাদের বশে রাখা কঠিন। অভিজাতেরা বুঝিত যে কৃষককে আবার হাতে পাওয়া যায় যদি তাহাদের জমি ফিরাইয়া দেওয়ার কোনরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু ভূস্বামীরা একবার যে জমি দখল করিয়াছে তাহা কি সহজে হাত ছাড়া করিবে?

ব্যবসায়ী, সুদখোর প্রভৃতি 'ঘোড়-সওয়ারেরা' আগাইয়া আসে। টাইবেরিয়াস্ গ্রেকাস্ নামে একজন অভিজাতের সংগে ইহারা একটা চুক্তি করে। টাইবেরিয়াস অভিজাত হইলেও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার স্থান হয় নাই। তিনি উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি, তাই 'ঘোড়-সওয়ার'দের সংগে যোগ দেন। ইহাদের সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। খৃঃ পূঃ ১৩৩ সনে টাইবেরিয়াস্ গ্রেকাস্ জনসাধারণের ট্রিবিউন নিযুক্ত হন। তিনি গণপরিষদে কতকগুলি সংস্কারমূলক আইনের প্রস্তাব করেন। তাহার প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে প্রধান,—সর্বহারাদের জমি দেওয়া এবং প্রোকনসালদের বিচার।

গোড়ার দিকে রোমের আইন ছিল,—যৌথভূমি হইতে কেহই ১২৫ হেক্টেয়রের বেশী জমি নিজের দখলে লইতে পারিবে না। কিন্তু ভূস্বামীরা কখনও এই আইন মানিয়া চলা দরকার মনে করে নাই। টাইবেরিয়াস্ প্রস্তাব করেন,—১২৫ হেক্টেয়রের বেশী জমি যাহারা আত্মসাত করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এই বেশী অংশ ফিরাইয়া লইয়া সর্বহারা কৃষকদের মধ্যে তাহা বাঁটিয়া দিতে হইবে। প্রোকনসালদের অত্যাচার সম্পর্কে আনীত অভিযোগগুলির বিচারের জন্য সিনেটের নিযুক্ত কমিশনে 'ঘোড়-সওয়ার'দের সমানসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়া তিনি অপর একটি প্রস্তাব করেন।

শাসক-অভিজাতেরা টাইবেরিয়াসের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না। তাহারা টাইবেরিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে এবং অবশেষে তাহাকে নিহত করে। তাহার মৃত্যুর পরে ভূমিসংক্রান্ত আইনগুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সিনেট একটি কমিশন নিযুক্ত করে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শাসকেরা কোনরকম সংস্কারেরই পক্ষপাতী নয়। ফলে শ্রেণী সংঘর্ষ তীব্রতর হয়।

টাইবেরিয়াস্ গ্রেকাসের মৃত্যুর দশ বছর পর তাহার ভাই গেইয়াস্ অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এই ব্যক্তি ভাইয়ের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও দৃঢ়চেতা। রোমের সর্বহারাদের হাত করিয়া একচ্ছত্র শাসক

হওয়াই তাহার মতলব। এদিকে ঘোড়-সওয়ারদের সমর্থনও তিনি লাভ করেন।

খৃঃ পূঃ ১২১ সনে গেইয়াস্ ট্রিবিউন নির্বাচিত হইয়াই প্রস্তাব করেন যে ট্রাইবিউনেল বা গণপরিষদের সিদ্ধান্তই চরম; সিনেটের সম্মতি ছাড়াই গণপরিষদের সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হইতে পারে। প্রোকনসালের বিচার সম্পর্কে কমিশন বাতিল করিয়া তিনি নূতন আদালতের প্রতিষ্ঠা করেন; উহাতে 'ঘোড়-সওয়ার'দের প্রতিনিধিই বেশী। সর্বহারা কৃষক এসব বিষয় লইয়া বেশী মাথা ঘামাইতে চায় না; রুটি ও জমির সমস্যা মিটিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। গেইয়াস্ প্রায় বিনামূল্যেই কৃষকদের রুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাহার বড় ভাইয়ের ভূমিসম্পর্কিত আইনগুলি কাজে পরিণত করিতে তিনি উদ্যোগী হন।

এই সব ব্যবস্থায় কৃষকের যথার্থ সমস্যার সমাধান হয় নাই। যে ছিটে ফোঁটা সংস্কার তিনি করেন, তাহাতে দাস-মালিক—ভূস্বামীদের জমির উপর হাত পড়ে নাই। 'ঘোড়-সওয়ার' বণিক সুদখোর ও তহ্শীলদারেরা সিনেটের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় খুসী হয়। এশিয়া মাইনর সবেমাত্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; এই প্রদেশের শাসনভার তিনি বণিক, সুদখোরদের উপর ন্যস্ত করেন; তাহারা এখন অবাধ লুণ্ঠনের সুবিধা পায়। পরের বছর যখন গেইয়াস্ আবার ট্রিবিউন নির্বাচিত হন, তখন তিনি স্বেচ্ছাচারী এক-নায়কের মত চলিতে থাকেন। তাহার সম্মতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা অথবা ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষমতা পাকাপাকি করার জন্য তিনি যত্নবান হন; বণিকেরা তাহার এই চেষ্টায় পুরাপুরি তাহাদের শ্রেণীর সমর্থন দিতে থাকে।

কিন্তু অভিজাতেরাও চুপ করিয়া থাকে নাই। গেইয়াস্ বিদেশীদের রোমান নাগরিকের অধিকার দিতে চান। অভিজাতেরা প্রচার করিতে থাকে এইরূপ ব্যবস্থা রোমের সর্বহারাদের স্বার্থের বিরোধী। গেইয়াসের ব্যবস্থায় বিদেশী সর্বহারাদেরও রুটি যোগাইতে হইবে; তাহাতে স্বদেশীয় সর্বহারাদের অংশ অবশ্য কম পড়িবে। রোমের সর্বহারারা গেইয়াসের ব্যবস্থা মানিতে পারে নাই। তৃতীয়বার নির্বাচনে তাহারা গেইয়াসের বিপক্ষতা করে। গেইয়াস্ তখন জোর করিয়া ক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু অধিকাংশ সর্বহারা তাহাকে সমর্থন না করায় অভিজাতেরা সহজেই তাহাকে পরাজিত করে। সিনেট উহার পুরাতন ক্ষমতা আবার উদ্ধার করে। টাইবেরিয়াসের ভূমি সম্পর্কিত আইন রদ হইয়া যায়। অবশ্য বিনামূল্যে রুটি বিতরণ আগের মতই চলিতে থাকে। সিনেটের কর্তৃত্বাধীন রিপাব্লিক সেবারের মত বাঁচিয়া যায়। কিন্তু রোমের কাহারও আর বুঝিতে বাকী

নাই যে শাসক অভিজাতগোষ্ঠী এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে যে-কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সর্বহারাদের হাত করিয়া সহজেই তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইতে পারে।

গেইয়াস্ গ্রেকাসের পতনের পরই রোম সাম্রাজ্য নূতন সংকটে পড়ে। রোমের শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্পেনের হাঙ্গামা এবং ইটালির দাস-বিদ্রোহ তখনও থামে নাই। তদুপরি,—জার্মান, ডাচ ও স্কেণ্ডিনেভিয়ানরা আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া লোম্বার্ডিতে উপস্থিত হয়। ইহারা নূতন জায়গার সন্ধানে বাহির হইয়াছে; পো-নদীর উর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপনই উহাদের উদ্দেশ্য।

এই রকম গভীর সংকটের সময়ে সিপিয়োর বাহিনীর একজন প্রাক্তন সেনাপতি মেরিয়াস সর্বহারাদের লইয়া একটি নূতন বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন। মেরিয়াস নিজেও ছিলেন একজন কৃষকই; যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখাইয়া তিনি সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করেন। ব্যবসায় করিয়া তিনি বড়লোক হন, এবং বহু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। 'ঘোড়-সওয়ার' দলের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি, উহারা তাহাকে নিজেদের লোকই ভাবিত। 'ঘোড়-সওয়ার'-দের নিকট তিনি প্রমাণ করেন যে সর্বহারাদের লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হইলে তাহাদের শ্রেণীর সুবিধা হইবে। সর্বহারারা যাহাদের নিকট হইতেই কিছুটা সুবিধা পাইবে তাহাদেরই সমর্থন করিবে।

বণিক ও সুদখোরেরা মেরিয়াসকে কনসাল পদে বসায়; তাহার পক্ষে ভোট সংগ্রহ করার জন্য ইহারা বহু অর্থ ব্যয় করে। মেরিয়াস্ তাহার সর্বহারাদের সেনাবাহিনী লইয়া পাঁচ বছরের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করেন এবং জার্মানদের ইটালি হইতে বিতাড়িত করেন। রণাঙ্গন হইতে ফিরিয়া তিনি ষষ্ঠবারের জন্য কনসালপদপ্রার্থী হন। সৈন্যরা তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও বুঝে না, মেরিয়াস্ এবার কনসাল নির্বাচিত হন। মেরিয়াস্ প্রকৃতপক্ষে এখন রোমের এক-নায়ক। শ্রেণী সংগ্রাম নূতন পথে বিকাশ হইতে থাকে; গণপরিষদ এবং সিনেটের মধ্যে এতদিন যে রাজনৈতিক সংগ্রাম চলিতেছিল তাহা প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে।

মেরিয়াস্ তাহার সৈন্যদের প্রত্যেককে স্পেন, আফ্রিকা ও এশিয়ামাইনরের যৌথভূমি হইতে ২৫ হেক্টেয়র জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার পরই তিনি গল (বর্তমান ফ্রান্স) জয় করার প্রস্তাব করেন। সৈন্যরা ভাবিল গলের জমিও তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে 'ঘোড়-সওয়ার'-দের প্রতিনিধি মেরিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল গলের মত সমৃদ্ধশালী দেশ জয় করিয়া বণিকদের অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ করিয়া দেওয়া। অভিজাতেরা দুই প্রস্তাবেই সম্মতি দেয়: লাটিফানডিয়ায় হাত না পড়িলেই তাহারা

আশ্বস্ত। যে-সব সর্বহারা-কৃষক সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় নাই মেরিয়াস্ তাহাদের স্বার্থের দিকে তাকান নাই। ইহাদের সংখ্যাও হাজার হাজার। ইহারা মেরিয়াসকে তাহাদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গ্রেকাস্ গেইয়াসের কানুন বলবৎ করার জন্য তাহারা দাবি করিতে থাকে। গণ-পরিষদের সদস্য ট্রিবিউন সেটারনিনাস্ এইসব কৃষকের নেতৃত্ব করেন। তিনি মেরিয়াসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সেটারনিনাস্ ইটালির সমস্ত প্রলিটেরিয়ানদের রোমে আসিতে আহ্বান জানান। তাহার ডাকে সাড়া দেয় সকলেই। ইহারা কয়েদখানা ভাঙিয়া দাসদের মুক্ত করে, তাহাদের অস্ত্রসজ্জিত করে এবং সিনেট দখল করে। সেটারনিনাস্ এখন রোমের সর্বেসর্বা, নূতন এক-নায়ক।

এই সঙ্কটে অভিজাত এবং বণিকেরা নিজেদের মতভেদও কলহ ভুলিয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়। মেরিয়াসের অধীনে ইহারা নূতন বাহিনী গঠন করে এবং গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। খৃষ্ট জন্মের ঠিক একশ' বছর আগে সেটারনিনাস্ ও মেরিয়াসের বাহিনীদ্বয়ের যুদ্ধ হয় রোম নগরেব প্রধান উদ্যানে। সেটারনিনাসের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং সেটারনিনাস্ নিজে নিহত হন।

কিন্তু অভিজাতদের বিজয় সাময়িক; আরও সত্তর বৎসর গৃহযুদ্ধ চলে। তাহারা নূতন কনসাল নিযুক্ত করিতে থাকে; এই কনসালেরা প্রলিটেরিয়ান বাহিনী গঠন করিয়া ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্মম অত্যাচার চালায়। এই রকমই একজন কনসাল সুল্লা; সুল্লার অধীনে বিরাট প্রলিটেরিয়ান বাহিনী রোমের বাহিরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দমন করিতে যায়। তাহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে মেরিয়াস ইটালির দক্ষিণ অংশের একটি বাহিনী লইয়া রোম অভিমুখে যাত্রা করেন; এই অভিযানে তাহায় সাহচর্য করিয়াছিলেন অপর কনসাল সিন্না। রোম দখল করিয়া তিনি তাহার বিরোধী অভিজাতদের হত্যা করিতে থাকেন। তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ক্রমাগত পাঁচদিন এই হত্যানুষ্ঠান চলে। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তাহার সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়; অন্যান্য ভাল ভাল জমি বণিকেরা নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া লয়।

এইভাবে অভিজাত 'নোবিলিস্'-দের সম্পত্তি 'ঘোড়-সওয়ার'দের হাতে চলিয়া যায়। মেরিয়াসের মৃত্যু হয়। সুল্লা দেশে ফিরিয়া রোম দখল করেন। তিনি মেরিয়াসের সমর্থক এবং অনুচরদের নির্মমভাবে হত্যা করিতে থাকেন; অন্তত ৫০০০ লোক তাহার নির্দেশে নিহত হয়। যে কেহ মেরিয়াসের একজন সমর্থক অথবা সৈন্যকে হত্যা করিতে পারে সেই রাষ্ট্র হইতে অর্থ সাহায্য পায়। জমিরও আবার নূতনভাবে হাত বদল হয়। অভিজাতদের ইহাই শেষ বিজয়। গৃহযুদ্ধ থামে নাই। রোম নামে মাত্র রিপাব্লিক;

সিনেটের কর্তৃত্ব লোপ পাইয়াছে। ইটালির শাসক প্রকৃতপক্ষে কোন একজন এক-নায়ক এবং তাহার সমর্থক বণিক সুদখোরদের দল। যে যখন রোম জয় করিতে পারে, সে-ই হয় এক-নায়ক; তাহাকে সম্রাট বলাই ঠিক। শীঘ্রই আবার দাসদের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ সুরু হয়; এই বিদ্রোহ ভূস্বামী ও দাস-মালিকদের রিপাব্লিককে বিধ্বস্ত করে।

(২)

খৃঃ পূঃ ৮৩ সনে স্পার্টাকাস্ নামে একজন দাস গ্লেডিয়েটর দাসদের সংঘবদ্ধ করে। গ্লেডিয়েটরদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রোমের অভিজাতেরা দাসদের সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর সঙ্গে খেলিতে বাধ্য করিত। দাস ও পশুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে হয় পশু মরিত, নয়ত দাস মরিত। এইরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা হইত রোমান নাগরিকদের স্ফূর্তি ও আমোদের জন্য। যে দাসদের এই সব সর্বনাশা খেলায় যোগ দিতে বাধ্য করা হইত অভিজাতেরা তাহাদের বলিত গ্লেডিয়েটর। পশুর সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশল শিক্ষার জন্য গ্লেডিয়েটর ইস্কুল থাকিত। এইরকম একটি ইস্কুল ছিল কেপুয়ায়। স্পার্টাকাস্ কেপুয়ার ইস্কুলে তাহার সহ-শিক্ষার্থীদের বুঝাইল, রোমানদের মনোরঞ্জনের জন্য পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ না দিয়া স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু বরণ করা বরং শ্রেয়। সত্তর জন গ্লেডিয়েটর স্পার্টাকাসের দলে যোগ দেয়। ইহারা পাহারারত রক্ষীদের অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং ভিসুভিয়স পর্বতে পলাইয়া যায়। শীঘ্রই আরও অনেক পলাতক দাস তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। স্পার্টাকাস্ ও তাহার সাথীদের ধরিয়া আনার জন্য একদল সৈন্য পাঠানো হয়। স্পার্টাকাস নিজে সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছেন; যুদ্ধের কৌশল তাহার জানা আছে। তাহার সাথীদের তিনি ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া রোমান বাহিনীকে আক্রমণ করেন। রোমান সৈন্যরা হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ইহাদের নিকট হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লইয়া স্পার্টাকাস্ তাহার দাস-সৈন্যদের অস্ত্র সজ্জিত করেন। দাসেরা ইটালির বিভিন্ন জায়গা হইতে পলাইয়া স্পার্টাকাসের বিদ্রোহীদলে যোগ দিতে থাকে। স্পার্টাকাস্ সত্তর হাজার দাসের এক বিরাট বাহিনী লইয়া কেম্পাগ্নিয়া ও এপুলিয়া দখল করেন। দক্ষিণ ইটালিতে তিনি একটি স্বাধীন রিপাব্লিক স্থাপন করেন।

রোমানেরা তিনবার স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়; কিন্তু প্রতিবারই তাহারা পরাজিত হয়। স্পার্টাকাস তিনশ' রোমান সৈন্য ধরিয়া আনিয়া পশু ও দাস-গ্লেডিয়েটরের যুদ্ধের নমুনায় একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে

মৃত্যু পর্যন্ত খেলিতে বাধ্য করেন। রোমে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই সংকটের সময় কেহই আর কনসাল পদের প্রার্থী হইতে রাজী হয় না, কেননা কেহই আশা করিতে পারিত না যে স্পার্টাকাসকে দমন করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু দাসদের দুর্ভাগ্য, এইরূপ সংকটের মধ্যেও তাহারা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই। দাসেরা দেশবিদেশের লোক; রোমানদের বন্ধনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। স্পার্টাকাস্ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা; তিনি বুঝিতে পারেন দাসদের ছাড়িয়া দিলে অবস্থা খারাপের দিকে যাইবে। তিনি খোদ রোম দখলের প্রস্তাব করেন; কিন্তু তাহার সেনাপতিরা এই দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইতে রাজী হয় না। বিদ্রোহী দাসদের কোন পরিকল্পনা ছিলনা; দাসেরা স্বাধীনতা চায়, কিন্তু স্বাধীনতা হাতে পাইয়াও কিরূপে তাহা রক্ষা করা যায় তাহা জানিত না। এই কারণেই স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ সাফল্যের কাছাকাছি আসিয়াও ব্যর্থ হয়।

রোমের একজন ধনবান তহ্শীলদার ক্রেসাস্ কনসালপদের জন্য আগাইয়া আসেন; তিনি ছয়টি দলের এক বিরাট বাহিনী গঠন করেন। দীর্ঘ-কাল যুদ্ধের পর অবশেষে ক্রেসাস স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। স্পার্টাকাস্ নিজে এবং তাঁহার হাজার হাজার সাথী এই যুদ্ধে নিহত হন। অনেকেই পলাইয়া যায়; ক্রেসাস্ ছয় হাজার যুদ্ধ বন্দী ধরিয়া আনেন।

কিন্তু দাসেরা দমে নাই; ক্রেসাসের সাফল্যে দাসমালিকেরা মাত্র সাময়িক-ভাবে ত্রাণ পাইয়াছে। পলাতক দাসেরা সর্বত্রই ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকে, কোন কোন দাস পূর্বে নাবিকের কাজ করিয়াছে; ইহারা মাল-বোঝাই রোমগামী সমুদ্রজাহাজ লুঠ করিতে থাকে। ইহাতে রোমে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। সর্বহারা কৃষকেরা রাষ্ট্রের নিকট হইতে রীতিমত খাদ্য-শস্য না পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া অভিজাত ও বণিকেরা সেনানায়কদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দেয়।

দাসবিদ্রোহ এবং মেরিয়াস্ ও অন্যান্য সেনানায়ক কর্তৃক অভিজাতের জমি দখল প্রভৃতির দরুন অনেক ভূস্বামীরই সর্বনাশ হয়; ইহারা অনেকেই বণিকদের নিকট ঋণ লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঋণ শোধ দেওয়ার সামর্থ তাহাদের ছিল না। ফলে, বণিক ও সুদখোরেরাই এখন জমির মালিক হইয়া দাঁড়ায়। বণিকশ্রেণী এখন প্রতাপশালী, জোর করিয়া জমি দখল করিতেও তাহাদের বাধে না। এইভাবে খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে পুরাতন সিনেট-অভিজাততন্ত্র একেবারে ধ্বসিয়া পড়ে। যে সব অভিজাতের হাতে তখনও ভূসম্পত্তি ছিল তাহারা বণিকদের দলে ভিড়িয়া যায়। ইহারা পতনোন্মুখ

দাসব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য সামরিক কর্তৃত্ব ও সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়।

সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে বণিক ও ভূস্বামীদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত ও লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার কিছুই জানা যায় না। প্রথম চুক্তি হয় একদিকে বণিকদের প্রতিনিধি ক্রেসাস্ এবং অন্যদিকে ভূস্বামীদের প্রতিনিধি পম্পি ও জুলিয়াস্ সীজারের মধ্যে। পম্পি একজন বিখ্যাত সমরনায়ক; তিনি সাময়িকভাবে দাসবিদ্রোহীদের জলদস্যুতা দমন করিয়া বাণিজ্যপথগুলি নিরাপদ করেন। জুলিয়াস্ সীজার একজন তরুণ ভূস্বামী; কিন্তু ধনসম্পত্তি উড়াইয়া তিনি বণিকদের দলে যোগ দেন; তাহাদের সহায়তায় পুনরায় অবস্থার উন্নতি করাই তাহার লক্ষ্য।

চুক্তির তিনজন স্বাক্ষরকারীই আশা পোষণ করিতেন, বিদেশে নিজস্ব বাহিনী গঠন করিয়া সহসা রোম দখল করিবেন এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করিবেন। পম্পি এবং সীজার কনসাল্ নিযুক্ত হন। ইহারা কনসাল হইয়াই ক্রেসাসকে এশিয়া মাইনরে পাঠান; এশিয়ামাইনরের বিথিনীয়া অঞ্চলের উপর পূর্বে রোমানদের দৃষ্টি পড়ে নাই। ক্রেসাসকে এই প্রদেশ লুণ্ঠন করার জন্য পাঠানো হয়। ক্রেসাস এই অভিযানে নিহত হয়। পাম্প বিরাট বাহিনী লইয়া এশিয়ামাইনর, সীরিয়া ও পেলেষ্টাইন অভিমুখে অগ্রসর হন; সীজার গল, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ জয়ের জন্য যাত্রা করেন। বিদেশে এই দুই সমরনেতার লুণ্ঠনের কাজ দশ বছর ব্যাপিয়া চলে।

সীজার শুধু বড় সেনাপতিই নন, তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। গল হইতে তিনি তাহার অনুচরদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতেন। ইহারা প্রলিটেরিয়ানদের মধ্যে প্রচার করিত,—সীজার ফিরিয়া আসিলেই তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। খৃঃ পূঃ ৪৯ সনে সীজার দেশে ফিরিয়া আসেন এবং বিনাবাধায় রোম দখল করেন। পম্পি এবং তাহার সমর্থকেরা গ্রীসে পলাইয়া যান; সেখানে তাহারা নূতন সেনাবাহিনী গঠন করিয়া গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সীজার গণপরিষদের সমর্থন পাইয়া রোমের কনসাল হন। কিন্তু অভিজাত আততায়ীদের হাতে শীঘ্রই তিনি প্রাণ হারান।

নূতন একটি চুক্তি হয় এণ্টোনিয়াস্, অক্টেভিয়াস্ ও লেপিডাসের মধ্যে। এণ্টোনিয়াস সীজারের জামাতা, অক্টেভিয়াস্ তাহার দত্তকপুত্র; লেপিডাস একজন ধনী বণিক। ইহারা রোমান সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত করেন। সিনেট-দল ইহাদের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং আবার গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। কিন্তু অভিজাতেরা পরাজিত হয়। এদিকে অক্টেভিয়াস্ এণ্টোনিয়াসকে হত্যা করিয়া রোমের একচ্ছত্র শাসক হন।

ত্রিশ বৎসর এইভাবে গৃহযুদ্ধ চলে; খৃষ্টের জন্মের ৩০ বছর আগে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরতি হয়।

অক্টেভিয়াস্ সীজারকে দেবতা ঘোষণা করেন; তাহার নামে মন্দির স্থাপন করেন; সীজারের পূজার জন্য বহু পুরোহিত নিযুক্ত করেন। অক্টেভিয়াস্ নিজেকে বলিতেন অগাস্টস্ অর্থাৎ 'পবিত্রব্যক্তি'। ইতিহাসে তিনি এই নামেই পরিচিত। বিরোধী অভিজাতদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া সৈন্যদের মধ্যে তিনি উহা বিলি করিয়া দেন।

সিনেট-রিপাব্লিক চিরতরে লুপ্ত হয়; রোমে এখন সামরিক অধিনায়কের একনায়কত্ব কায়েম হয়।

(৩)

রোমের সম্রাটেরা স্বৈরাচারী। কিন্তু সেনাবাহিনীর উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হইত। সৈন্যদের মধ্যে প্রলিটেরিয়ানও ছিল যথেষ্ট। সৈন্যদের তুষ্ট রাখা ছিল সম্রাটদের প্রধান কাজ; কেননা অসন্তুষ্ট সেনাবাহিনী এক সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার জায়গায় অন্য সম্রাটকে বসাইতে পারিত।

প্রত্যেক সম্রাটই তাই সেনাবাহিনীকে শুধু নানা রকমে খুশিই রাখিতেন না, তাহাদের মধ্যে নিজের উত্তরাধিকারীকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতেও চেষ্টা করিতেন; সেনাবাহিনী খুসি থাকিলেই সম্রাটের উত্তরাধিকারীর সম্রাট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। প্রিটোরিয়ানরাই সম্রাটের শ্রেষ্ঠ বাহিনী; অনেক সময় সম্রাট তাঁহার উত্তরাধিকারীকে প্রিটোরিয়ানদের সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন।

অনেক সম্রাটই শাসনকার্যের একেবারে অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দাস-মালিকদেব তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সম্রাট দাস-বিদ্রোহীদের দমন করেন, তাহারা শুধু ইহাই চায়। সম্রাটের উপদেষ্টারাই প্রকৃতপক্ষে আইন-কানুন প্রণয়ন করিত। সম্রাট শুধু স্বাক্ষর দিতেন।

শতবর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধে ইটালি এবং উহার প্রদেশগুলি সর্বস্বান্ত হয়। অগাস্টস্ বিজয়গর্বে বলিয়াছিলেন, তিনি চিরকালের মত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না উহা কবরখানার শান্তি। একমাত্র মিশরের বৈষয়িক জীবন কতকটা স্বাভাবিক ছিল, তাহা ছাড়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশগুলি ধ্বংসের কিনারায় আসিয়া পেঁাছে। বাণিজ্য প্রায় বন্ধ; বিক্রেতা অনেকেই, কিন্তু ক্রেতা নাই। কারিগরেরা কোন রকমে কালাতিপাত করে; প্রাচ্যের কৃষকেরা টেক্স এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের চাপে গুমরায়।

কিন্তু স্বচ্ছন্দ জীবন ছিল ধনবান রোমান দাস-মালিকদের; গৃহযুদ্ধের সময়ে লুটের মাল হাত করিয়া উহারা প্রভূত ধনের মালিক হয়। এখন ইহারা বিলাসিতায় তাহা খোয়ায়। হাজার হাজার দাস ইহাদের পরিচারক। গ্রীক শিল্পীদের দ্বারা গ্রীক ফ্যাসনে গৃহ, উদ্যান, বাড়ি নির্মাণ করাইয়া তাহারা বাস করে। কিন্তু দাস-মালিকেরা বুঝে নাই যে এই সুখের ঘর তাহারা বালির উপরেই বানাইয়াছে। ধন তাহাদের নিঃশেষিত হইতেছে, কিন্তু নূতন সঞ্চয়ের পথ নাই। কোন দেশ আর বাকী ছিল না যাহা রোমান দাস-মালিকদের লুণ্ঠনে উজাড় হয় নাই।

সম্রাটেরা শাসনসংস্কারের কাজে উদ্যোগী হন। বিজিত প্রদেশগুলিতে প্রোকনসালদের স্বৈরশাসনের পরিবর্তে আইনানুগশাসন প্রবর্তন করা হয়। প্রদেশের শাসক এখন প্রকুরেটার; রোমের সদর দপ্তরে উহাদের শাসন সংক্রান্ত বিবরণ পাঠাইতে হয়। প্রকুরেটারের নামে প্রদেশের প্রজারা যদি অভিযোগ করে তবে তাহাকে সরাইয়া নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়! টেক্সও আর নানারকমের নয়; এখন মাত্র প্রজাকে দিতে হয় পোলটেক্স ও ভূমি কর। আয়ের এবং সম্পত্তির অনুপাতে কর ধার্য হয়।

সম্রাটেরা বিজিত দেশের প্রজাদের নাগরিকের অধিকার দেয়। রোমান নাগরিকের অনেক রকম অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল, প্রাদেশিক শাসকেরা রোমান নাগরিককে প্রাণদন্ড দিতে পারে না। প্রথমটায়, যাহারা ধনবান তাহাদেরই রোমান নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইত। পরে অবশ্য সাধারণ লোকের মধ্যেও নাগরিক অধিকারের সম্প্রসারণ করা হয়।

কিন্তু এসকল সংস্কার সাম্রাজ্যকে বাঁচাইতে পারে না; কেননা মূলভিত্তি অর্থাৎ দাসত্বের উপর হাত পড়ে নাই; লুণ্ঠন কমিয়াছে, কিন্তু থামে নাই। সেনাবাহিনীর জন্য নানা রকমের আদায় এবং সম্পত্তি-আত্মসাত চলিতেই থাকে। করের সংখ্যা কমানো হইয়াছে, কিন্তু মাত্রা ঠিকই আছে। এক কথায়, শোষণের মাত্রা বদলায় নাই। একদিকে, সিংহাসন লইয়া সামরিক অধিনায়কদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অন্যদিকে, দাস এবং বিজিত প্রদেশের প্রজাদের বিদ্রোহ; এই চরম সংকটের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের পতন অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়।

জনগণের অসন্তোষ দূর করার কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করা হয়। রোমে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক বাস করিত; শহরে যে সব সর্বহারারা ভিড় করিত তাহাদের সংখ্যাই প্রায় দুই কি তিন লক্ষ। ইহাদের একটা অংশ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু অধিকাংশের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ছিল সম্রাটের প্রদত্ত ভাতা এবং দাস-মালিকদের দান। প্রায় বিনামূল্যেই রুটি বিতরণ করা হইত। উৎসবাদি উপলক্ষে সর্বহারাদের জন্য ভুরিভোজনের

ব্যবস্থা হইত। সম্রাট দেশ জয় করিয়া রোমে ফিরিলে নগর সুসজ্জিত করা হইত, তোরণ নির্মাণ করা হইত। জনগণের মন ভুলাইয়া রাখার জন্য সার্কাস প্রভৃতি নানা রকম তামাসারও আয়োজন করা হইত। রুটির ব্যবস্থা ও তামাসার আয়োজনই সংগ্রামের পথ হইতে সর্বহারাদের প্রতিনিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় ছিল না, আরও একটা উপায় ছিল ধর্ম। সাম্রাজ্যের সর্বত্র সম্রাটদের মন্দির নির্মাণ করা হয়; সম্রাটেরা দেবতা। বিশেষ বিশেষ দিনে তাহাদের পূজার ব্যবস্থা করা হইত।

খাদ্যবিতরণ এবং তামাসার বন্দোবস্ত দ্বারা রোমে নামমাত্র শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু দাসদের এবং বিজিত প্রদেশগুলির প্রজাদের আজ্ঞাধীন রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রোমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, খৃষ্টের জন্মের পরের প্রথম শতকে খন্ড-বিদ্রোহ কিছুদিন পর পরই দেখা দিয়াছে। দাসদের হাতে মালিকহত্যা প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দাস-মালিকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়। কঠোর আইনের দ্বারা দাসদের শায়েস্তা করা হয়। যে হত্যা করে শুধু তাহাকেই নয়, হত্যার সময় মালিকের গৃহে যত দাস থাকে—সকলকেই একসঙ্গে ফাঁসী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই জল্লাদের আইনেও দাসেরা দমে নাই। এদিকে ইটালির বাহিরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রজারা রোমে কোনরকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেই সেই সুযোগে বিদ্রোহ করিত। ৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে ভয়ংকর একটা বিদ্রোহ হয় জুডিয়ায়। রোমান অত্যাচারী এবং স্থানীয় শোষক উভয়ের বিরুদ্ধেই জনসাধারণ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা জেরুজালেম শহর দখল করে; চার বছরের যুদ্ধের পর রোমানরা জুডিয়ার বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হয়।

দাসদের বিদ্রোহ সবসময়ই শেষ হইয়াছে পরাজয়ের মধ্যে। সর্বহারারা রাষ্ট্র এবং দাস-মালিকদের খরচেই জীবনধারণ করিত;—কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল শুধু রোমেই। অন্যান্য শহরে এবং প্রদেশে সর্বহারাদের ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। দাস এবং সর্বহারা ছাড়া প্রাচ্যের সর্বস্বান্ত প্রজারাও রহিয়াছে। এই সমস্ত লোকেরা দুর্গতির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছে। এদের সমস্যার কোনরূপ বৈপ্লবিক সমাধান সম্ভব নয়। সারা সাম্রাজ্যে ইহারা ছড়ানো; উহাদের কোনরূপ সংঘবদ্ধতা সম্ভব ছিল না। একমাত্র রোমের সর্বহারারাই সহজে অত্যাচারীদের শায়েস্তা করিতে পারিত; কিন্তু শাসকেরা খাদ্য-বিতরণ ও নানারকম প্রলোভনদ্বারা ইহাদের হাত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা বিপ্লবের কথা ভাবিতে পারিত না।

এই অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক যে এই দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা ধর্মের মধ্যে সান্ত্বনা লইবে। মানুষের শক্তিদ্বারা তাহারা মুক্তি আশা করিতে পারিত না, অতএব একমাত্র দৈবশক্তিতেই তাহাদের ত্রাণ সম্ভব। খৃষ্টের জন্মের পরে

প্রথম শতাব্দীতে গ্রীস্, রোম, এশিয়ামাইনর প্রভৃতি জায়গায় অনেক ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইহারা প্রচার করিত, জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করিতে স্বয়ং ঈশ্বর শীঘ্রই মানবদেহ লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।

ঈশ্বরের পুত্র খৃষ্ট জনসাধারণের মধ্যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন। খৃষ্টের শিষ্যরা বলিত, পুরাতন দেবতারা ঠিক ঈশ্বর নয়; খৃষ্টই একমাত্র ত্রাণ কর্তা, ঈশ্বরের পুত্র। খৃষ্ট অনেকরকমের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার শিষ্যরা প্রচার করিত, 'যাহারাই খৃষ্টকে মানিবে তাহারাই নূতন জগতে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবে।' খৃষ্টের কাহিনী দুঃস্থ জনসাধারণকে অভাবনীয়রূপে আকর্ষণ করিয়াছিল।

রোমান কর্তৃপক্ষীয়রা খৃষ্টের ধর্মকে ভয়ের চোখে দেখিত; তাহারা মনে করিত খৃষ্টধর্ম বৈপ্লবিক। কিন্তু খৃষ্টের শিষ্যরা দাসমালিকদের আশ্বস্ত করে। তাহারা বলিতে থাকে, 'খৃষ্ট ঐহিক রাজ্যের কথা বলেন নাই; তিনি সাধারণ লোককে মনিবের আজ্ঞাধীন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন'। এইভাবে খৃষ্টধর্ম প্রথমাবধিই জনসাধারণকে শ্রেণীসংঘ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছে এবং মালিক শ্রেণীর সহায়তা করিয়াছে।

(৪)

রোমের দাসমালিকেরা গর্বের সঙ্গে বলিত, রোমের ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তাহাদের শক্তিমান্ রক্ষিবাহিনী ও বিশাল সেনাবাহিনী অপরাজেয়। খৃষ্টের জন্মের পর প্রথম শতকে যখন সম্রাট ট্রাজান ডানিয়ুব তীরবর্তী ডেসিয়া প্রদেশ জয় করেন, তখন দাসমালিকদের জয়োল্লাস চরমে উঠে। কিন্তু রোমান-শক্তির এই শেষ বিজয়।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দাস, সর্বহারা এবং প্রাচ্যের সর্বস্বান্ত প্রজাদের অসন্তোষ তো আছেই, তদুপরি দ্বিতীয় শতকে নূতন ভয় দেখা দিয়াছে। জার্মানরা পূর্বেই একবার আল্পস্ অতিক্রম করিয়া ইটালি আক্রমণ করিয়াছিল। জার্মানরা এখন তাহাদের আদিম যুগের বর্বর জীবন ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; মধ্য ইউরোপের জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে আর তাহারা আবদ্ধ থাকিতে চায় না। উর্বর গলের এবং ইটালির সমৃদ্ধি তাহাদের প্রলুব্ধ করে। জার্মানরা পলাতক দাসদের মুখে নিম্ন ইওরোপের ধনদৌলত ও ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়াছে। ইহারাই জার্মানদের ইটালি আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করিতে থাকে। দাস-মালিকদের আভ্যন্তরিক শত্রু বাহিরের সঙ্গে যোগ দেয়।

অগাস্টাসের পর হইতেই জার্মানরা ঘন ঘন আক্রমণ করিতে থাকে; অগাস্টাস্ নিজে একবার ইটালির সীমান্ত হইতে জার্মানদের বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। সম্রাট বুঝিয়াছিলেন, পাহাড়ে-জঙ্গলে জার্মানদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই, আক্রমণমূলক যুদ্ধ ছাড়িয়া তিনি আত্মরক্ষার পথ ধরিলেন। আল্পসের গিরিপথগুলিতে এবং রাইন ও ডানিয়ুবের তীরে অগাস্টাস্ অনেকগুলি দুর্গ তৈয়ার করেন। এইসব দুর্গের অনেকগুলিই পরবর্তী সময়ে বড় বড় শহরে পরিণত হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে জার্মানদের এইভাবে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পরই তাহাদের চাপ বাড়িতে থাকে। এদিকে পারসীক ও আর্মেনীয়নরা রোমান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সহজেই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। রোমান সাম্রাজ্য এখন অনেকটা অবরোধের মধ্যে। দাস-মালিকদের নির্বিচার লুণ্ঠনের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। আজ আর এমনকি আত্মরক্ষার জন্যও সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব নয়। জার্মান এবং পারসীকরা একটি একটি করিয়া রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি দখল করিতে থাকে। যাহারা কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া অন্যদের দাস বানাইয়াছে, আজ তাহারাই দাসে পরিণত হইতেছে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন সুনিশ্চিত; মাত্র সময়ের প্রশ্ন। রোমান দাস-মালিকদের 'শাশ্বত রোম' ধ্বংসের কিনারায় পোঁছিয়াছে।

দাসত্বের ভিত্তির উপর ইটালির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। ইটালির বৈষয়িক জীবনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দাস খাটানোই যেখানে নিয়ম, সেখানে অনবরত দাস-সরবরাহ চাই; কেননা একজন দাস অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেই তাহার জায়গায় নূতন দাস নিয়োগ করিতে হয়। কিন্তু দাসের যোগান সম্ভব যখন দেশ জয়ের কাজ চলিতে থাকে; রোমের পক্ষে এখন সে পথ বন্ধ। ফলে, দাস ব্যবসায় অচল হইয়া যায়।

সামুদ্রিক বাণিজ্যও বন্ধ হওয়ার পথে; বহু ব্যবসায়ীই এখন দুর্দশাপন্ন; শহরের লোকসংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। ভূস্বামীর পক্ষে দাসদের ভরণ-পোষণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইভাবে কৃষি-উৎপাদনের মধ্যে চরম বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়; কৃষির পুনর্গঠন ছাড়া উপায় নাই। অনেক ভূস্বামীই দাস-শ্রমিকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া কৃষিকার্যের জন্য দাসদের ছোট ছোট জমি, বীজ ও হালগরু দিতে থাকে। ফসল দাসেরই, মনিব শুধু একটা টেক্স লয়। ভূস্বামীরা লাটি-ফানডিয়ার জমি এইভাবে দাসদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। বড় আকারে উৎপাদনের দিন শেষ হইয়াছে। এককথায়, তৃতীয়শতকে কৃষি-উৎপাদনের

চরম অবনতি ঘটে। ভূস্বামীরা সর্বহারাদেরও এইরকম জমি দিতে, থাকে। রাষ্ট্রের খরচে সর্বহারাদের ভরণ পোষণ আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন দাস ও কৃষকদের নূতন নাম হয় কলোন বা জমির শ্রমিক।

লাটিফানডিয়ার জমি কলোনদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া ভূস্বামীরা সামন্ত জমিদাররূপে বাস করিতে থাকে। ইটালির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের আকার লয়।

চতুর্থ শতকের জার্মানদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রোমের সামরিক সংগঠন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। অগাস্টাসের তৈয়ারী দুর্গশ্রেণী ভেদ করিয়া জার্মানরা ইটালির অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। তাহারা জমি দখল করিয়া যৌথগ্রাম ব্যবস্থায় উৎপাদন করিতে থাকে। বড় বড় ভূস্বামীরাই এখন নিজেদের চেষ্টায় জার্মানদের আক্রমণ রোধ করিতে উদ্যোগী হয়। ইহারা নিজেদের রক্ষীবাহিনী গঠন করিয়া, ছোট ছোট দুর্গ নির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। গ্রামের লোকেরা এইসব দুর্গে আশ্রয় পায়। ভূস্বামীরা অনেক সময়ই শত্রুকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয়, কখনো বা জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যে জমি বিলাইয়াও দেয়। ভূস্বামী জমিদারেরা শহরের পলাতকদেরও আশ্রয় দিতে থাকে। এইসব আশ্রিতদের নিকট হইতে তাহারা টেক্স লইত; নিজেদের কাজে উহাদের খাটাইত। এই-ভাবে ভূস্বামীরা ছোট ছোট সামন্তে পরিণত হয়।

ভূস্বামীরা যে ধীরে ধীরে সামন্ত অধিপতি হইয়া দাঁড়াইতেছে, সম্রাটেরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। সাম্রাজ্য শত্রুর অবরোধের মধ্যে; সম্রাটদের পক্ষে প্রদেশগুলির শাসন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভূস্বামীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখিয়া বরং সম্রাটেরা তাহাদের হাতেই শাসনক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়। টেক্স আদায়, আইন আদালত, সেনাবাহিনী গঠন প্রভৃতি কাজ এখন ইহাদেরই। এককথায়, সামন্তরা স্ব স্ব এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো রোমের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বসিয়া পড়ে। দাসের স্থানে আবির্ভাব হয় সর্বস্বান্ত আধা-স্বাধীন মানুষের। পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নূতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জন্ম হয়।

তৃতীয় শতকে যখন রোমের চরম দুঃসময়, তখন শাসকেরা বুঝিতে পারে যে খৃষ্টধর্ম শ্রেণীসংঘর্ষ এড়ানোর পক্ষে একটা বড় রকমের উপায়। সম্রাট কনস্টেণ্টাইন ৩১৩ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে স্বীকৃতি দেন। ধর্মযাজকেরাও তাহাকে খৃষ্টের চার্চের প্রধান ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করে। এই-ভাবে খৃষ্টধর্ম শাসন-কর্তৃপক্ষীয়দের হাতে একটা শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত

হয়। রোম সাম্রাজ্য হইতে খৃষ্টধর্ম ধীরে ধীরে স্লাভ ও জার্মানদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। রাজা এবং সামন্তনৃপতিরাই ইহার প্রধান পরিপোষক; কেননা উহারা বুঝিতে পারে যে জনসাধারণকে দাবানোর জন্য এমন অমোঘ অস্ত্র আর নাই।

চতুর্থ শতকের শেষের দিকে জার্মানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার আর কোন উপায় থাকে না। গথরাই প্রথম সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; ডানিয়ুবের অপর তীর হইতে উহারা রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। সম্রাট বল্কানে তাহাদের জায়গা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং তাহাদের মিত্ররূপে স্বীকার করেন। অপর এক একদল রাইন অতিক্রম করিয়া গল এবং ইটালির মধ্যে ঢুকে। স্পেন, আফ্রিকা সর্বত্রই উহারা ছড়াইয়া পড়ে। জার্মান সমরনায়কেরা সরকারীভাবে উপাধি লইত 'সম্রাটের সামরিক কর্মচারি'। কিন্তু সম্রাটের ধার তাহারা মোটেই ধারিত না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে জার্মান নেতারা প্রকৃতপক্ষে রোমের শাসকই হইয়া দাঁড়ায়। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে উহারা সম্রাট অগাস্টুলাসকে সরাইয়া দেয় এবং জার্মান নায়ক ওডোয়েকারকে* রাজা ঘোষণা করে। এই ঘটনা হইতেই রোম সাম্রাজ্যের অবসান ধরা হয়।

এইভাবে গ্রীস ও রোমের রাষ্ট্রশক্তির পতন হয়; কিন্তু এই দুই সভ্যতার প্রভাব সারা ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

---

* Odoacer

সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি

(১)

রোমে কি ভাবে দাসপ্রথা হইতে সামন্ততন্ত্রের জন্ম হয়, সংক্ষেপে আগের অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে। এখন আমরা বিশদভাবে এসম্পর্কে আলোচনা করিব। খৃষ্ট জন্মের পর প্রথম শতকে পশ্চিম ইওরোপের মধ্য ও দক্ষিণ অংশ, আফ্রিকার উত্তরদিকের দেশগুলি, সীরিয়া, এশিয়ামাইনর, ট্রান্স-ককেসিয়া ও মেসোপটেমিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দাসপ্রথা। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন সাম্রাজ্যের চরম সঙ্কট।

তৃতীয় শতকে সাম্রাজ্যের,—বিশেষত—পশ্চিম অংশের, চরম বৈষয়িক অবনতি ঘটে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যায়, বাণিজ্য চলাচল প্রায় বন্ধ হয়। শহরগুলির লোকসংখ্যা হ্রাস পায়, অনেকেই গ্রামের দিকে চলিয়া যায়। বিভিন্ন দেশে রোমের বণিকদের ছিল একচেটিয়া বাণিজ্য; কিন্তু তাহাদের গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া যায়। শাসন-কেন্দ্ররূপে রোমের গৌরব হ্রাস পায়। শাসকশ্রেণী অবশ্য তাহাদের বিলাসের জীবন পরিত্যাগ করে নাই; প্রাচ্য হইতে আমদানি করা বিলাসের দ্রব্যের জন্য তাহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত। মধ্যবিত্তেরা দরিদ্রের দলে ভিড়িতে থাকে। সামাজিক জীবন সংকটাপন্ন হয়। হস্তশিল্পের ও কৃষির অবনতি, লোক-সংখ্যা হ্রাস, বেকারের ভিড়—রোমান আধিপত্যের উহাই শেষ পরিণতি।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলেন,—অবিরত দাসবিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যকে দ্রুত অবনতির পথে লইয়া যায়। দাস-বিদ্রোহ রোমান সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে এবং নূতন সমাজের পথ পরিষ্কার করে। দাসত্বপ্রথা ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু ভূমিদাস প্রথার জন্ম হয় এবং নূতন রকমের শোষণ দেখা দেয়।

সঙ্কটের ছাপ সুস্পষ্টভাবে পড়ে কৃষির উপরে। ব্যাপক অর্থনৈতিক অবনতি, বাণিজ্যের অচল অবস্থা, শহরে লোকসংখ্যা হ্রাস প্রভৃতির দরুন কৃষিপণ্য বিক্রয় একপ্রকার বন্ধই হইয়া যায়। লাটিফান্ডিয়া প্রভৃতি বড় বড় কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি লোকসান দিতে থাকে; বরং ছোট আকারে যাহারা

কৃষি করে তাহারা কিছুটা লাভ পায়। এই কারণেই একসঙ্গে অনেক জমির একত্র চাষ বন্ধ হইয়া যায়। এখন খণ্ড খণ্ড জমিতে ছোট আকারে চাষ সুরু হয়। যে সব কৃষক-দেনাদার প্রতি বছর মনিবকে ফসলের নির্দিষ্ট একটা অংশ দিতে স্বীকৃত হয়, ভূস্বামীরা তাহাদেরই খণ্ড খণ্ড জমি দিতে থাকে। ভূস্বামীরা স্বাধীন কৃষকদের মধ্যেও জমি বাঁটিয়া দেয়। কিন্তু কলোনদের মধ্যেই জমি বাঁটিয়া দেওয়া হয় বেশী। কলোনরা স্বাধীনভাবে চাষ করে। অবশ্য হাল-গরু ভূস্বামীই দেয়, কলোন জমির সঙ্গে আট্‌কা; জমি বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলোনও বিক্রয় হইয়া যায়। কৃষি-উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য এখন হইয়া দাঁড়ায় দাসশ্রমের বদলে কলোনের শ্রম। দাসেরাই যে শুধু কলোন হয় তাহা নয়, যে-সব স্বাধীন কৃষক দেনাগ্রস্ত তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়া কলোনে পরিণত হয়।

কলোন-প্রথা শুধু ইটালিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উহা ছড়াইয়া পড়ে। গলের কথা আমরা ভাল জানি।

গলে কলোনদের পাশাপাশি কিছু কিছু স্বাধীন কৃষকও ছিল। সুদখোর, তহ্‌শীলদার এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উহারা প্রায়ই কোন একজন বড় ভূস্বামী বা সিনিয়রের* শরণাপন্ন হইত। সিনিয়র কতকগুলি শর্তে ইহাদের আশ্রয় দিত; প্রধান শর্ত ছিল—কৃষককে তাহার জমির স্বত্ব ভূস্বামীর হাতে দিতে হইবে; ভূস্বামী অবশ্য কৃষককে সারাজীবনের জন্য জমির ভোগদখলের অধিকার দিবে! কৃষকের এই রকম পৃষ্ঠপোষককে বলা হইত 'পেট্রন'।

পেট্রন তাহার আশ্রিতদের অস্ত্র দিত; তাহাদের লইয়া ছোট সৈন্যদল গঠন করিত; প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করিত; অন্যের জমি কাড়িয়া লইত। তাহার নিজেরই আদালত এবং জেল থাকিত। পেট্রনের এলাকার মধ্যে সম্রাটের তহ্‌শীলদারের কোন ক্ষমতাই ছিল না।

পেট্রনের অত্যাচার যে কলোন-ভূমিদাসেরা নীরবে সহ্য করিয়াই যাইত তাহা নয়, কখনো কখনো তাহারা বিদ্রোহ করিত। ২৮৩ খৃষ্টাব্দে গলে কৃষকদের বিদ্রোহ হয়; বিদ্রোহীরা অনেক পেট্রনের সম্পত্তি হাত করে, অনেকগুলি শহর দখল করে। রোম সম্রাট মেক্সিমিয়ান স্বয়ং বিদ্রোহ দমনের জন্য গলে আসেন, এবং বিদ্রোহীদের উপর নির্মম অত্যাচার করেন। গলেই শুধু নয়, অন্যান্য প্রদেশেও কলোনদের ঐ রকম বিদ্রোহ হয়।

দাসত্বের উপর খাড়া রোমান সাম্রাজ্যের গভীর অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। পেট্রন-প্রথা কি ভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিকে

---

* Seigneur

দুর্বল করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। বিরাট রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য ভাঙিয়া যায়। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, উত্তরদিককার রোমান রাজ্যগুলি জার্মানরা দখল করিয়াছে। দক্ষিণে, এশিয়ামাইনরকে রোম হইতে পৃথক করিয়া লওয়ার জন্য একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠে। সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগের অভাবহেতু রাজনৈতিক ভাগাভাগির পথ পরিষ্কার হয়। তৃতীয় শতকেই পূর্ব-অঞ্চলের দেশগুলি রোম হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন প্রকৃতপক্ষে দুইজন সম্রাট; সম্রাট ডায়োক্লেসিয়ান এশিয়া মাইনরের নিকোমেডিয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। মেক্সিমিয়ান রোমেই থাকিয়া যান। দুইজনেরই উপাধি 'অগাস্ট'।

ভাগাভাগি এইখানেই শেষ হয় নাই; দুই সম্রাটেরই আবার রাজপ্রতিনিধি ছিল। উহাদের বলা হইত 'সীজার'। সীজারেরাও নিজেদের অধীনের রাজ্য ভাগ করিয়া লয়। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য নির্দিষ্ট দুইটি অংশে ভাগ হইয়া যায়। পশ্চিমের সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম, পূর্বের সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল্। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বের ভাগটির নাম এখন বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য; পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই উহার বৈষয়িক উন্নতি চলিতে থাকে। কিন্তু পশ্চিমের সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি হয়।

(২)

পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি কিরূপে রোমান সাম্রাজ্যের দাসত্ব-প্রথা জার্মান জাতির আক্রমণে একেবারে ধ্বসিয়া পড়ে। জার্মানরা তাহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়ে নাই বটে, কিন্তু তাহারা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতি-গুলির রীতিনীতি গ্রহণ করে।

সুপ্রসিদ্ধ রোমান সেনাপতি সীজারের লেখা হইতে জানা যায়, খৃঃ পূঃ প্রথম শতকেও জার্মানদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বত্বের আবির্ভাব হয় নাই; কৃষির উপর তাহাদের ঝোঁক ছিল কম, পশুপালনই ছিল মুখ্য জীবিকা। প্রথমটায় গোত্রগুলি যৌথভাবে জমি চাষ করিত; পরে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ পরিবার-গুলি পৃথকভাবে জমি চাষ করিতে থাকে। এক একটা পরিবারে থাকিত কয়েক পুরুষের লোক,—কোন কোন পরিবারে একশ'র উপরেও লোকসংখ্যা। কিছুকাল পর পর পরিবারগুলির মধ্যে জমির পুনর্বণ্টন হইত।

খৃষ্টের জন্মের পরে প্রথম শতকে পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা কৃষির উপরও জোর দেয়। প্রসিদ্ধ রোমান ঐতিহাসিক টেসিটাসের নিকট হইতে আমরা এ সময়ের ইতিহাস জানিতে পারি। কৃষিই নয়, তখন তাহারা খনির কাজ আরম্ভ করিয়াছে; নানারকম হস্তশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে।

টেসিটাসের সময়ে জার্মান জাতিগুলির মধ্যে ছিল পুরাপুরি গণতন্ত্র। প্রত্যেকটি গোত্রের একটি গণপরিষদ থাকিত; গোত্রের সকল ক্ষমতা গণ-পরিষদের। গণপরিষদ যুদ্ধের সময়ে সেনাপতি নিযুক্ত করিত; সেনাপতিকে বলা হয় হারজগ* বা ডিউক। ধীরে ধীরে জার্মানদের মধ্যে ডিউকরাই হইয়া দাঁড়ায় সবচেয়ে প্রভাবশালী। উহাদের চতুর্দিকে থাকিত রক্ষীদল। ইহারা প্রভুর আজ্ঞাবহ। যুদ্ধের সময়ে ছাড়াও শান্তির সময়ে ডিউকরা তাহাদের ক্ষমতা খাটাইতে থাকে। ধীরে ধীরে ডিউকরা তাহাদের পদ স্থায়ী এবং বংশানু-ক্রমিক করিয়া লয়; ডিউকের ছেলেই হইবে ডিউক। কয়েকটি গোত্র একত্র হইয়া যখন একটি গোত্র-সংঘ হয়, অথবা গোত্রগুলি বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হয়;—তখন উহার প্রধান ব্যক্তির নাম হয় কোনাং† অর্থাৎ রাজা। তখন পুরাপুরিই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, বিত্তের অসমতা দেখা দিয়াছে। রাজা এবং ডিউকদের অধীনে বড় ছোট'র সৃষ্টি হইয়াছে; জার্মান বড়লোকদের দাসের সংখ্যা ছিল কম; গরীব জার্মানরা ছিল আধা-স্বাধীন।

যুদ্ধের সময়ে লুণ্ঠনের বড় ভাগটাই আত্মসাত করিত রাজা এবং ডিউকরা, বিজিতের সকল জমিই রাজার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। এই জমির একটা অংশ রাজার দখলেই থাকিত। সেনাপতিদের মধ্যেও অনেক জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। জার্মান জাতিগুলির মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম শতকে সুস্পষ্ট দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় : বড় ভূস্বামী, ইহাদের নেতা রাজা ও ডিউকেরা; শোষিত কৃষক যাহারা মাঠে কাজ করিত এবং ভূস্বামীদের নানারকমের দাবি মিটাইত। ইহা ছাড়াও ছিল ভূমিদাস, ভূস্বামীর আশ্রিত।

ফ্রাঙ্ক নামক একটি জার্মান জাতির কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলেন, 'স্বাধীন ফ্রাঙ্ক-কৃষক রোমান কলোনদের অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। ক্রমাগত যুদ্ধ এবং লুণ্ঠনের ফলে উহারা সর্বস্বান্ত হয়। রাজা উহাদের রক্ষা করিতে পারিত না, তাই কৃষকেরা বড় ভূস্বামী অথবা ধর্মযাজকদের শরণাগত হইত; কিন্তু উচ্চমূল্য দিয়াই তবে তাহারা বড়লোকদের আশ্রয় পাইতে পারে। গলের কৃষকদের মতই তাহাদেরও জমির স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে হইত। কৃষক এখন জমি চাষ করিতে পারে; খাজনার বাইরেও কৃষককে মনিবের নানারকমের দাবি মিটাইতে হয় এবং ফসলেরও একটা অংশ দিতে হয়। এইরূপ পরনির্ভরতার দরুন ক্রমশ কৃষকেরা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইতে থাকে এবং কয়েক পুরুষের মধ্যেই দেখা যায় যে উহারা ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে।

সমাজশ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি হইয়াছে রাষ্ট্রের।

---

* Herzog; † Konung (King)

রাষ্ট্র সকল সময়ই আছে, এইরূপ ধারণা মিথ্যা; শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্র নাই। যখন শ্রেণী ছিল না, শ্রেণী সংঘর্ষও ছিল না,—তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় নাই। সমাজে যখন শোষকশ্রেণীরা সৃষ্টি হয়, তাহারা নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সকল রকমে চেষ্টা করিতে থাকে। আগেকার যৌথজীবনের স্বায়ত্তশাসনে তাহারা আর তৃপ্ত থাকিতে পারে না। যতবেশী ক্ষমতা সম্ভব তাহা হস্তগত করাই শোষকশ্রেণীর প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ইহারা ক্ষমতা প্রয়োগের একটি বিশেষ রকমের যন্ত্র তৈয়ার করে—উহাই রাষ্ট্র। সৈন্য, রাজকীয় কর্মচারী, তহশীলদার, বিচারক—এইসব রাষ্ট্রের বিভিন্ন অবয়ব। আদিমযুগের সমাজে গোত্রগুলি স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে সমষ্টির সমস্তরকম কাজ পরিচালনা করিত, এখন সেই গণতান্ত্রিক সমাজকাঠামো লুণ্ঠন ও অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

জার্মানজাতিগুলির মধ্যে যখন সামাজিক শ্রেণী ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, তখন তাহারা প্রচণ্ড সামরিক অভিযান লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ইওরোপ জয় করিয়া রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বসতি স্থাপন করার পর জার্মানরা অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথমত ওয়েস্টগথদের রাজ্য; তারপর বার্গাণ্ডি। উত্তর গলে ফ্রাঙ্কদের রাজ্যও ছিল খুব শক্তিশালী; তাহা ছাড়া বৃটেনে কতকগুলি এ্যাংলো-স্যাক্সন রাজ্যও গড়িয়া উঠে; সর্বশেষে দেখা দেয় আফ্রিকার ভাণ্ডালদের এবং ইটালিতে ওয়েস্টগথদের রাজ্য।

সকল রাজ্যই সমান স্থায়ী হয় নাই; ভাঙ্গাগড়া প্রায় ছিলই। কতকগুলির বিলোপ হয়, আবার কতকগুলি অন্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ষষ্ঠ শতকে বৃটেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ্যাংলো-স্যাক্সন রাষ্ট্রগুলি তিনটি বড় রাজ্যে পরিণত হয়, নবম শতকে এই তিনটি আবার একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অষ্টম শতকের শেষদিকে ফ্রাঙ্কদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় প্রায় সবটা পশ্চিম ইওরোপ: এই সময় ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস-দি-গ্রেট সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের সকল অংশই যে ঐক্যবদ্ধ ছিল তাহা নয়। অনেক জায়গায় প্রাদেশিক শাসকেরই ছিল পুরা ক্ষমতা। নবমশতকের মাঝামাঝি সময়ে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায় এবং ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, লোরেন প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়া যাহাই হউক, সমাজের কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক; রাজার অধীনে সামন্ত, সামন্তের অধীনে ভূমিদাস।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং জার্মান রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের আলোচনা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে নূতন একটা সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হয়—এই সমাজ ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের একটি কারণ,—রোমান সাম্রাজ্যের দাসত্বপ্রথা, অপর কারণ জার্মানদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীভেদ।

সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য

(১)

সামন্তপ্রভু ও কৃষকভূমিদাস,—সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এই প্রধান দুইটি শ্রেণীর কিরূপে উৎপত্তি আগের অধ্যায়ে তাহা আমরা দেখিয়াছি।

আইনের চোখে এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে ভূমিদাসের অবস্থা আমরা বিচার করিব। এইরূপ বিচার খুব সহজ হয় যদি আমরা দাস ও ভূমিদাসের তফাত বুঝি এবং তাহাদের একালের শ্রমিকের সঙ্গে তুলনা করি।

দাস, ভূমিদাস এবং শ্রমিক—এই তিনের সাদৃশ্য এইখানে যে ইহারা সকলেই শোষিত। দাসকে শোষণ করে দাসমনিব; ভূমিদাসকে শোষণ করে সামন্তপ্রভু; শ্রমিককে শোষণ করে কারখানা-মালিক। ইহাদের মধ্যে তফাতও আবার অনেকখানি।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন; কিন্তু তাহা হইলেও উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণগুলি হইতে সে বঞ্চিত। নিজের বলিতে তাহার আছে শুধু শ্রমশক্তি। শ্রমিক যদিও স্বাধীন, তবুও উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণগুলির মালিকের নিকট শ্রমশক্তি বিক্রয় না করিয়া তাহার উপায় নাই। বিক্রয় না করিলে তাহাকে না খাইয়া মরিতে হয়। তাহা ছাড়া, সব সময়ই সে শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারে না; অনেক সময়ই কাজ যোগাড় করিতে না পারিয়া শ্রমিককে বেকারের জীবন যাপন করিতে হয়।

এযুগের শ্রমিকের মত আগেকার যুগের দাস এবং ভূমিদাস ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল না। দাস-মালিক ও ভূস্বামী তাহাদের কাজ করিতে বাধ্য করিত। দাসকে মনে করা হইত দাসমালিকের সম্পত্তি; মালিক তাহাকে বিক্রয় করিতে পারে, শাস্তি দিতে পারে এমন কি হত্যাও করিতে পারে। দাসের নিজের কোন সম্পত্তি নাই, নিজের কোন সংসার নাই। ভূমিদাসের আবার অন্যরকম অবস্থা। তাহাকে জমি দেওয়া হয়; তাহার হাল-গরু নিজস্ব; নিজেরই পৃথক সংসার। ভূমিদাস মনিবকে তাহার ফসলের কতক অংশ দেয়, তাহার সময়েরও কতক অংশ সে মনিবের জন্য খাটে। সামন্ততন্ত্রের যুগে সর্বত্রই কৃষককে বাধ্যতামূলকভাবে মনিবের জন্য খাটিতে হইত

এবং ফসলের ভাগ দিতে হইত। প্রথমটিকে বলা হয় কর্ভি, এবং দ্বিতীয়টিকে কুইট-রেণ্ট।

কর্ভি বলিতে বুঝায় মনিবের জমিতে চাষের কাজ; তাহা ছাড়া ছিল রাস্তাঘাট তৈয়ার, মনিবের পশু চরানো ইত্যাদি। নবম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত কৃষকের উপর কর্ভিপ্রথার খুব চাপ ছিল না, কেননা সে সময়ের ভূস্বামীদের চাষ-আবাদের দিকে ততটা লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু কর ও খাজনা ছিল নানারকমের। লবণের ব্যবসায় ছিল মনিবের একচেটিয়া। অধীনস্থ কৃষকদের বিচার করিত মনিবই; মনিব অপরাধের জন্য জরিমানা আদায় করিত। এসব ছিল আইনমত আদায়; তাহা ছাড়া বে-আইনী আদায়ও বড় কম ছিল না। মনিব যখন দলবলসহ ভ্রমণে বাহির হইত, তখন উহাদের আহার ও বাসের বন্দোবস্ত করিতে হইত কৃষককে। কৃষকের জমির সঙ্গেই থাকিত মনিবের শিকারের জায়গা। শিকারের সময় কৃষকের ফসল নষ্ট হইলেও তাহার চুপ করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় থাকিত না।

ভারবাহী পশুকে যেভাবে দেখা হয়, মনিব কৃষককে সেরূপই দেখিত—কৃষকের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, অধিকার বলিয়া কিছুই তাহার নাই।

কৃষির উৎপাদন ছিল অত্যন্ত নীচু স্তরের। বীজ বুনা কিংবা ফসল কাটা, প্রায়ই ঠিক সময়ে হইত না; কেননা কৃষককে যে কখন কর্ভির কাজে যাইতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। ফসল যাহা কিছু হইত, তাহার বেশীর ভাগই টেক্সরূপে মনিবের ঘরে চলিয়া যাইত। যে বছর খুব ভাল ফসল হয়, সে বছরও আগামী শস্য উঠা পর্যন্ত কৃষকের ঘরের ভাত খাওয়া সম্ভব হইত না; বাড়তি তো দূরের কথা। ফলে সামন্ত প্রথার যুগে দুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। দুর্ভিক্ষের সাথী মহামারী; প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া যাইত।

দুর্ভিক্ষ এবং রোগ ছাড়াও কৃষককে আরও একরকমের অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। প্রতিবেশী মনিবদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। এইসব যুদ্ধের সময়ে কৃষককে টেক্স দিতে হইত উচ্চহারে। এদিকে জমির ও ফসলের তো ক্ষতি হইতই।

সাধারণত কৃষক সকল জমি চাষ করিত না, কিছু জমি পতিত থাকিত। একটা জমি ক্রমাগত কয়েক বছর চাষ করিতে করিতে যখন সে দেখিত যে ফসল আর তেমন হয় না, তখন সে এই জমির চাষ ছাড়িয়া দিত; নূতন জমি আবাদ করিত। এইভাবে মোট জমির তিন ভাগই প্রায় পতিত থাকিত। পরে অবশ্য নূতন রীতি দেখা দেয়। জমির তিনটা ভাগ করা হইত। একটাতে চাষ করা হইত শীতকালীন ফসল, আর একটাতে গ্রীষ্মকালের

ফসল; তৃতীয় অংশ পতিত ফেলিয়া রাখা হইত। এই ব্যবস্থায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী থাকিত; আগেকার চেয়ে এই রীতি অনেক বেশী উন্নত।

ভূস্বামীর এলাকাভুক্ত জায়গাকে বলা হইত ম্যানর। ঠিক মাঝখানটাতে ভূস্বামীর বাড়ি; উহার চারিদিকে ফল, ফুল ও সবজির বাগান। রাস্তার নিকটে ভূস্বামীর পরিচারকদের ঘরবাড়ি—তাহা ছাড়া গোয়াল, আস্তাবল, কামারশালা ইত্যাদি। দক্ষিণ দিকটাতে গ্রাম; কিছুটা দূরে গোচারণভূমি; উহার সংলগ্ন কৃষকের জমি। মনিবের খামারের জমি অপেক্ষাকৃত কম; কেননা বড় আকারে চাষের প্রয়োজন নাই। শস্য বিক্রয় করা যাইত না, সকলেই প্রায় শস্যোৎপাদন করিত। এই রকম অর্থনৈতিক কাঠামোকে বলা হয় সরল অর্থনীতি। কৃষকের উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই মনিবই আত্মসাত করিত।

ম্যানর-অর্থনীতি ছিল স্বপর্যাপ্ত, স্বাবলম্বী। শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থানীয় কারিগরেরাই তৈয়ার করিত। মনিব কিংবা কৃষক বাইরের আমদানি জিনিস কমই ব্যবহার করিত। এইখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়, হস্তশিল্প কৃষি হইতে পৃথক হইয়া যায় নাই।

(২)

সামন্তপ্রভু সুরক্ষিত দুর্গে বাস করিত। কৃষকের বিদ্রোহ ও অন্য সামন্তপ্রভুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যই সুরক্ষিত দুর্গের প্রয়োজন। সামন্তপ্রভুর পক্ষে কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। তবুও কৃষক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহ করিত। বিদ্রোহের শাস্তি ছিল নির্মম।

কৃষককে সকল সময় আজ্ঞাধীন রাখার জন্য ভূস্বামীর সশস্ত্র সৈন্যদল থাকিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূস্বামীদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভূমির মালিক হইলেই সে ক্ষমতারও অধিকারী হয়। ভূস্বামী নিজে একজন প্রথম-শ্রেণীর সৈন্য, নিজেই বিচারক, নিজেই আবার শাসক। এক কথায়, সুবিস্তৃত এলাকার মধ্যে ভূমির মালিক একজন সার্বভৌম অধিপতি।

ভূস্বামীদের মধ্যে উপরনীচও ছিল। সম্পত্তির অনুপাতে তাহাদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য ছিল। সকলের উপর রাজা; তাহার নীচে ডিউক, কাউণ্ট ইত্যাদি; ইহাদের নীচে ভাইকাউণ্ট, ব্যারন। সকলের তলায় নাইট। ইহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সামন্ততন্ত্রের সময়ে ছিল সরল অর্থনীতি; বাণিজ্য-বিনিময় ছিল কম; সুতরাং টাকায় লেনদেন প্রায় ছিল না।

এইরকম অর্থনীতিতে সৈন্যদের টাকায় বেতন দেওয়া সম্ভব হইত না। তাই রাজা তাহার অধীনস্থ বড় লোক বা সামরিক কর্মচারীদের জমি দিত এই শর্তে যে, তাহারা নিজেদের সৈন্য লইয়া রাজাকে যুদ্ধকার্যে সাহায্য করিবে। এই ব্যবস্থার নামই সামন্ততন্ত্র বা ফিউডেলিজম্। 'ফিউড্'* কথাটির অর্থ শর্তাধীনে জমি দান, রাজার নিকট হইতেই যে সকল ভূস্বামী সরাসরি জমি পাইত তাহা নয়; রাজার নিকট হইতে হয়ত ডিউক পাইত; ডিউকের নিকট হইতে ব্যারন; ব্যারনের নিকট হইতে নাইট।

ইহাই ছিল সামন্তরাষ্ট্রের গড়ন।

(৩)

সামন্ততন্ত্রের যুগে চার্চের খুব প্রভাব ছিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—এসব ক্ষেত্রে চার্চেরই ছিল প্রধান অংশ। চার্চই সকলের সেরা ভূস্বামী। চার্চ সম্পত্তির অধিকারী হয় নানা উপায়ে। রাজা এবং অন্যান্য সামন্তরা চার্চকে জমিদান করিত।

১০৩৫ সালের একটি রাজকীয় দানের নমুনার উল্লেখ করিতেছি :

'সকলেই জানুক যে আমি রোমান সম্রাট কনরেড্ এবং আমার মহিষী গিসেলা আমাদের আত্মার মুক্তির জন্য দাস, ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, আবাদী-অনাবাদী জমি, নদী, রাস্তাঘাট, জঙ্গল, মাঠ, গোচারণভূমি প্রভৃতি সহ চার্চকে আটটি গ্রাম দান করিতেছি।'

এরকম দান চার্চ প্রায় সর্বদাই পাইত। এইভাবে চার্চ ধনবান হয়। অন্যভাবেও চার্চের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহের সময় অনেকেই তাহাদের মূল্যবান্ জিনিসপত্র চার্চে গচ্ছিত রাখিত। আবার অনেকে তাহাদের আত্মার স্মৃতিরক্ষার্থে চার্চকে বহু অর্থ দিত।

চার্চ সামন্ত জমিদারদের মতই সাধাবণ কৃষককে চূড়ান্ত শোষণ করিত; চার্চের আয় ছিল নানারকমের। প্রথমত, চার্চ কৃষকের নিকট হইতে 'টাইথ'† আদায় করিত; কৃষকের আয়ের এক-দশমাংশ নিত। চার্চ যে-সব ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিত সেজন্যও কৃষকের দিতে হইত।

ধর্মযাজকেরা অন্যান্য ভূস্বামীদের চেয়ে ভালভাবে জমিদারী চালাইত, কিভাবে বেশী শোষণ করা যায় সে-সব ফন্দী ভাল জানিত। কৃষকের নিকট হইতে ইহারা অন্যদের চেয়ে বেশী শস্য আদায় করিত। চার্চই প্রথম বাজারে শস্য বিক্রয় করে; চার্চের নিজের তত্ত্বাবধানে মঠের মধ্যেই প্রথম বাজার বসে। এখন পরিষ্কারই বুঝা যায় চার্চ কেন ব্যবসা-বাণিজ্যের পোষকতা করিত।

* Feod ; † Tithe

সামন্তপ্রভুদের যুদ্ধের সময়ে চার্চের নির্দেশে সপ্তাহের কোন কোন দিন যুদ্ধকার্য স্থগিত রাখিতে হইত। এইরূপ বিরতির উদ্দেশ্য ব্যবসায়ের সুবিধা।

বৈষয়িক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চার্চের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়িতে থাকে। চার্চ রাজার নিকট হইতে শুল্ক আদায় ও বিচার-আচারের ক্ষমতা লাভ করে। চার্চের কানুন ছিল সুসম্বদ্ধ।

রোমের ধর্মযাজকই হইয়া দাঁড়ায় সকলের চেয়ে ক্ষমতাশালী; চতুর্থ-শতক হইতে তাহাকে বলা হইতে থাকে রোমের পোপ। তাহার সম্পর্কে বলা হয় যে রোমান চার্চের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পিটারের তিনি প্রতিনিধি; পোপের অধীনেই সমগ্র চার্চ সংগঠন কেন্দ্রীভূত হয়। পোপ রাজারাজড়াদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন; সারা পশ্চিম ইওরোপে তিনিই খৃষ্টধর্মের এবং চার্চের প্রধান ব্যক্তি।

অষ্টমশতকে ফ্রাঙ্কদের রাজা পোপকে মধ্য ইটালির শাসনভার দেন; তখন হইতে মধ্য ইটালি হয় পোপেব জমিদারী। লোম্বার্ডদের বিরুদ্ধে পোপ ফ্রাঙ্কদের রাজাকে সাহায্য করেন; উহারই পুরস্কারস্বরূপ তিনি এই জমিদারী পান। ৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের রাজা পিপিন সটের পুত্র চার্লস্-দি-গ্রেটের অভিষেক হয় রোমে; রোমের পোপ তাহাকে সম্রাট ঘোষণা করেন।

এইভাবে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার পর হইতেই রাজনৈতিক প্রাধান্য লইয়া সামন্ত রাজাদের সঙ্গে রোমের পোপদের বিবাদ দেখা দেয়। চার্লস-দি-গ্রেটের মৃত্যুর পর পোপ দাবি করিতে থাকে যে চার্চ সম্পূর্ণ স্বাধীন; চার্চের উপর রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা নাই; ধর্মযাজকদের বিচার হইবে চার্চের আদালতে; রাষ্ট্রের আইন চার্চের আইনের বিরোধী হইতে পারিবে না।

নবম শতকে পোপের ক্ষমতা খুবই বাড়িয়া যায়। সে সময়ে দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর সম্রাট চতুর্থ হেনরী পোপ সপ্তম গ্রেগরীর নিকট পরাভব স্বীকার করেন। গল্প আছে যে, সম্রাট অনুতপ্তের বেশে—খালি পায়ে পোপের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। পোপের ক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে; সামন্ত জগতের উপর ক্যাথলিক চার্চেরই তখন একান্ত প্রভাব। জনসাধারণ পুরাপুরিই চার্চের প্রভাবাধীন। সমাজের চেতনাশক্তির উপর ধর্ম আফিমের মত কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সামন্ত প্রভুদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, অবিরত শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষ, মহামারীর প্রকোপ—এসবের চাপে জন-সাধারণ অপর একটি জগতের কল্পনা করিতে থাকে, যে জগতে তাহারা সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। জনসাধারণের মনের উপর ধর্মের প্রভাবের কারণ ইহাই। ক্যাথলিক চার্চ জনসাধারণকে বুঝাইয়াছে, সুখ ও শান্তি

আশা করা যায় পরের জীবনে অথবা পরলোকে। এইরূপ জীবন পাইতে হইলে এজীবনের দুঃখকষ্ট নীরবে সহিয়া যাইতে হইবে। চার্চ এইরূপ ভাব প্রচার করিয়া সাধারণ লোককে শ্রেণীসংঘর্ষ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম কৃষককে নম্রতা, বাধ্যতা এবং ধৈর্য শিক্ষা দিয়াছে। আত্মার যাহাতে ভাল গতি হয়, সেজন্য উপবাস করিতে হইবে; দেহকে ঐহিক সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে।

ধর্মযাজকেরা নিজেরা কিন্তু পানাহার ও বিলাসব্যসনেই মগ্ন থাকিত।

অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে চার্চ নিজের প্রভাব খাটাইত নানারকমে। চার্চ শিক্ষা দেয়,—যাহারা সম্পত্তি কিংবা অর্থ চার্চের নামে দান করে তাহারা ধর্মানুরক্ত; ঈশ্বরই তাহাদের মনে দানের প্রেরণা যোগায়। সকল পাপ হইতেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব; কোন পাপমোচনের জন্য চার্চকে অর্থদান করিলেই ধর্মযাজকেরা প্রায়শ্চিত্তের বিহিত করে। ইহা হইতেই ইনডাল-জেন্স বিক্রয়ের* রীতি দেখা দেয়।

চার্চ বিজ্ঞানের ধার ধারিত না। অবশ্য সে সময়ে বিজ্ঞানের বিকাশ পাওয়ার মত অবস্থারও সৃষ্টি হয় নাই; উৎপাদনের রীতি ছিল অত্যন্ত নিচুস্তরের। যেটুকু বিজ্ঞান ছিল, তাহাও আবার ধর্মতত্ত্বেরই দাস। ধর্ম-যাজকদের মতে, ধর্মের অনুশাসনের মধ্যেই বিজ্ঞানের স্থান। গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞানের যতটুকু বিকাশ হইয়াছিল, চার্চ মোটেই তাহার আমল দেয় নাই। ধর্মযাজকদের নিকট—একটা সূঁচের অগ্রভাগে কয়জন পরী দাঁড়াইতে পারে—তাহা একটা মস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। চার্চ কখনও শিক্ষার উৎসাহ দিত না। খৃষ্টের উপদেশ সমন্বিত বই-ই একমাত্র পঠনীয; বইও আবার বেশীর ভাগই লেখা হইত লাটিন ভাষায়। খৃষ্টের উপদেশগুলি লাটিনে পাঠ করা হইত; ধর্মোপদেশ শুনিতে হইত সকলকেই, কিন্তু কাহারও কিছুই বুঝার উপায় ছিল না।

এইভাবে চার্চ সর্বদাই ভূস্বামীদের হাতে মস্ত একটা অস্ত্ররূপে কাজ করিয়াছে; চার্চ জনসাধারণকে চলতি রীতিনীতি ও অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে শিখাইয়াছে; সামন্ততন্ত্রের ভূস্বামীরা ধর্মকে শোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে।

(৪)

একাদশ শতক পর্যন্ত ইওরোপে শহর খুব কমই ছিল। সে সময়ে হস্ত-শিল্পেরও তেমন বিকাশ হয় নাই। মৃৎশিল্পী, কামার প্রভৃতি কারিগর ছিল

* Sale of Indulgences.

বটে, কিন্তু তখনও হস্তশিল্প কৃষি হইতে আলাদা হইয়া যায় নাই। একই ব্যক্তি হয়ত কৃষির কাজ করে, আবার হস্তশিল্পেরও কাজ করে।

কিন্তু একাদশ শতক হইতেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে থাকে। ভাল যন্ত্রের ব্যবহার, কাঁচামাল হইতে নানারকম দ্রব্য তৈয়ার—এসকল যত বাড়িতে থাকে ততই নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠার সুযোগ হয়। আগে কৃষক কিংবা মনিবের বাড়িতেই দ্রব্যাদি তৈয়ার হইত; এখন একটা শ্রেণীই গড়িয়া উঠে যাহারা হস্তশিল্পের কাজেই বিশেষজ্ঞ।

কৃষি হইতে হস্তশিল্প পৃথক হইয়া পড়ায় শ্রমবিভাগ দেখা দেয়; সমাজের বিকাশের দিক হইতে ইহা একটা বড়রকমের অগ্রগতি। কেননা বিকাশের এই ধাপটি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে শহর। শহর প্রথমটায় ছিল দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত স্থান। ভূস্বামীরা তাহাদের জমিদারীর এলাকাভুক্ত স্থান প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করিত। ভ্রাম্যমান বণিকেরা এইসব জায়গায় অবস্থান করিত এবং স্থানীয় বাজারে অন্য জায়গার তৈয়ারী পণ্য বিক্রয় করিত। ধীরে ধীরে বণিকেরা স্থায়ীভাবেই এসব স্থানে বাস করিতে থাকে। হস্তশিল্পী-দের জিনিসের চাহিদা এখানেই বেশী, তাই তাহারাও এসব স্থানেই তাহাদের ছোট কারখানা খুলিয়া বসে। ক্ষুদ্র সুরক্ষিত স্থানটি এখন হইয়া দাঁড়ায় যথার্থ শহর।

সামন্তযুগের শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হস্তশিল্প। কারিগর প্রায় সব সময়ই হাতেই কাজ করিত; তাহার যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত সরল। কয়েকশ' বছর ধরিয়া উৎপাদনের রীতি ছিল একইরকম। অবশ্য হাতের কাজে কারিগরের দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। কোন ব্যক্তি যখন কারিগরের কারখানায় শিক্ষানবীশরূপে কাজ করে, সে সময়টাতেই সে হাত পাকাইয়া লয় এবং পুরাপুরি দক্ষতা অর্জন করে। নানারকম শিল্প গড়িয়া উঠায় উৎপাদনে শ্রমবিভাগ দেখা দেয়; কিন্তু কোন একটি কারখানায় কারিগরকেই করিতে হইত আগাগোড়া সকল কাজ; কারখানার অভ্যন্তরে কোনরকম শ্রমবিভাগ ছিল না।

হস্তশিল্পী নিজেই তাহার উৎপাদনের যন্ত্রগুলির মালিক; অনেকসময় কাঁচামালও তাহার নিজেরই থাকিত। অবশ্য খরিদ্দারও কখনো কখনো জিনিসের ফরমাইস্ দেওয়ার সময় কারিগরকে কাঁচামাল সরবরাহ করিত। কারিগর তাহার তৈয়ারী দ্রব্যাদি সোজা খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করিত, কোন মধ্যস্থ দালালের প্রয়োজন হইত না।

সামন্তযুগে কৃষক তাহার উৎপন্ন ফসল নিজেই ব্যবহার করিত এবং কতকাংশ শস্য জমিদারকে দিত। সুতরাং শস্যের বিক্রয় কিংবা বিনিময় হইত না। কিন্তু কারিগর তাহার উৎপাদিত দ্রব্য নিজে ব্যবহার করিত না;

পণ্যরূপে তাহা বাজারে বিক্রয় করিত। সুতরাং শহরের হস্তশিল্পী ছিল একজন স্বাধীন উৎপাদক; কিন্তু হস্তশিল্পের ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্রের উৎপাদনরীতি। কারখানায় থাকিত মালিকের অধীনে শিক্ষানবীশ ও জার্নিম্যান্। কারিগর ইহাদের পুরামাত্রায় শোষণ করিত। কারিগরের অধীনস্থ ব্যক্তিদের স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ।

(৫)

শহরের জীবনে বণিক এবং কারিগরদের সংগঠনগুলির ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রথম সংঘ গড়ে বণিকেরা। এই সংঘকে বলা হইত গিল্ড্। গিল্ডের আবির্ভাব হয় ইংলণ্ডেই প্রথম; চতুর্দশশতকে সারা ইওরোপে গিল্ড সংগঠন ছড়াইয়া পড়ে।

বণিকদের বিভিন্ন দেশে মাল লইয়া যাইতে হইত, রাস্তায় দস্যুর উপদ্রব ছিল। তাই সংঘবদ্ধ হইয়া যাওয়াই ছিল নিরাপদ। প্রথমটায় বণিকেরা সাময়িকভাবে এক এক বারের বাণিজ্যের জন্য এইরূপ সংঘ গড়িত। পরে তাহাই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। সংঘ কখনো কখনো বাণিজ্যযাত্রার সময়ে ভাড়াটে রক্ষীদল সঙ্গে লইত; বণিকেরা যে-সব জমিদারীর মধ্য দিয়া যাইত, সেই সব জমিদারীর সামন্তদের সঙ্গে সংঘ শুল্ক সম্বন্ধে চুক্তি করিত। গোড়ায় সকল বণিকই সংঘে নিজের ইচ্ছামত যোগ দিতে পারিত; কিন্তু পরে তাহা কঠিন হইয়া পড়ে।

সংঘ এখন বণিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করার দিকে নজর দেয়। সকলেই সংঘের সদস্য হইতে পারে না; যাহাদের সম্পত্তি আছে তাহারাই শুধু সদস্য হইতে পারে। সংঘ নানারকম নিয়ম তৈয়ার করে; নানারকম বাধানিষেধ প্রবর্তন কবে। প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য খরিদ-দর ও বিক্রয়-দর ঠিক করিয়া দেয়; ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি দিন স্থির করিয়া দেয়। শুধু অর্থনৈতিকই নয়, গিল্ড অন্য কতকগুলি ব্যবস্থাও প্রবর্তন করে। দস্যু কোনও বণিকের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলে, আগুনে তাহার সম্পত্তি নষ্ট হইলে, অথবা সে পীড়িত হইয়া পড়িলে গিল্ড হইতে তাহাকে সাহায্য দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ব্যাপারেও বণিকদের পক্ষ হইতে গিল্ডই অগ্রণী হইত। সামন্তদের সঙ্গে ট্যাক্স, শুল্ক প্রভৃতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাইত এবং বুঝাপড়া করিত গিল্ডই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপরও গিল্ডের প্রভাব ছিল। গিল্ড উহার সদস্যদের ভদ্র জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিত; আমোদ উৎসবেরও আয়োজন করিত। পরে যখন শহরে স্বাধীন নাগরিক জীবন গড়িয়া উঠে, তখন স্বায়ত্তশাসনের

ব্যাপারে প্রধান অংশ নেয় গিল্ডই। গিল্ডের সাধারণ সভায় সদস্যরা কাউন্সিল গঠন করিত; নির্বাচিত ব্যক্তিরাই কাউন্সিলের সদস্য হইত। তাহা ছাড়া প্রত্যেক গিল্ডেরই থাকিত কয়েকজন নির্বাচিত কর্মচারী।

বণিকদের মত হস্তশিল্পীদেরও সংগঠন ছিল; হস্ত-শিল্পীদের সংগঠন গড়িয়া উঠে অনেক পরে। শিল্পীদের কর্পোরেশন বা সংঘ প্রথম গড়িয়া উঠে ইটালিতে দশম শতকে। শ্রমবিভাগ যতই বাড়িতে থাকে, শিল্পও ততই বাড়িয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের সংঘও হয় নানারকমের। এক একটি শিল্প বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া হয় এক একটি গিল্ড। শুধু কারিগরদেরই নয়, যাহাদের শিল্পের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক নাই তাহারাও সংঘ গড়িত। চিকিৎসক, এমনকি ভিক্ষুকদেরও সংঘ ছিল।

গিল্ডের প্রধান কাজ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে গিল্ড অনেকরকম নিয়ম, অনেকরকম কানুন তৈয়ার করে। সকল কারিগরই যেন সমান সুযোগ পায়, সেজন্য গিল্ড উৎপাদনের প্রত্যেক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিত। প্রত্যেক কারিগরকেই কাঁচামাল কিনিতে হইত বাজারে, অন্য কোথাও কিনিতে পারিত না। কারিগর কাঁচামাল কিনিয়া অন্য কাহারও নিকট পুনরায় বিক্রয় করিতে পারিত না: নিজেরই তাহা ব্যবহার করিতে হইত। কারিগরকে পাকামাল বিক্রয় করিতে হইত নির্দিষ্ট কতকগুলি দিনে; গিল্ড বিক্রয়ের সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিত। কেহ অন্য দোকান হইতে খরিদ্দার ডাকিয়া আনিতে পারিত না; কোন কারিগরই খরিদ্দারের নিকট নিজের দোকানের তৈয়ারী জিনিসের প্রশংসা করিতে পারিত না। কোন কারিগরেরই একটির বেশী কারখানা বা দোকান রাখা নিষেধ ছিল; যন্ত্রপাতিও সীমাবদ্ধ ছিল। জার্নিম্যান এবং শিক্ষানবীশ নিয়োগ সম্পর্কে সকল কারিগরকেই গিল্ডের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। ইহাদের মজুরির হার পরিবর্তন করিতে পারিত একমাত্র গিল্ডই।

গিল্ডের নিয়ম ভঙ্গ করিলে মাল বাজেয়াপ্ত করা হইত এবং জরিমানা করা হইত। গিল্ড যে শুধু গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কারিগরদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে ব্যস্ত থাকিত তাহা নয়, বাহিরের প্রতিযোগিতাও নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। গিল্ডের পিছনে সামন্ত প্রভুদের সমর্থন থাকিত, এই জোরেই গিল্ড বাহিরের কাহাকেও হস্তশিল্পের দোকান খুলিতে বা হস্তশিল্পের কাজ করিতে দিত না। ধীরে ধীরে গিল্ড নিজেদের সদস্য-সংখ্যাও কমাইতে থাকে।

গিল্ডের প্রধান কাজ ছিল পরস্পরের সম্বন্ধ ও সামন্তপ্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা। গিল্ডই কারিগরদের নিকট হইতে ট্যেক্স আদায় করিয়া সামন্ত-প্রভুর পাওনা চুকাইয়া দিত। বণিকসংঘগুলির মতই কারিগরদের সংঘও

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। গিল্ড শুধু স্বাধীন কারিগরদের স্বার্থই দেখিত, জার্নিম্যান কিংবা শিক্ষানবীশের স্বার্থ এবং অধিকারের দিকে তত নজর দিত না।

(৬)

শহর শিল্প এবং ব্যবসায়ের কেন্দ্র। যে জমিদারের অধীনে শহর বেশী, কর এবং শুল্কে হইতে তাহার আদায়ও বেশী। ব্যবসায়ীরা যে মুনাফা করে, তাহার সবটুকু হাত করার দিকেই তাহার লোভ। সুতরাং করের উপর কর চাপানোই থাকে তাহার চেষ্টা। বাণিজ্যের প্রসার ও বৃদ্ধির পথে জমিদারের এই লোভ খুব বড় অন্তরায়। একটা এলাকার সীমা অতিক্রম করাতেই ট্যেক্স; নদীর উপর দিয়া মাল লইয়া যাওয়ার জন্য ট্যেক্স—এইরকম নূতন নূতন উদ্ভাবনের অন্ত নাই। বণিকের মালবোঝাই গাড়ি রাস্তার ধুলা উড়াইয়া যায়, সেজন্যও বণিককে ট্যেক্স দিতে হইত।

অত্যাচার হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য বণিকেরা অনেকসময়ই শহরকে জমিদারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিত। লেইনস্* শহরের ইতিহাস এখানে উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে এই শহরটি একাদশ শতকে খুব সমৃদ্ধ ছিল। শহরটি একজন বিশপের। তাহার অত্যাচার এত অসহনীয় হইয়া দাঁড়ায় যে নাগরিকেরা শহর কিনিয়া লইতে চায়। যথেষ্ট মূল্য দিয়া বিশপের নিকট হইতে শহরবাসীরা শহরটি কিনিয়া লয়। শুধু পাদ্রীকেই নয়, রাজাকেও তাহারা যথেষ্ট টাকা দেয়।

কয়েকবছর পর বিশপ শর্ত ভঙ্গ করিয়া শহরের দখল লইতে যায়। তখন শহরের বণিক, কারিগর ও অন্যান্য অধিবাসীরা রাজাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে বন্দোবস্ত লয়। বিশপ রাজাকে আরও বেশী টাকা দিয়া হাত করে; শহর দখল করিতে গেলে নাগরিকেরা তাহাকে বাধা দেয়। উভয় পক্ষে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়; বিশপ এই যুদ্ধে মারা যায় এবং কিছুদিনের জন্য নাগরিকেরাই শহর দখল করিয়া রাখে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাহারা হারিয়া যায়; রাজা নাগরিকদের নির্মম শাস্তি দেয়।

লেইন্‌স্ শহরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে ধারণা করিতে পারি।

---

* Lannes

সামন্তযুগে শিল্প ও বাণিজ্য

(১)

রোমের সাম্রাজ্য ভাঙিগয়া যাওয়ার পরে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্টাণ্টিনোপলই হইয়া দাঁড়ায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। গ্রীস, এশিয়ামাইনর, মিশর, এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সবগুলি দেশই বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতকে ইটালির কতক অংশও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য সামন্ততন্ত্রের রীতিতে শাসিত হইত। কিন্তু পণ্য বিক্রয় এবং টাকায় লেনদেনের দরুন এখানে পশ্চিম ইওরোপের চেয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ছিল।

কনস্টাণ্টিনোপলের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ উহার ভৌগোলিক অবস্থান। কনস্টাণ্টিনোপল পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য পথগুলির সঙ্গমস্থল, আবার কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার। সকলদেশের বণিকেরাই এখানে ভিড় করিত। ইওরোপের বণিকদের বাইজেণ্টাইন রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া প্রাচ্যের দেশগুলিতে যাইতে দেওয়া হইত না। কনস্টাণ্টিনোপল হইতেই তাহাদের প্রাচ্যের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইত। কনস্টাণ্টিনোপলের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি প্রতিবেশীদের মনে লোভের সঞ্চার করে। তাই প্রায়ই এই শহরের উপর আক্রমণ হইত; কিন্তু এই সব আক্রমণ প্রতিরোধ করা বাইজেণ্টাইন রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নাই। উত্তরে বুলগার এবং স্লাভ, পূবে পারসীক, আরব এবং তুর্কীরা সাম্রাজ্যের শত্রু। যাহাই হউক, প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে দক্ষিণপশ্চিম ইওরোপের বাণিজ্য অনেকদিন যাবতই বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু আরবেরা এবং ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকেরা স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে থাকে।

প্রাচ্যের বণিকেরা আরবের মধ্যদিয়া স্থলপথে উটের পিঠে করিয়া মাল চালান দিত। আরবের গুরুত্ব তাই বাড়িয়া যায়। সপ্তম শতকে আরবদেশে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বদলে সামন্তপ্রথার প্রবর্তন হয়। বণিকবৃত্তিই হইয়া দাঁড়ায় আরবদের প্রধান পেশা। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হয় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের। আরবের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র মক্কার চতুর্দিকে সমস্ত আরবজাতিগুলি সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। আরবের মধ্য দিয়া যে সমস্ত

বাণিজ্যপথ গিয়াছে, সেগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার ও দখল লওয়ার জন্য ইহারা সচেষ্ট হয়। অনেকগুলি যুদ্ধের পরে আরবের সীমার মধ্যে আরবজাতিগুলি তাহাদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

এই সময়ে ইসলামের আবির্ভাব হইয়াছে। ইসলামের পতাকাতলে আরবেরা সপ্তম শতকে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হয়। বাণিজ্যপথগুলি তাহাদের হাতে আসে, বহুদেশ তাহারা লুণ্ঠন করে। খলিফার অধীনে বিরাট রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র ডামাস্কাস্ শহর খলিফার রাজধানী। খলিফা আমীর ও উজীরদের উপর বিজিত দেশগুলির শাসনভার ন্যস্ত করেন। ধীরে ধীরে স্থানীয় কৃষকেরা ভূমিদাসে পরিণত হয়।

আরবের বণিকেরা পূব ও পশ্চিমের দূর বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। বাণিজ্যপথগুলির উপর এখন উহাদের সম্পূর্ণ দখল। কিন্তু অষ্টম শতকের দিকে খালিফত্ ভাঙিয়া যায়। একে একে মিশর, পারশ্য প্রভৃতি দেশ সাম্রাজ্য হইতে খসিয়া পড়ে। অবশেষে, তুর্কীরা আরবদেশ জয় করে।

আরবদের রাজনৈতিক পতন হইলেও সংস্কৃতির দিক হইতে তাহারা অনেক উচ্চে ছিল। গ্রীক এবং রোমান সংস্কৃতির অনেক কিছুই ইহারা গ্রহণ করে; নিজেদের বিস্ময়কর সৃজনী প্রতিভাদ্বারা শুধু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়, গণিত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানও গড়িয়া তোলে। আরবের রাষ্ট্রশক্তির পতন হইলেও উহার ব্যবসায়গত প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দিকটাতে আরবের বণিকেরাই ছিল প্রধান; এই অঞ্চল হইতে আরবের সাংস্কৃতিক প্রভাব ইওরোপে বিস্তার লাভ করে।

(২)

আরবদের পরাজিত করিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে তুর্কীরাই এখন প্রাধান্য বিস্তার করে। প্যালেস্টাইনও তুর্কীদের দখলে। প্যালেস্টাইনের পথেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য হয়। সুতরাং বাণিজ্যপথগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার লইয়া তুরস্কের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেশগুলির সংঘর্ষ বাঁধে। বাইজেণ্টাইন রাষ্ট্র তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইওরোপের দেশগুলির সাহায্য চায়। ইওরোপের খৃষ্টানেরা বিধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এই ধর্মযুদ্ধকে বলা হয় ক্রুসেড্। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মযুদ্ধ বাইরের একটা আবরণ। ইটালির উন্নতিশীল শহরগুলির বণিকেরাই ক্রুসেডের যথার্থ সংগঠক। প্রাচ্যের বাণিজ্যপথগুলি হাত করা এবং বিজিত দেশ লুণ্ঠন করাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সামন্ত অভিজাতদেরও ছিল লুণ্ঠনের মতলব। রোমান ক্যাথলিক চার্চের দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই, তাহা

ছাড়া চার্চ প্রাচ্যের খৃষ্টানদের উপর পোপের আধিপত্যও চাহিত। পোপ সারা ইওরোপ হইতে সৈন্যদল সংগ্রহের জন্য অগ্রণী হন। বিধর্মী মুসলমানেরা জেরুজালেম প্রভৃতি খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলি দখল করিয়াছে, সেগুলি উদ্ধারের জন্য খৃষ্টানদের তিনি উত্তেজিত করিতে থাকেন। পোপের প্রচারে প্ররোচিত হইয়া খৃষ্টানেরা দলে দলে জেহাদে যোগ দেয়। চার্চের আহ্বানে সারা ইওরোপের জনসাধারণ অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। পোপ ঘোষণা করেন, যাহারা ধর্মযুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবে তাহাদের স্থান জাহান্নামে, যাহারা যুদ্ধে নিহত হইবে তাহারা স্বর্গরাজ্য লাভ করিবে। তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ লুণ্ঠন ও দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষা ঢাকিয়া রাখার জন্য ধর্মের নামে যুদ্ধের ডাক দেওয়া দরকার হয়। এইভাবে চার্চের ক্রস, সৈনিকের তলোয়ার এবং বণিকের থলিয়া একত্র মিলিয়া তথাকথিত ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হয়।

প্রায় দুইশ'-বছর ব্যাপিয়া এই ধর্মযুদ্ধ চলে: প্রথম ক্রুসেড্ আরম্ভ হয় ১০৯৫ সালে। এক লক্ষ অশ্বারোহী ও ছয় লক্ষ পদাতিক এই ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে। ইটালীয়ান, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সৈন্যরা নানা-পথে অগ্রসর হইয়া কনস্টান্টিনোপলে সমবেত হয়। তথা হইতে তাহারা পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়। সুরক্ষিত এণ্টিয়োক শহর খৃষ্টান সৈন্যরা দখল করে। এই সুসমৃদ্ধ শহর লুণ্ঠিত হয় এবং বহুলোক নিহত হয়। প্রথম ক্রুসেডের সময়ে এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশ খৃষ্টানদের দখলে আসে। পশ্চিম ইওরোপের নমুনায় এখানে কয়েকটি সামন্ত রাজ্য স্থাপন করা হয়। অনেক খৃষ্টান 'নাইট' এখানে থাকিয়া যায়। কৃষককে ইহারা নির্মম-ভাবে শোষণ করিতে থাকে। উটের ক্যারাভান লুঠ ইহাদের অপর একটা বড় কাজ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই লুঠের মাল লইয়া নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যায়।

প্রথম ক্রুসেডে লাভ হয় সবচেয়ে বেশী ইটালীয়ানদের। ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহরের বণিকেরা যুদ্ধের কাজে তাহাদের জাহাজ ব্যবহার করিতে দেয়; সুতরাং এইসব জাহাজে যে মাল আসিত তাহার প্রধান অংশই আত্মসাত করিত ইটালীয় বণিকেরা। খৃষ্টানদের বিজয় স্থায়ী হয় নাই। তুর্কীরা ধীরে ধীরে একটির পর একটি দেশ দখলে আনিতে সমর্থ হয়। যাহা হউক প্রথম ধর্মযুদ্ধের পর আরও কয়েকটি ধর্মযুদ্ধ হয়। ক্রুসেডাররা যে শুধু-মাত্র মুসলমানদের অধিকৃত দেশই লুণ্ঠন করিত তাহা নয়, খৃষ্টানদের দেশও বাদ দিত না। বাইজেণ্টাইন রাষ্ট্রের উপর দিয়া ক্রুসেডারদের পথ; সুতরাং এই সমৃদ্ধরাজ্যকে উহারা লুণ্ঠন করিতে ছাড়ে নাই। ক্রুসেডাররা প্রত্যক্ষভাবেই একবার কনস্টাণ্টিনোপল আক্রমণ করে। এই আক্রমণ সংগঠন করে ভেনিসের

বণিকেরা। কনস্টান্টিনোপলের ব্যবসায়গত প্রধান্য নষ্ট করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধারা চার্চ প্রভৃতি পুড়াইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি লুঠ করে।

ক্রুসেডের অভিযান শেষ হয় তের শতকের শেষের দিকে। খৃষ্টানেরা প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। ক্রুসেডের ফলে উত্তর ইটালির শহরগুলি প্রভূত সম্পত্তি হাত করে। বণিক, সামন্তপ্রভু, পোপ প্রভৃতি ক্রুসেডের সংগঠকেরা প্রচুর লুণ্ঠিত ধনের অধিকারী হয়। জাহাজ-বোঝাই লুণ্ঠিত ধন প্রাচ্যদেশ হইতে ইওরোপে আসে। দামী মশলা, মূল্যবান পাথর, সোনা, সিল্ক, হাতীর দাঁতের জিনিস এবং অন্যান্য বিলাস দ্রব্যে ইওরোপ ছাইয়া যায়। ক্রুসেডের ফলে, ইটালির শহরগুলিই যে ফাঁপিয়া উঠে তাহা নয়,—সাবা পশ্চিম ইওরোপেই শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়। প্রাচ্যের মূল্যবান জিনিসপত্র এবং কাঁচামাল আমদানি হওয়ায় ইওরোপে সম্পূর্ণ নূতন শিল্প গড়িয়া উঠার সুবিধা হয়। সিল্ক, কার্পেট, মখমল, কাঁচের গ্লাস প্রভৃতি তৈয়ার হইতে থাকে। এদিকে প্রাচ্যের বাজারে ইওরোপের বস্ত্র চালান দেওয়ার সুবিধা হয়।

ক্রুসেডের ফলে ইওরোপে টাকায় ব্যাপকভাবে বিনিময়ের কাজ সুরু হয়। ক্রুসেডের দৌলতে ইওরোপের দেশগুলি সোনা এবং রূপায় ছাইয়া যায়। শহরে এখন টাকায় ছাড়া লেনদেনের কাজ হয় না। গ্রামেও টাকার চল হইয়াছে। টাকায়ই এখন কেনাবেচা হয়। সামন্তরাজা ও অন্যান্য সামন্তপ্রভুদের এখন নূতন রুচি জন্মিয়াছে। নূতন নূতন প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে। ম্যানর অর্থ-নীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এখন আর তাহারা আবদ্ধ থাকিতে চায় না। প্রাচ্যের বিলাসের জীবনের তাহারা আস্বাদ পাইয়াছে। তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী বদলাইয়া যায়। প্রাচ্য হইতে তাহারা নূতন নূতন অস্ত্র আনিয়াছে, খুব দামী বস্ত্রাদি এখন তাহারা ব্যবহার করে। তাহাদের দুর্গ এখন শুধু সুরক্ষিতই নয়, সুসজ্জিত। টাকা হইলেই রুচি অনুযায়ী জিনিস পাওয়া যায়। তাই ইহারা ফসলের বদলে টাকায় খাজনা এবং ট্যাক্স দাবি করিতে থাকে। টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষকের এখন শস্যাদি লইয়া বাজারে যাওয়ার দরকার হয়।

(৩)

ক্রুসেডের সময়ে এবং পরবর্তী কয়েক শতকে উত্তর-পশ্চিম ইওরোপে বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। বড় বড় রাস্তার উপরে অথবা বড় নদীর তীরে মেলা বসিত। দূরদেশ হইতেও এইসব মেলায় নানারকমের দ্রব্যাদি আসিত।

তের এবং চৌদ্দ শতকে জার্মানির সমুদ্রতীরে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বাড়িয়া যায়। জার্মানির মধ্য দিয়া অনেকগুলি নদী উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরে পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাইন নদী; এই নদী পশ্চিম ইওরোপের উত্তর ও দক্ষিণের জিলাগুলির মধ্যে যোগাযোগের প্রধান বাহন। এখানে অনেকগুলি ছোট বড় বন্দর গড়িয়া উঠে। এইসব বন্দরে প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে আসিত পশম, চামড়া, মশলা, লবণ, কাঠ এবং অন্যান্য পণ্য; কাপড় আমদানি হইত ইওরোপের বিভিন্ন অংশ হইতে।

বাণিজ্যের ব্যাপারে জার্মানিরই এসময়ে প্রধান স্থান। উত্তর সাগরে ও বাল্টিক সাগরে জার্মানির বণিকদের প্রাধান্য; জার্মান বণিকেরা ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশেও কতকগুলি বিশেষ অধিকার পায়। কিন্তু চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই জার্মান শহরগুলির অবনতি হইতে থাকে। ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকদের প্রতিযোগিতাই ইহার কারণ। বাহিরের প্রতিযোগিতা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে জার্মান শহরগুলি জোট বাঁধে এবং সংঘ গঠন করে। এই সংঘগুলির নাম 'হেনসাস্'*। বিভিন্ন সংঘগুলি পরে একটি বৃহত্তর সংঘে পরিণত হয়। ১৩৫৬ সনে জার্মানিতে হেনসিয়াটিক লীগ গঠিত হয়। এই সময়ে জার্মান শহরগুলির একটি কংগ্রেসও ডাকা হয়।

লীগের অন্তর্ভুক্ত ছিল নব্বইটি শহর। শহরগুলির এত উন্নতি হয় যে বণিকেরা তাহাদের জীবনযাত্রার রীতিই বদলাইয়া দেয়। ধনবান বণিকেরা বড় বড় বাড়ি এমনকি দুর্গও তৈয়ার করিতে থাকে। ইহাদের বিলাসিতা ও জাঁকজমকের অন্ত নাই। সৌষ্ঠব ও পারিপাট্যের অভিনবত্বে জার্মান শহরগুলির এখন সম্পূর্ণ নূতন চেহারা। বণিক ব্যবসায়ীরা জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে থাকে; উহারা এখন প্রায় অভিজাততন্ত্রের কাছাকাছি। পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ এবং আহার-বিহারে ইহারা সম্পূর্ণ নূতন একটা শ্রেণী।

হেনসিয়াটিক লীগ যে শুধু একটি অর্থনৈতিক শক্তিই ছিল তাহা নয়, রাজনৈতিক দিক হইতেও উহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। অবরোধের ভয় দেখাইয়া লীগ ফ্ল্যাণ্ডার্সের নিকট হইতে জার্মান বণিকদের জন্য বাণিজ্যের বিশেষ অধিকার আদায় করে। ডেনমার্ক প্রভৃতি কতকগুলি দেশের সঙ্গেও এইরূপ বিরোধ বাধে। এই বিরোধ যুদ্ধে পরিণত হয়। লীগেরই জয় হয়; বাণিজ্যের সুবিধা আদায় ছাড়াও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কতকগুলি দুর্গ জার্মানেরা হাত করে।

---

* Hansas

লীগের গুরুত্ব অবশ্য বাড়িতে থাকে, কিন্তু উহার অন্তর্ভুক্ত শহরগুলির মধ্যেই ক্রমে বিরোধের সূচনা দেখা দেয়। পূর্বের ও পশ্চিমের শহরগুলির মধ্যেই খুব তীব্র বিরোধ হয়। জার্মানিতে ইংলন্ডের বস্ত্র আমদানি লইয়াই বিরোধের সৃষ্টি।. শেষপর্যন্ত হেনসিয়াটিক লীগে ভাঙ্গন দেখা দেয়; লীগও দুর্বল হইয়া পড়ে।

সামন্তযুগে শ্রেণীসংগ্রাম

(১)

তের শতকের শেষের দিকে ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয়। সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলিতে কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। চাহিদা শুধু খাদ্যশস্যের নয়, কাঁচামালেরও। ফলে, শহরের বাজারগুলিতে কৃষিপণ্যের প্রচুর আমদানি হইতে থাকে। বিক্রেতা অধিকাংশই ভূস্বামী ও কৃষক। কৃষক পণ্য বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, সবটাই প্রায় চলিয়া যায় ভূস্বামীর হাতে।

সিল্ক, মখমল, মদ, মসৃণ অস্ত্রাদি সবই এখন বাজারে পাওয়া যায়; এসব ক্রয় করার জন্য সামন্ত প্রভুর টাকার দরকার। ভূস্বামীরা কৃষকদের খাজনা বাড়াইয়া দেয়। তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত কৃষিপণ্য ইহারা বাজারে পাঠায় এবং টাকা হাত করিয়া বিলাসের দ্রব্যাদি ক্রয় করে। কৃষককে হয়ত উপবাসে থাকিতে হয়; কিন্তু ভূস্বামীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা না মিটাইয়া উপায় নাই। পরে ভূস্বামীরা কৃষকের নিকট শস্যের বদলে টাকাই দাবি করিতে থাকে। টাকা হাতে পাইতে হইলে শস্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই; কৃষক তাহাই করিতে থাকে।

ভূস্বামীর প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং খাজনার হার তাহারা ক্রমেই বাড়াইতে থাকে। কিন্তু কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না; তখনকার উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়ানোর কোন সুযোগ নাই। ভূস্বামীরা আয় বৃদ্ধির নূতন পথ বাহির করে। কৃষকদের যৌথ-জমি হাত করিয়া নিজেদের দখলের জমি বাড়াইয়া লয় এবং কর্ভি প্রথায় ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলকভাবে বেশী সময় খাটাইয়া বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাদন করাইতে থাকে।

তাহা ছাড়া ভূস্বামীরা নগদ টাকার বদলে ভূমিদাসকে স্বাধীনতা দেওয়া লাভজনক মনে করে। অনেক কৃষকই এইভাবে মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকেরই স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য করার সঙ্গতি নাই। তাই বহু কৃষকই সামান্য মজুরিতে ভূস্বামীর জমিতে ভাড়াটে শ্রমিকরূপে খাটিতে থাকে। মজুরিরও আবার বেশী অংশই টেক্সরূপে ভূস্বামীর হাতেই চলিয়া আসে।

ভূমিদাসেরা স্বাধীনতা পাইয়াও জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে যেসব জমি খালাস হয় সেগুলি ভূস্বামী আত্মসাত করে; এবং ভাড়াটে হিসাবে কৃষকদের সেখানে খাটায়।

ফরাসীদেশে ভূস্বামীরা কৃষকের স্বাধীনতার জন্য খুব উচ্চমূল্য দাবি করিত। এতটাকা দেওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেক সময়ই কৃষকেরা তাহা দিতে চাহিত না। কিন্তু ভূস্বামীর টাকার প্রয়োজন, কৃষককে তাহারা টাকা দিতে বাধ্য করিত। উচ্চমূল্য দিয়া স্বাধীনতা ক্রয় করিলেও প্রায়ই দেখা যাইত যে জমির উপর কৃষকের প্রকৃতপক্ষে স্বত্ব নাই। জমিদারই জমির মালিক রহিয়া গিয়াছে; কৃষককে কতকগুলি শর্তে জমি চাষ করিতে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। প্রধান শর্ত,—উচ্চহারে টেক্স দিতে হইবে, মনিবের নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ করিয়া দিতে হইবে। বাজারে শস্য বিক্রয় করার সময়েও কৃষককে অনেকগুলি অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ভূস্বামীর লোকেরা নূতন নূতন টেক্স আদায়ের জন্য জুলুম করিত।

চৌদ্দ শতকে কৃষকের জীবনে চরম দুর্গতি দেখা দেয়। মনিব ভূমিদাসকে মুক্তি দিয়া স্বাধীন কৃষকের মর্যাদা দিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুর্দশা বাড়াইয়া তুলিয়া পুনরায় তাহাকে ভূমিদাসই হইতে বাধ্য করিল। কৃষকেরা জমি ছাড়িয়া অনেকেই চলিয়া যায় শহরে। মজুর দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এদিকে সারা ইওরোপময় মহামারীতে বহুলোক মারা যায়; মৃতের সংখ্যা দুই কোটির মত। এই অবস্থায় কৃষির কাজ একরকম বন্ধই হইয়া যায়। এদিকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধই ইতিহাসে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ নামে খ্যাত। মহামারী, উচ্চহারে টেক্স, যুদ্ধ, লুণ্ঠন প্রভৃতির দরুন কৃষির কাজ অচল হইয়া পড়ে।

জমি চাষের জন্য মনিবেরা আবার ভূমিদাস প্রথাই চালু করে। এইরকম অবস্থা কৃষকের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে। খোদ প্যারী শহরের নিকটে ১৩৫৮ সনে কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহকে বলা হয় জেকুয়ারী* বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধমান ইংরেজ এবং ফরাসী একমত হইয়া কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখে।

এদিকে প্যারিসের নাগরিকেরাও বণিক মার্শেলের† নেতৃত্বে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মার্শেল কারিগর এবং বণিকদের অস্ত্রসজ্জিত করিয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। শহরের এবং গ্রামের বিদ্রোহ তখন এক হইয়া যায় এবং একই খাতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পরিশেষে ভূস্বামীদেরই জয় হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন ছিল তাহারাই

---

* Jacquerrie ; † Marcelle

কৃষক ও কারিগরদের ছাড়িয়া শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে যোগ দেয়। ইহাই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ। যাহা হউক, কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করা আর সম্ভব হয় নাই। চৌদ্দ শতকের শেষ দিক হইতে ভূমিদাসদের স্বাধীনতা দেওয়ার কাজ সুরু হয়।

ফ্রান্সের কৃষক ও কারিগরদের বিদ্রোহের পঁচিশ বছর পরে ইংলণ্ডে কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। ব্যবসায়ের বিকাশ হওয়ায় ভূস্বামীরা কৃষকের নিকট টাকায় খাজনা দাবি করিতে থাকে। ভূস্বামীরা মজুর ভাড়া করে এবং জমিতে খাটায়। মজুরদের খাটানো যায় বেশী। ভূমিদাস খাটানোর ব্যাপারে কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও বাধানিষেধ মানিতে হয়। ভূস্বামীরা যে-সব জমি চাষ করাইত না সেগুলি ইজারা দিত। ইজারার জন্য তাহারা খাজনা লইত খুবই বেশী। এদিকে ভূস্বামীরা ছোট ছোট কৃষকদের জমিও গ্রাস করিতে থাকে। যৌথ ভূমি হইতে জমি লইয়া তাহারা উহার চারিদিকে বেড়া দেয়। এইরূপ জমির তাই নাম হয় 'এন্‌ক্লোজার'*। বড় কৃষকেরাও মনিবদের পথানুসরণ করিতে থাকে।

ইওরোপব্যাপী প্লেগের আক্রমণের পর ইংলণ্ডে সমস্ত জিনিসেরই দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। এমন কি কৃষিমজুরের মজুরিও বাড়ে। জমির দামই শুধু কম। জমি প্রচুর পরিমাণে নিজের দখলে লইয়া ভূস্বামী তাহা চাষ করাইতে পারে, কিন্তু কৃষিমজুরের অভাব। মজুরের সংখ্যা কম, সুতরাং তাহাদের মজুরিও অত্যধিক। ভূস্বামীরা রাজার নিকট হইতে নির্দেশ বাহির করাইল—প্লেগের পূর্বে যে মজুরি ছিল, কোন মজুরই তাহার বেশী লইতে পারিবে না। এদিকে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ; প্রত্যেকটি মাথার উপর নূতন টেক্স† ধার্য হইল। অত্যাচারের চাপ কৃষকের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে। তাহারা দাবি জানায়,—দাস প্রথা ও কর্ভি রহিত করিতে হইবে। প্লেগের পূর্বের হারের মজুরি দেওয়ার আইন বাতিল করিতে হইবে। যৌথ-জমির যে-সব অংশ ভূস্বামীরা আত্মসাত করিয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত দাবির উপরে কৃষকেরা বিদ্রোহ করে।

কৃষকদের বিদ্রোহেব ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে এবং বিদ্রোহকে বাড়াইয়া দিতে বড় অংশ নেয় ললার্ড সম্প্রদায়‡। ইংলণ্ডে পশম শিল্পের কেন্দ্র নরফোকেই ছিল ললার্ডেরা বিশেষ শক্তিশালী। শহরের কারিগর ও মজুরদের দাবি-দাওয়া লইয়াই ইহারা আন্দোলন করিত। লেখায় এবং বক্তৃতায় ইহারা ব্যক্তিগত বিত্ত ও ধনের অসমতার বিরুদ্ধে প্রচার করিত। ললার্ড সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমান প্রচারকদের বক্তৃতায় এবং আন্দোলনে গরীব কৃষক ও ভাড়াটে

* Enclosure ; † Poll Tax ; ‡ Lollards

মজুরেরা উদ্বুদ্ধ হয়। ললার্ডরা প্রশ্ন করিত, "ইভ যখন সুতা কাটিত এবং এডাম মাটি খুঁড়িত—তখন আবার ভদ্রলোক ছিল কে?"

১৩৮১ সনে বিদ্রোহ সুরু হয় একই সঙ্গে অনেক জায়গায়। ওয়াট টাইলর নামে একজন কারিগর বিদ্রোহের নেতা। সামরিক কাজে তিনি আগেই হাত পাকান। হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষক ভূস্বামীদের ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করিয়া লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শহরের গরীবেরা কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা চতুর্দিক হইতে অগ্রসর হইয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠে সমবেত হয়। রাজার নিকট হইতে তাহাদের দাবি সম্পর্কে জবাব লওয়াই ছিল বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য। রাজা জর্জ লণ্ডন ছাড়িয়া চলিয়া যান। অবস্থা এরকম চরমে উঠে যে রাজা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের নেতাদের নিকট আপসের প্রস্তাব পাঠান এবং তাহাদের দাবি মিটানোর অঙ্গীকার দেন। রাজার আশ্বাস পাইয়া অনেক কৃষকই নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া যায়। তখন সুযোগ বুঝিয়া রাজা কৃষকদের আক্রমণ করেন। ওয়াট টাইলর নিহত হন। সামন্ত-প্রভু, ভূস্বামী এবং অন্যান্য বড় লোকেরা তখন পুরাশক্তি সমাবেশ করিয়া বিদ্রোহ দমন করে এবং নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কৃষকেরা একটা প্রচণ্ড সামাজিক শক্তি। ভূমিদাস প্রথা আর ইংলণ্ডে পুনঃপ্রবর্তিত হইতে পারিল না। এই ব্যর্থতার কারণ কি?

কৃষকেরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে, সুতরাং সংগ্রামের সময় সংঘবদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন। ইংলণ্ডে এবং কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সে কৃষকদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছে কারিগর শ্রেণী; তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নেতা বাহির হয় নাই। কৃষকদের মধ্যে অনেকগুলি স্তর রহিয়াছে, সকলের স্বার্থ সমান নয়। তাই সংগ্রামের সময়ে একতার অভাব হয়। এদিকে কৃষকদের অস্ত্র ছিল না, সামরিক কার্যে তাহাদের অভিজ্ঞতা নাই। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা বিশেষ কিছু ছিল না। বিদ্রোহের পন্থা সম্পর্কেও তাহাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না।

(২)

ক্রুসেডের এবং হেনসিয়াটিক লীগের সময়ে ইওরোপে বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার কারণ শিল্পের বিকাশ। শিল্পজাত পণ্যই দেশবিদেশের বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। শিল্পকে অবলম্বন করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করিত তাহাদের সংখ্যা এসময়ে খুব বাড়িয়া যায়। শহরেই শিল্পের বিকাশ হয় বেশী। বহুরকমের শিল্পের আবির্ভাব হয়, সুতরাং শিল্পীদের শ্রেণী

গড়িয়া উঠে অনেকগুলি। এক কথায় শিল্পে শ্রমবিভাগ পূর্বের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মতর হয়। শিল্পের যখন আরও বিকাশ হয়, তখন বিভিন্ন জায়গার মধ্যে শ্রমবিভাগ দেখা দেয়। একজায়গায় হয়ত শুধু কাপড়ই তৈয়ার হয়, অন্য জায়গায় শুধু সিল্ক। ব্যবসায়ীরা একজায়গার জিনিস অন্য জায়গায় ছড়াইয়া দেয়। বাণিজ্যের এবং শিল্পের বিকাশ অনেকটা সমান্তরাল। একটি অপরটিকে আগাইয়া দেয়।

সে সময়ে ইটালির ভেনিস, জেনোয়া এবং ফ্লোরেন্সই শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ উন্নত। ক্রুসেডের সময়ে উহারা বাণিজ্যের যে সুবিধা পাইয়াছিল, তাহাই উহাদের উন্নতির মূলে। শিল্পের চেয়েও বাণিজ্যেই তাহারা বেশী লাভবান্ হয়। শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফ্লোরেন্স; বস্ত্র শিল্পের জন্যই ফ্লোরেন্স প্রসিদ্ধ। শুধু ইটালির বিভিন্ন স্থানেই নয়, জার্মানি এবং প্রাচ্যের কোন কোন দেশেও ফ্লোরেন্সের বস্ত্র রপ্তানি হইত। কারিগরের ক্ষুদ্র কারখানায় তৈয়ারী বস্ত্রে দেশবিদেশের চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়, তাই ফ্লোরেন্সের শিল্পপতি ও বণিকেরা উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

বস্ত্র উৎপাদন ছিল কর্পোরেশনের হাতে। কিন্তু কর্পোরেশন বণিকদের; শিল্পীদের নয়। ইহারাই কারখানাগুলিকে কাঁচামাল যোগাইত। কারখানায় শিক্ষানবীশ এবং জার্নিম্যানদের উপরই চাপ ছিল বেশী, প্রায় সারাদিনই তাহাদের খাটিতে হইত। অতিরিক্ত শ্রমিকও ভাড়া করা হইত; ইহাদের খাটুনি ছিল আরও বেশী। শোষকশ্রেণীর ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে বটে, কিন্তু শোষিতদের দারিদ্র্যও বাড়িতে থাকে। বেকার এবং ভিক্ষুকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়। সুদখোর মহাজনদের সুবিধা হয়। ইওরোপে তখন সুদখোর মহাজনদের প্রধান কেন্দ্র ফ্লোরেন্স। বড় বড় মহাজনেরা ক্রমে ব্যাংক গড়িয়া তোলে। মিডিসিদের* ব্যাংক ছিল আন্তর্জাতিক; ইওরোপের অন্যান্য স্থানেও এই ব্যাঙ্কের শাখা ছিল।

এখন সহজেই অনুমান করা যায় ফ্লোরেন্সের মত শহরগুলিতে প্রকৃত শাসক ছিল ব্যাংকার, বস্ত্র ও সিল্ক নির্মাতা এবং ধনবান বণিক। স্বাধীন কারিগরদের নাগরিক অধিকার ছিল না, জার্নিম্যান ও মজুরদের তো দূরের কথা।

চৌদ্দশতকে শুধু ইটালিতেই নয়, ইওরোপের অন্যান্য স্থানেও শহরের অভিজাতদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের বিদ্রোহ করে। ১৩৭৮ সালে ফ্লোরেন্সের মজুরেরা মাইকেল-লেন্ডো নামক একজন সাধারণ শ্রমিকের অধীনে সংঘবদ্ধ হয় এবং বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা কাউন্সিল গৃহ দখল

---

* Medici

করিয়া চল্লিশদিনের জন্য শহরে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট কায়েম করিয়াছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অভিজাতেরা বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হয়।

ফ্লোরেন্সে বিদ্রোহ করিয়াছিল প্রধানত মজুরেরা। কিন্তু জার্মানি এবং ফ্রান্সে স্বাধীন কারিগরেরাই শহরের ব্যাংকার, সুদখোরমহাজন, ধনবান বণিক প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জার্মানির হেনসিয়াটিক শহর-গুলিতেই (ব্রেমেন, লুবেক) বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সর্বত্রই সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের জয় হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজাতেরা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে।

(৩)

চৌদ্দ এবং পনরশতকে ইটালির নাগরিক জীবনে প্রধান স্থান গ্রহণ করে বণিক, ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি প্রভৃতি বুর্জোয়ারা। ইহারা স্বাবলম্বী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ,—সুতরাং ধর্মযাজক ও সামন্তদেব জীবনের ধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী বরদাস্ত করিতে পারে না। চার্চ প্রচারিত ভবিষ্যত জীবনের স্বর্গসুখের আশ্বাসে তাহারা খুশী হয় না। ইহজীবনের সুখ-সম্ভোগই তাহাদের নিকট একমাত্র কাম্য। ধর্মযাজকেরা উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ দিত; কিন্তু বুর্জোয়া বণিক ও শিল্পপতিরা এ জীবনের সুখসম্ভোগের কথাই ভাবিত।

আগেকার অর্থনীতি ছিল অপরিবর্তনীয়, অনড়; স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে উহা আবদ্ধ। বিনিময়, লেন-দেন বিশেষ কিছুই ছিলনা। কিন্তু এখন টাকার চল হওয়ায় নূতন অর্থনৈতিক জীবনের পত্তন হইয়াছে। সমাজে এখন প্রধান স্থান বণিকের; সামন্তপ্রভুর পদমর্যাদা অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। এখন সকল কিছুর নিয়ামক বণিকের থলিয়া। বণিকেরা ব্যবসায় উপলক্ষে দেশবিদেশে যায়, দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে,—সুতরাং নিজের শক্তির উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয়। এই অবস্থায়, চার্চের ও ধর্ম-যাজকদের কর্তৃত্ব মানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন। ব্যবসায়ের ব্যাপারে এবং লাভ লোকসানের হিসাবে অন্যের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ তাহারা সহ্য করিতে পারে না।

চার্চের নির্দেশ এবং ধর্মোপদেশ এই নূতন শ্রেণীর কোন কাজে আসে না; বরং জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানেরই তাহাদের প্রয়োজন। দেশবিদেশের জ্ঞান, জাহাজনির্মাণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা—বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়। চার্চের ইস্কুলে উইয়ের চোখ আছে কিনা—এই রকম প্রশ্নের বিচার হইতে পারিত দিনের পর দিন; বাইবেলে এই

বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে কিসব যুক্তি আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে কেহ কম যাইত না। কিন্তু কাহারও এতটুকু বুদ্ধি যোগাইত না যে একটা উই ধরিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সমস্যার মীমাংসা হয়। বুর্জোয়ার মন এখন আর নিষ্ফল তর্ক লইয়া ব্যস্ত হইতে রাজী নয়, এখন তাহারা হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে চায়। বণিকেরা ইস্কুলস্থাপন করে, শিক্ষিত লোকেদের সমাদর করে, গ্রীসের এবং রোমের সংস্কৃতিতে যাহারা বিশেষজ্ঞ তাহাদের শ্রদ্ধা জানায়।

এইরকম পরিবেশের মধ্যে এমন একদল সংস্কৃতিবান মনীষির আবির্ভাব হয়, যাহারা মানবধর্মী। সকল বিষয়েরই ইহারা বিচার ও পর্যালোচনা করেন ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে। ইতিহাসে ইহাদের নাম হিউমেনিস্ট; ইহারা নবযুগের স্রষ্টা; নূতন ভাবধারার বাহক।

এই সময়ে গ্রীসের ও রোমের সংস্কৃতির গভীর পর্যালোচনা ও চর্চা সুরু হয়। দাসত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রীসের এবং রোমের প্রাচীন সভ্যতায় শিল্পবাণিজ্যের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল। ইটালির বণিকেরা স্বভাবতই চার্চের চেয়ে গ্রীস এবং রোমের সংস্কৃতিই বেশী পছন্দ করিত। ইটালিতেই প্রাচীন স্থাপত্যের চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ ছিল সকলের চেয়ে বেশী। ইটালির বণিকেরা এইগুলির ভিত্তিতেই তাহাদের নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। শহরের বণিক শাসকেরা সর্বদা দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি মনীষী পরিবৃত হইয়া থাকিত। বাণিজ্যের বিকাশে ও শিল্পের উন্নতিতে বিজ্ঞান এবং কলাশাস্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়।

চৌদ্দ শতকের একশ্রেণীর লেখকদের চনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। ফ্লোরেন্সের কবি পেট্রারাকা প্রাচীন গ্রন্থাদি ও পাণ্ডুলিপি ঘাঁটিয়া নব নব তথ্য প্র াশ করেন। বোকাচিয়ো সামন্তপ্রভু ও ধর্মযাজকদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। বোকাচিয়োর নিকট শহরের নাগরিকেরা নূতন মানুষ। তিনি ইহাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও নিরলস কার্য-শক্তিরও প্রশস্তি গাহিয়াছেন।

মূর্তিগড়া, ছবি আঁকা প্রভৃতি শিল্প সে সময়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। বড় বড় অট্টালিকা ও মর্মরমূর্তিতে ইটালির শহরগুলি অনুপম শ্রী ধারণ করে। চার্চের প্রভাবের সময়ে শিল্পীরা যথার্থ জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতেন না; বরং তাহাদের শিল্পসৃষ্টিতে জীবনের প্রতি ঘৃণাই ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু বণিকপ্রধান সমাজে শিল্পীদের প্রধান চেষ্টাই থাকে যথার্থ জীবনকে ফুটানো।

রেনেশাঁযুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন একাধারে স্থপতি ও কবি। তিনি আবার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ঊনিশ শতকে যেসব

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে তাহার অনেকগুলিরই ভিত্তি স্থাপন করেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি ধর্মের বুলি ও উপদেশ কপচাইতে নিষেধ করিতেন; প্রকৃতি হইতে পাঠ লইতে বলিতেন। ইটালিতে সে সময়ে যুগোপযোগী রাষ্ট্রতত্ত্বের জন্ম হয়। ম্যাকিয়াভ্যালী পুরাপুরি সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ দাবি করেন। তিনি বলেন, ধনবান নাগরিকেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। এইরকম রাষ্ট্রগড়ার জন্য যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(৪)

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি চৌদ্দ, পনর শতকে পশ্চিম ইওরোপে শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। উহার ফলে সেখানকার সেকেলে সরল অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া যায়; টাকার চলাচল হয়; টাকাই হয় ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম। নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নূতন নূতন শ্রেণী গড়িয়া উঠে, শ্রেণীসংঘর্ষও তীব্র হয়।

বড় ভূস্বামীদের হাতে সম্পদ বেশী, উহাদের অধীনে কৃষক ও ভূমিদাসের সংখ্যাও বেশী; সুতরাং শোষণ উহারা প্রায় পূর্বের মতই করিতে পারিত; এই কারণেই নূতন ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যে তেমন পরিবর্তন আসে নাই। আগের মতই তাহারা আরও কিছুদিন চলিতে পারিয়াছিল। বাজার, বিনিময় প্রভৃতি নূতন অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি হইতে যেমন ইহারা দূরে ছিল, তেমনি রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ন্যূনাধিক অটুট রাখিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু ছোট জমিদারদের অবস্থা অন্যরকম। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় তাহারা সংকটাপন্ন হয়। সর্বনাশ এড়ানোর জন্য তাহারা ব্যবসায়ের সুযোগ লইতে অগ্রসর হয়। গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া তাহারা নূতন অর্থনীতির সঙ্গে তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা মানাইয়া লইতে চেষ্টা করে। কৃষকের নিকট হইতে তাহারা যে শস্য আদায় করে এবং নিজেদের খামার জমিতে যে ফসল আবাদ করে—তাহার বেশী অংশই এখন বাজারে বিক্রয় হয়।

এই সময়েই আবার অধিকাংশ কৃষক ভূমিদাসপ্রথা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন কৃষকের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু পণ্যবিনিময় এবং টাকার চলাচল হওয়ায় তাহাদের দুর্গতি আরও বাড়িয়া যায়। তাহারা আরও বেশী শোষিত হইতে থাকে। এদিকে কৃষকদের মধ্যেও বড় কৃষক—গরীব কৃষক এরূপ স্তরভেদ দেখা দেয়।

শহরে নূতন শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়, ইহারা বণিক এবং সুদখোর মহাজন;

পণ্যবিনিময় এবং ব্যবসায় বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এই শ্রেণীর প্রভাব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কৃষক এবং কারিগরই শুধু নয়, অনেক সামন্ত ভূস্বামীও ইহাদের পুঁজি ও কুসীদের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। শহরগুলির শাসন যথার্থতঃ এই শ্রেণীরই হাতে।

তারপর হস্তশিল্পী কারিগরেরা; ইহাদের আবার দুইদল,—একদল মাস্টার, আর একদল জার্নিম্যান। ক্রমে জার্নিম্যানেরা ভাড়াটে মজুরে পরিণত হয়। অনেকবারই ইহারা বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

নূতন নূতন শ্রেণীর অভ্যুদয়, আবার একশ্রেণীর আর এক শ্রেণীতে পরিবর্তন—এসকল কারণে সামন্ত ব্যবস্থার রূপান্তর অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়।

সামন্ততন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল পুরাপুরিই সামন্তপ্রভুদের হাতে। তাহারা স্ব স্ব জমিদারীতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, রাজা অথবা সম্রাটের হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ছিল নামেমাত্র! কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের বিকাশের দরুন অবস্থার পরিবর্তন হয়। এই সময়টাতে আমরা জানি, শ্রেণীসংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে; শোষিত জনসাধারণ প্রায়ই সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। এইসব বিদ্রোহের জন্য শাসকশ্রেণী কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করিয়া তোলার প্রয়োজন বোধ করে। ফরাসীদেশে জেকুয়ারীদের বিদ্রোহ এবং ইংলণ্ডে ওয়াট টাইলরের নেতৃত্বে কৃষকের বিদ্রোহের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শহরেও শ্রেণী-সংঘর্ষ ছিল। অভিজাত, বণিক এবং মহাজনেরা ভাবিল,—সুসংহত ও সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় ক্ষমতাই একমাত্র তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থ ও শোষণের পথ নিরাপদ রাখিতে পারে।

সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার সহিতে হইত বণিকদেরই বেশী। তাহারা নির্বিবাদে ব্যবসায় করিতে পারিত না। ন্যায় অন্যায়, বহুরকমের কর তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। কর ছাড়াও, ব্যবসায়ের পথে অন্তরায় ছিল আরও অনেক। সামন্তপ্রভুরা দস্যুদের দমন করিত না; সুতরাং বণিকের মাল লুঠ একটা নিয়মিত ব্যাপার ছিল। রাস্তাঘাট ও চলা-চলের সুবন্দোবস্ত ছিল না। তাহা ছাড়া, সামন্তপ্রভুদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ একপ্রকার লাগিয়াই থাকিত। এই রকম বাধার বিরুদ্ধে এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বণিকদের ব্যবসায় করিতে হইত।

আরও একটা বড় অসুবিধা ছিল, একই রাজ্যে নানারকমের মুদ্রার প্রচলন। এক একজন সামন্তপ্রভু এক এক রকমের মুদ্রা বাহির করিত। চৌদ্দ-শতকে এক জার্মানিতেই ছিল ছয়শ' টাকশাল। মুদ্রার এই অসমতার জন্য বণিকের দুর্ভোগের অন্ত ছিলনা; এক এলাকা ছাড়িয়া অন্য এলাকায় গেলেই মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া লইতে হইত।

বাণিজ্যের এই সমস্ত অসুবিধার দরুন শিল্পোন্নতি বাধা পায়। শিল্প এখন বড় আকার ধারণ করিয়াছে; কারখানায় তৈয়ারী মাল এখন আর স্থানীয় গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; বিস্তৃত বাজারে উহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু কারখানাজাত মাল দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, যদি বাণিজ্যের পথ সুগম হয়।

অতএব শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থে তখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে এমন সব রাষ্ট্রের যাহাতে শাসনক্ষমতা থাকিবে কেন্দ্রীয় শক্তির হাতে। এই-রকম কেন্দ্রীয়শক্তি সামন্তপ্রভুদের সংযত রাখিবে, শিল্পবাণিজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে, রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত এবং মুদ্রার সুব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

রাজারা সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বণিকদের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ সাহায্য পায়। তখন আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রচলন হইয়াছে। রাজকীয় বাহিনী সহজেই নাইট প্রভৃতি সামন্তপ্রভুদের কাবু করিতে সমর্থ হয়। এক-কালে যাহারা সাময়িক কাজের জন্য রাজাদের নিকট হইতে জায়গীর পাইয়াছিল প্রয়োজনের তাগিদে রাজারাই তাহাদের উচ্ছেদ করিল।

পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষ

(১)

ষোল শতকে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিচ্ছেদ সুসম্পূর্ণ হয়; বাণিজ্য এখন আর স্বদেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়; উহা আন্তর্জাতিক আকার লইয়াছে। ব্যাঙ্কের পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটিতে আরম্ভ করে। এক কথায়, সরল অর্থনীতির বদলে পণ্য ও টাকাই এখন প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়া যায়। ফলে হস্তশিল্পের যথেষ্ট বিকাশ হয়।

কারিগরের কারখানায় এখন কাজ হইতে থাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী। কারখানার অভ্যন্তরে শিক্ষানবীশ ও জার্নিম্যানদের সঙ্গে মনিবের বিরোধ প্রবল হয়। মনিব এখন আর নিজে কাজ করেনা, মাত্র কাজের তদারক করে। কারখানার মালের চাহিদা বেশী,—সুতরাং মনিব তাহার অধীনস্থ লোকেদের বেশী সময় খাটাইয়া বেশী কাজ আদায় করে। শিক্ষানবীশির সময় এখন বাড়াইয়া দেওয়া হয়, দশ বছরের আগে কেহ স্বাধীন কারিগর হইতে পারে না। খুব কম শিক্ষানবীশই স্বাধীন কারিগর হওয়ার আশা করিতে পারিত। শিক্ষানবীশদের পরীক্ষাও এখন খুব কঠোর; তাহাছাড়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষানবীশকে বহু টাকা খরচ করিতে হইত। পূর্বে জার্নিম্যানদের খাওয়া পরা দিত মনিবই। কিন্তু এখন তাহাকে সামান্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ছুটির দিন কমাইয়া দেওয়া হয়, খাটুনির সময়ও এখন আগের চেয়ে বেশী। জার্নিম্যান এবং শিক্ষানবীশরা এই কারণেই অনেক জায়গায় নিজেদের সংঘ গঠন করিয়া দাবি আদায় করিতে চেষ্টা করিত।

গিল্ডগুলি বাজারের চাহিদার উপযোগী মাল তৈয়ার করিয়া উঠিতে পারিত না; তাই অল্পসময়ে বেশী মাল তৈয়ার করার জন্য কোন একটি গিল্ডে এখন আর পুরা জিনিস না বানাইয়া মাত্র একটি অংশ তৈয়ার করিতে থাকে। একজোড়া জুতা তৈয়ার করার জন্য এখন হয়ত পাঁচরকম কারিগরের কাজ দরকার হয়। চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় কারখানার উপর চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতির কোনরূপ উন্নতি হয় নাই, উৎপাদনের রীতি আগের মতই রহিয়াছে। গিল্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রতিযোগিতা নষ্ট করা।

৯

নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার কিংবা উন্নতির দিকে গিল্ডগুলির লক্ষ্য ছিল না। যদি কোন কারিগর নূতন কিছু উদ্ভাবন করিত গিল্ড তাহা বন্ধ করিয়া দিত, অবাধ্য কারিগরদের শাস্তি দিত। গিল্ডের এইসব কড়া ব্যবস্থায় যন্ত্রের উন্নতি বাধা পায়। ইহাতে প্রমাণ হয় গিল্ডপ্রথা শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায়।

পূর্বে কারিগর তাহার তৈয়ারী মাল নিজেই বিক্রয় করিত। কিন্তু উৎপাদন এখন যে স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বাজারের চাহিদা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে কারিগরের পক্ষে আর তাহার নিজের মাল নিজেরই বিক্রয় করিতে যাওয়া সম্ভব হয় না। কারিগরের যথেষ্ট পুঁজি নাই, বাজার সম্পর্কে কোন ধারণা নাই। দেশ বিদেশের বাজারে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তাহার অন্য উপায় নাই; তদুপরি, কাঁচামাল ও পুঁজির জন্য ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের উপর নির্ভর করিতেই হয়। ব্যবসায়ীরা কারিগরদের একমাত্র তাহাদের নিকটই মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য করিত। কারিগরের অন্য কাহারও জন্য মাল তৈয়ার করার স্বাধীনতা নাই। [illegible] কোন গিল্ড উৎপাদনের কাজ ছাড়িয়া নিজেরাই ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। [illegible]ভিন্ন গিল্ডদের নিকট হইতে একটা পুরা জিনিসের অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া ইহারা শুধু এইসব বিভিন্ন অংশের সংযোজন করে এবং পুরা জিনিসটি বাজারে ছাড়ে। ধনবান বড় কারিগরেরাও ব্যবসায় করিত। ইহারা ছোট ছোট কারিগরদের তৈয়ারী জিনিস সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। এইভাবে ষোল শতকে কারিগরেরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাইয়া ব্যবসায়ীর পুঁজির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। উৎপাদন এবং বাণিজ্যের বিকাশের ফলে গিল্ডপ্রথা অচল হইয়া যায়। কারিগর এবং জার্নিম্যানদের অন্তর্দ্রোহ, এক গিল্ডের সঙ্গে অন্য গিল্ডের প্রতিযোগিতা এবং কারখানা মালিকের ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের উপর নির্ভর—এই সব কারণে গিল্ড আগেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

(২)

গিল্ডের অবনতির বড় কারণ গৃহশিল্পের আবির্ভাব। এইরূপ শিল্প প্রথম দেখা দেয় গ্রামে। কৃষকেরা কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘরে শিল্পোৎপাদনের কাজও করিতে থাকে। টাকায় লেনদেন সুরু হওয়ায় কৃষকের টাকার প্রয়োজন হয়। ট্যাক্স দেওয়া, মহাজনের ঋণ শোধ করা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা—সবকিছুতেই টাকার প্রয়োজন। তাই কৃষক কাপড়, চামড়া ও অন্যান্য জিনিস তাহাদের প্রয়োজনের বেশী উৎপাদন করিতে

থাকে। বাড়তি অংশ তাহারা বিক্রয় করে। কিন্তু গ্রামে এসব জিনিসের বিক্রয়ের সুবিধা নাই। বড় কৃষকেরা গ্রাম হইতে গৃহজাত শিল্প দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে থাকে। বড় কৃষকেরাই এখন দালাল। ইহারা কৃষকের শিল্পদ্রব্যই যে কিনিয়া লয় তাহা নয়, কৃষককে কাঁচামালও দেয়। কৃষকেরা এখন দালালের ফরমাইস মত কাজ করে। এইভাবে ইহারা পুরাপুরি দালালের কবলে পড়িয়া যায়।

গৃহশিল্পের কাজ করিত পরিবারের সকলে মিলিয়া। গৃহশিল্পীদের কোন সংঘ ছিল না, তাই ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত তাহাদের শোষণ করিতে পারিত। গৃহশিল্পীরা কৃষির কাজ ছাড়ে নাই, তাহারা আধা-কারিগর আধা-কৃষক। স্বাধীন কারিগরের চেয়ে তাহারা মজুরি কম পাইলেও সন্তুষ্ট। তাই গৃহ-শিল্প কারিগরের স্বার্থের বিরোধী। অনেক সময় কারিগরেরা সংঘবদ্ধ হইয়া গ্রামের গৃহশিল্পীদের উপর জুলুম করিত। দালালেরা গৃহশিল্পীদের পক্ষে দাঁড়াইত। ইংলণ্ডে ষোল-সতর শতকে কাপড়, মোজা, ধাতুদ্রব্য তৈয়ার গ্রামেই হইত বেশী। ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও গৃহশিল্প প্রাধান্য বিস্তার করে।

গিল্ডের পতন হইলে দালালদের উদ্যোগে গৃহশিল্প শহরেও ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামের মত এখানেও দালালদেরই কর্তৃত্ব। এইভাবে ধীরে ধীরে পুঁজি-পতির অধীনে পুঁজিতান্ত্রিক গৃহশিল্প গড়িয়া উঠে। ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা শিল্পীদের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দেয়। স্বাধীন কারিগর ক্রমশ পুঁজি-পতির ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হয়।

পরের ধাপ,—বিভিন্ন গৃহশিল্পীর মধ্যে শ্রমবিভাগ; এখন কোন একজন শ্রমিককে পুরা জিনিসটা তৈয়ার করিতে হয় না, সে শুধু উহার একটি অংশই তৈয়ার করে। যেমন ঘড়ি নির্মাণের কাজে কিছু শ্রমিক শুধু স্প্রিং তৈয়ার করে, কিছু শ্রমিক ডায়েল তৈয়ার করে, কিছু শ্রমিক পেণ্ডুলাম তৈয়ার করে ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রমিকের তৈয়ারী অংশগুলি একত্র সংযোজন করিয়া পুরা জিনিসটি প্রস্তুত হয়; পুঁজিপতি এখন তাহা বাজারে লইয়া যায়। কারিগরেরা পুঁজিপতির ফরমাইস অনুসারে কাজ করে।

এই অবস্থায়ই গৃহশিল্প পুঁজিতন্ত্রী কারখানায় পরিণত হয়। নিজের কারখানায় পুঁজিপতি কয়েকশ' কারিগর একত্র করিয়া খাটায়। ইহারা পুরা জিনিসটির এক একটি অংশ তৈয়ার করে। এখন ইহারা স্বাধীন কারিগর নয়, পুঁজিপতির ভাড়াটে মজুর। পুঁজিপতি ইহাদের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচা-মাল দেয়।

কারিগর এবং গৃহশিল্পী ছিল নিজেরা মালিক। ইহারা বাজারে অথবা দালালদের নিকট নিজেদের কারখানার তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিত। কিন্তু পুঁজিপতির কারখানায় শ্রমিক সর্বহারা, পুঁজিপতির নিকট তাহারা নিজেদের

শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। ব্যবসায়ী বা দালালই এখন পুঁজিপতি। এই নূতন পুঁজিপতি বহুলোককে একসঙ্গে খাটায়, তাই উৎপাদন হয় বেশী। একই কারখানা-বাড়িতে কাজ হয়; আসবাবপত্রও সকলে একসঙ্গে ব্যবহার করে। বেশী লোক একত্র খাটিলে বেশী সরঞ্জাম ও বেশী উপকরণের প্রয়োজন হয় সত্য, কিন্তু পৃথক পৃথক কাজ করিলে যে খরচ হয়, সেই অনুপাতে খরচ বাড়ে না। একসঙ্গে কাজ করার দরুন নূতন একটা শক্তির উদ্ভব হয়—ইহা শ্রমিকের সমষ্টিগত শক্তি। সমবেত কাজে উৎপাদন বাড়ে; শ্রমিকদের পৃথক পৃথক কাজের যোগফল আর সমষ্টিগত শ্রমের মোট উৎপাদন কখনও এক নয়।

নূতন ব্যবস্থায় উৎপাদনের রীতি বদলায় নাই। হাতিয়ার তখনও আগেকার যুগের হস্তশিল্পীদেরই হাতিয়ার। মার্কস পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষের এই স্তরটির নাম দিয়াছেন 'ম্যানুফেকচার' বা কারিগরী শিল্প। কারখানায় শ্রমিকেরা সারাদিনই কাজ করে; কঠোর শৃংখলার মধ্যে তাহাদের থাকিতে হয়। যে মজুরি তাহারা পায় তাহাতে পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব হয়না।

ম্যানুফেকচারের যুগে হাতের কাজেরই প্রাধান্য; এই কারণেই শ্রমিক তাহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলে না, তখনও শ্রমিক সম্পূর্ণভাবে পুঁজির বশীভূত হয়না। মেশিনের প্রবর্তনের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে কারখানার মালিক পুরাপুরি শ্রমিককে আয়ত্তে আনিয়াছে।

(৩)

হাতিয়ার কিরূপে মেশিনে পরিবর্তিত হয়? কেহ কেহ বলেন, হাতিয়ার ও মেশিনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কিছুই নাই: সরল মেশিনই হাতিয়ার আর জটিল হাতিয়ারই মেশিন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। আবার কেহ কেহ বলেন, হাতিয়ার চালায় মানুষ; মেশিন চলে অন্যান্য শক্তিতে। কিন্তু ইহাও সত্য নয়।

মেশিনের তিনটি অংশ: প্রথম প্রেরক যন্ত্র; দ্বিতীয় বাহন যন্ত্র; তৃতীয়, কাজ করার যন্ত্র। স্টীম, ইলেকট্রিসিটি, জল, বায়ু—এগুলি প্রেরক শক্তি। ফ্লাই হুইল, পুলি প্রভৃতি বাহন যন্ত্র। যে যন্ত্রদ্বারা কাজ করা হয়, সকলের আগে তাহাই রূপান্তরিত হইয়াছে এবং শিল্প উৎপাদনে বিপ্লব আনিয়াছে।

প্রথমটায়, কারিগরের হাতিয়ারগুলির সমবায়কেই বলা হইত মেশিন। আগে হস্তশিল্পী নিজের হাতে হাতিয়ার চালনা করিত; এখন আর তাহা করা হয় না। হাতিয়ারগুলিকে একটি কাঠামোর মধ্যে পুরিয়া বাহির হইতে

উহাতে শক্তি আরোপ করা হয়। সাক্ষাৎভাবে সূচ দিয়া মোজা তৈয়ার না করিয়া একটি স্টকিং-লুমে অনেকগুলি সূচ সন্নিবিষ্ট করা হয়। পরে লুমটিকে বাহির হইতে চালানো হয়। যে কাঠামোর মধ্যে হাতিয়ারগুলি বসানো হয়, সেই কাঠামোর আবিষ্কার হইতেই আধুনিক শিল্পের সুরু।

হস্তশিল্পী কখনও একটি কিংবা দুইটির বেশী হাতিয়ার একসঙ্গে চালাইতে পারিতনা। কিন্তু মেশিনে বসাইয়া লইলে, একসঙ্গে অনেকগুলি হাতিয়ার কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যে কাঠামোটার কথা বলা হইয়াছে তাহা যদি আকারে বড় হয়, তবে আর মানুষের শক্তিদ্বারা উহাকে চালানো সম্ভব হয় না। প্রথম অশ্ব, তারপর বায়ু, তারপর জল—এইসব শক্তিদ্বারা মেশিন-চালনা হইতে থাকে। অবশেষে আবিষ্কার হইয়াছে ওয়াটের স্টীম-ইঞ্জিন। সকলরকম মেশিনই স্টীম-ইঞ্জিনের শক্তিদ্বারা চালানো যায়।

মেশিনের আবিষ্কার হওয়ায় এখন আর শারীরিক শক্তির তেমন প্রয়োজন নাই। এখন শুধু পূর্ণবয়স্ক সবল শ্রমিকেরাই কাজ করে না; স্ত্রী, শিশু সকলেই পুঁজিপতির কারখানায় কাজ করিতে আসে। পুঁজিপতি শ্রমিকের পরিবারের সকলকেই এখন খাটাইতে পারে।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ

(১)

সামন্ততন্ত্রের শেষ দিকটাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। পনর শতকের আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান রাস্তা ছিল ভূমধ্যসাগর; ভূমধ্যসাগরে তখন ইটালির বণিকদেরই প্রাধান্য। কিন্তু চৌদ্দ-শতকের মধ্যভাগে কনস্টান্টিনোপল এবং কৃষ্ণসাগর এলাকা তুর্কীরা দখল করে; তখন হইতেই ইটালির বাণিজ্যের অবনতি হয়। নিকট প্রাচ্যের বন্দরগুলি ইটালীয়ানদের কাছে বন্ধ হইয়া যায়; সুদূর ভারতবর্ষের সঙ্গেও আর যোগাযোগের উপায় নাই। কিন্তু ইওরোপের বণিকেরা ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির কথা জানিতে পারিয়াছে; সুতরাং ভারতবর্ষের রাস্তা বাহির করিতেই হইবে।

সে সময়ে কোন কোন পর্যটকের ধারণা জন্মিয়াছিল, আটলাণ্টিকের অপর দিকে নিশ্চয়ই কোন না কোন দেশ আছে। অনেকেই মনে করিত আটলাণ্টিক ধরিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই ভারতের উপকূলে পৌঁছানো যাইবে। ইটালির জ্যোতির্বিদ পেয়োলো টস্‌কেনেল্লি প্রথম অনুমান করেন যে পৃথিবী নিশ্চয়ই গোলাকার; তিনি পৃথিবীর একটি মানচিত্র আঁকেন,—তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের অবস্থিতি দেখাইয়াছেন আটলাণ্টিকের অপর তীরে, ইওরোপের ঠিক মুখোমুখি। পৃথিবী গোলাকার, এই ধারণা সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই ভাবিল পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যাইবে। এই দুঃসাহসিক কাজে সর্বপ্রথম আগাইয়া আসেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস্‌।

স্পেনের বণিকেরা সে সময়ে নূতন নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিয়া দেশজয় ও লুণ্ঠনের জন্য ব্যস্ত হয়। ধর্মযাজকেরা বলিত পৃথিবী গোলাকার নয়, কেননা বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে পৃথিবী চেপ্টা। কিন্তু বণিকেরা তাহা উপেক্ষা করিয়া ইটালির নাবিক কলম্বাসকে তাহার দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহ দেয়। রাষ্ট্র হইতে তাহাকে কতকগুলি জাহাজ দেওয়া হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কলম্বাস স্পেনের একটি বন্দর হইতে সমুদ্রপথে পশ্চিম-দিকে যাত্রা করেন। অনিশ্চিত পথে অবিরাম গতিতে সত্তর দিন চলার পর কলম্বাসের জাহাজ উপকূলে আসিয়া পৌঁছে; সকলেই ভাবিল তাহারা

ভারতবর্ষে পেঁৗছিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নব-আবিষ্কৃত দেশ আমেরিকা। কলম্বাসের পরে ফ্লোরেন্সের নাবিক এমেরিগো* কয়েকবারই আটলাণ্টিকের পথে সমুদ্রযাত্রা করেন; আটলাণ্টিকের অপর তীরবর্তী এই দেশটির আমেরিকা নাম হয় এমেরিগোর নামানুসারে।

কলম্বাস যখন পশ্চিমদিকে ভারতবর্ষের রাস্তা আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিয়াছেন, তখনই প্রকৃত রাস্তা নির্ণয় হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে নয়, আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষের রাস্তা। পর্তুগীজেরা দক্ষিণ অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা পনর শতকের প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের রাস্তা আবিষ্কার করিতে পারিবে,—শুধু এই আশায়ই তাহারা বাহির হয় নাই, পর্তুগীজ বণিকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার অধিবাসীদের দাসে পরিণত করা। আফ্রিকার সোনা অপহরণ ও ধনলুণ্ঠনের দিকেই ছিল তাহাদের লোভ। প্রতিবছরই তাহারা একটু একটু করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়; অবশেষে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থলোমিউ ডিয়াজ্ উত্তমাশা অন্তরীপে উপনীত হন। ভারতবর্ষে পেঁৗছিতে এখন মাত্র ভারতমহাসাগর পারি দিলেই হয়।

দশবছর পরে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন হইতে ভাস্কোডাগামার নেতৃত্বে একটি বৃহত্তর অভিযান বাহির হয়। উত্তমাশা অন্তরীপে পেঁৗছিয়া ভাস্কোডাগামা'র জাহাজ আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। জাহাজ অবশেষে আরব বন্দরে আসিয়া ঠেকে; আরব বণিকেরা ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের আবির্ভাব ভালভাবে নিতে পারে নাই; তাহাদের একচেটিয়া বাণিজ্যের ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া শত্রুতা করিতে থাকে। যাহা হউক, একজন অভিজ্ঞ আরব নাবিকের সহায়তায় ভাস্কোডাগামা ও তাহার সাথীরা মালাবার উপকূলে পেঁৗছেন।

আমেরিকা আবিষ্কারের কিছুদিন পরই পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য সমুদ্র-যাত্রায় বাহির হন পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলান। স্পেন গভর্নমেণ্ট তাহাকে এশিয়ার দেশগুলির সহজ রাস্তা আবিষ্কার করিতে এবং নূতন নূতন দেশ জয় করিতে পাঠায়। ম্যাগেলান দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আটলাণ্টিক অতিক্রম করেন এবং যে জায়গায় আটলাণ্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত-মহাসাগর মিলিয়াছে সেখানে পেঁৗছেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করেন এবং মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বীপগুলি অধিকার করিতে গিয়া নিহত হন। তাহার সাথীরা ভারতবর্ষের পথে না গিয়া সোজা আফ্রিকার তীরে উপস্থিত হয়। তিন বছরে প্রথমবারের পৃথিবী পরিভ্রমণ শেষ হয়।

---

* Amerigo

(২)

সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল দেশজয় ও দেশলুণ্ঠন। বিজেতারা আধা-দস্যু; ইওরোপের বণিক-গভর্নমেণ্টগুলি ইহাদের উৎসাহিত করিত। স্পেনে এই দস্যুদলের নাম ছিল কংকুইস্টেডর বা বিজয়ী। কোর্টেজ স্পেনের এইরকম একজন দস্যু-সর্দার; কোর্টেজ মেক্সিকো দখল করে। অপর একজন দস্যু-সর্দার পিজারো পেরু দখল করে। সহজেই ইহারা স্থানীয় অধিবাসীদের কাবু করিতে পারিত; কেননা দস্যুরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিত। বিজিত দেশগুলির উপর নির্মম শোষণ চালানো হইত। 'নেটিভ'দের শোষণ হইতেই ইওরোপের পুঁজিপতিদের হাতে প্রাথমিক পুঁজির সঞ্চয় হয়। সে সময়ের একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছিলেন, "আমাদের নিজেদের স্বার্থে নেটিভদের আমরা উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়াই আমরা ধনবান হইতে পারিয়াছি।"—

১৫০৩ সনে স্পেনের ঔপনিবেশিকেরা জামাইকায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে; পাঁচ বছরের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হেইটির লোকসংখ্যা ১৫০৮ সালে ছিল ৬০,০০০; চল্লিশ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৫০০। ১৫৫০'র মধ্যে কিউবার স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

দেশ জয় করিয়াই 'নেটিভ'-দের দাসে পরিণত করা হইত; কিন্তু অনেক জায়গায়ই যে বিজয়ী শোষণকারীর অমানুষিক অত্যাচারে ইহারা নির্বংশ হইয়াছে তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল উপনিবেশ-গুলিতে দাসমজুর আর যথেষ্ট মিলিতেছে না। তাই 'নেটিভ'-দের দাস বানানোর বিরুদ্ধে স্পেনের ঔপনিবেশিকদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখা দেয়। মিশনারী পাদ্রীরা এই আন্দোলনের নেতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,—স্থানীয় অধিবাসীদের দাস বানানোর ব্যাপারে আপত্তি করিলেও, আফ্রিকা হইতে দাস-আমদানির বিরুদ্ধে তাহারা আপত্তি করে নাই।

আফ্রিকা হইতে হাজার হাজার নিগ্রো আমেরিকায় চালান হইত। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়াই এইরূপ দাস-রপ্তানি চলে। সতর শতকে প্রতিবছর নিগ্রো চালান হইয়াছে এক লক্ষ।

দাস ব্যবসায়ে লাভ ছিল প্রচুর; অনেক সময় মুনাফা হইত পুঁজির দ্বিগুণ। 'নেটিভ'-দের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়াও প্রচুর মুনাফা পাওয়া যাইত। কাঁচ, আয়না প্রভৃতি খেলো জিনিস দিয়া তাহাদের নিকট হইতে সোনা লওয়া হইত। ইওরোপীয় বণিকেরা যাহাই দিত তাহাতেই 'নেটিভ'-দের রাজী হইতে হইত। নিগ্রোদের ঘরে হয়ত খাবার নাই, তবুও বিলাসের দ্রব্য

তাহাদের জোর করিয়া গছাইয়া দেওয়া হইত। বিদেশী বণিকদের আফিমের ব্যবসায় হইতেও ধনাগম হইত যথেষ্ট।

ইওরোপের গভর্নমেণ্টগুলি কতকগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেয়; ব্যবসায়ের অধিকারই নয়, কোম্পানী-গুলির শাসনের ক্ষমতাও থাকিত।

ডাচ্‌দের এবং ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাদের একান্ত পরিচিত। প্রথম ডাচ্‌দের কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার অনুকরণে অন্যান্য দেশের বণিকেরা নিজেদের কোম্পানী গঠন করে। এই সব কোম্পানী উচ্চহারে লভ্যাংশ দিত।

ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলির সময়ে আটলাণ্টিকের তীরবর্তী শহর ও রাষ্ট্রগুলি হইয়া দাঁড়ায় প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। জেনোয়া ও ভেনিস পর্তুগাল এবং স্পেনের নিকটে পরাজয় স্বীকার করে; তারপর দেখা দেয় ফরাসীর আধিপত্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান নায়করূপে থাকিয়া যায় হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড।

আফ্রিকার পশ্চিম্ উপকূলে এবং ভারতবর্ষের করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে প্রথম আবিস্কারগুলি করে পর্তুগীজ নাবিক ও বণিকেরা। সিংহল, মালাক্কা, জাভা, সুমাত্রা এবং পরে মাকাও এবং চীনেও ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তুলা, চিনি, মদ ও সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় ইহাদের একচেটিয়া। ইওরোপ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের এখন প্রধান কেন্দ্র পর্তুগালের রাজধানী লিসবন। ভারত সাগরে আরবদের ব্যবসায় বিনষ্ট হয়; পর্তুগীজ বণিকদেরই তখন পুরা কর্তৃত্ব। স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে বাণিজ্য সন্ধি করিয়া পর্তুগীজেরা একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করে।

পর্তুগীজেরা যখন ভারতবর্ষে ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, স্পেনের বণিকেরা তখন আমেরিকায় নূতন নূতন দেশ জয় করিতে ব্যস্ত; আমেরিকার সোনা ও রূপার দিকেই তাহাদের আকর্ষণ। কোন দেশ উর্বর হইলেও সোনা-রূপা না থাকিলে সেদেশে তাহারা যাইত না।

কিন্তু ষোলশতকের শেষের দিক হইতে পর্তুগালের ও স্পেনের বণিকদের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় ইহারা হটিয়া যায়। অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে ইহারা দুর্বল। তাই বেশীদিন ইহাদের ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্থায়ী হয় নাই।

ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের স্থান গ্রহণ করে ওলন্দাজেরা; কিন্তু সতর শতকের প্রথম দিকেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়। ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে ইংরেজ বণিক। আমেরিকায়ও স্পেনের উপনিবেশ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যাহারা প্রথম উপনিবেশ গড়ে তাহারা টিকিয়া থাকে নাই; তাহাদের স্থান গ্রহণ করে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিক।

(৩)

ইওরোপের বণিকেরা উপনিবেশ হস্তগত করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়িয়া যায়; পূর্বে আর কখনও বাণিজ্যের এত প্রসার হয় নাই; বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আকারে মুদ্রার প্রচলন হয়। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ হইতে ইওরোপে সোনা এবং রূপার আমদানি হইতে থাকে প্রচুর। আমেরিকায় স্পেনের বণিকেরা খনি হইতে সোনা সংগ্রহ করিত না; স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট যে মজুত সোনা থাকিত তাহাই অপহরণ করিত।

প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপার আমদানি হওয়ায় ইওরোপের দেশগুলিতে সকল জিনিসেরই দাম বাড়িয়া যায়; ফলে সোনা ও রূপার মূল্য হ্রাস পায়। খাদ্য শস্যের দামই বাড়ে সকলের চেয়ে বেশী। শতকরা ২০০ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শ্রমিকের মজুরি বাড়ে মাত্র শতকরা ৫০; পূর্বে মজুর ১ শিলিংয়ে ৫ পাউন্ড গম কিনিত, এখন ১½ শিলিংয়ে ২ পাউন্ড গম কিনিতে পারে।

উত্তর ইওরোপে সে সময়ে অনেকগুলি বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। জার্মানির 'ফুগার'-দের প্রতিষ্ঠান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 'ফুগার' যে শুধু ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়ই করিত তাহা নয়, উহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানও ছিল নানারকমের। ইওরোপে ইহাদের অধীনেই ছিল সবচেয়ে বেশী খনি। ইওরোপের অনেক গভর্নমেণ্টকেই ইহারা টাকা ধার দিত। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যেও ইহাদের যথেষ্ট টাকা খাটিত। মধ্য ও উত্তর ইওরোপের সমস্ত বড় বড় শহরে ইহাদের শাখা প্রতিষ্ঠান ছিল।

ব্যাঙ্কিংয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক্সচেঞ্জের সৃষ্টি হয়। বণিকেরা এক্সচেঞ্জে একত্র হইয়া বৈদেশিক মালের অর্ডার দিত। প্রথম এক্সচেঞ্জের আবির্ভাব হয় ব্রুগস্-এ*; ভ্যান-ডি-বোর্স† নামে একজন বণিকের বাড়ির সম্মুখে ব্যবসায়ীরা একত্র হইত। এই বণিকের নাম হইতেই বোর্স‡ বা এক্সচেঞ্জ কথাটির সৃষ্টি হয়। ষোল শতকে ব্রুগসের এক্সচেঞ্জের গুরুত্ব নষ্ট হইয়া যায়; পরে এন্টোয়ার্পই হইয়া দাঁড়ায় এক্সচেঞ্জের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এন্টোয়ার্প তখন শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক বন্দর।

---

* Brugges ; † Van de Bourse ; ‡ Bourse.

ষোলশতকের কৃষকযুদ্ধ

(১)

ইটালির শহরগুলির সঙ্গে ছিল জার্মানির অর্থনৈতিক সম্বন্ধ। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের বদলে আটলান্টিকের প্রাধান্য বাড়িয়া যাওয়ায় ইটালির ব্যবসায়ের অবনতি ঘটে, ফলে জার্মানির অর্থনৈতিক পতন হয়। অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত জার্মানি ক্ষমতাশালী ঐক্য-বন্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাই। অর্থনৈতিক পতনের মুখে জার্মানিতে শ্রেণীবিরোধ তীব্র আকার লয়।

এগার শতক হইতেই রোমান ক্যাথলিক চার্চ ইওরোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে; ধীরে ধীরে চার্চের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ইওরোপে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে রাজারা পোপের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিতে অস্বীকার করে। চার্চ সারা ইওরোপের জনসাধারণের উপর 'টাইথ্' ধার্য করে; ফসলের এক-দশমাংশ চার্চের প্রাপ্য; তাহা ছাড়া নানারকম অছিলায় আরও কয়েকপ্রকার কর আদায় করা হয়। এই সকল কর রাজার কোষাগারে না আসিয়া রোমে চলিয়া যাইবে, ইহা কখনও তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। আগেকার অর্থনীতি ভাঙিয়া গিয়া পণ্যোৎপাদনের ভিত্তির উপর নূতন অর্থনীতির জন্ম হওয়ায় যে সব সামন্তপ্রভুর সর্বনাশ হইয়াছে তাহাদের পক্ষেও চার্চের ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্য সহ্য করা অসম্ভব।

কিন্তু রোমের চার্চের প্রধান শত্রু উদীয়মান বুর্জোয়া এবং শোষিত জনসাধারণ। চার্চের শোষণে জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হয় বুর্জোয়া তাহা চায় না। বণিকেরা চাহিত, একমাত্র তাহারাই জনসাধারণকে শোষণ করিবে। এই কারণেই বুর্জোয়া চার্চের সংস্কারের জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। শোষিত জনসাধারণ চার্চকে সর্বপ্রকার অত্যাচারের প্রধান বাহক মনে করিত; তাহারা চার্চকে ঘৃণা করিত।

পণ্যোৎপাদন এবং টাকায় কেনা-বেচা সুরু হওয়ার পর হইতেই রোমের ঐশ্বর্য বাড়িয়া যায়; পোপের লোভের অন্ত নাই। টেক্স, টাইথ, ব্যবসায়, মহাজনী ছাড়াও অর্থাগমের আরও নূতন পথ ছিল। ইণ্ডালজেন্সের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; চার্চের নিকট হইতে ইণ্ডালজেন্স ক্রয় করিলে পাপ মোচন হয়।

পোপের অত্যাচার ছিল জার্মানিতেই বেশী। পোপ জার্মান রাষ্ট্রের অনৈক্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নেন। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের অধীন; সুতরাং সেখানে পোপের ক্ষমতা তেমন খাটিত না।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে উইটেনবার্গে মার্টিন লুথার প্রকাশ্যে চার্চের ইণ্ডালজেন্স প্রথার প্রতিবাদ করেন; লুথারের এই আক্রমণ হইতেই রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হয়। লুথারের আন্দোলনের পিছনে সমর্থন ছিল জার্মানির সবচেয়ে শক্তিশালী অধিপতি সেক্সনির রাজার। লুথার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রষ্টা বটে, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী ছিলেন না; তিনি রাজাদের এবং উপরের স্তরের বুর্জোয়ার স্বার্থের প্রতিনিধি। আপসের দিকেই তাহার বেশী প্রবণতা, তাই তাহার উগ্র মতগুলি তিনি ক্রমশ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু জার্মানির অসন্তুষ্ট জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যায়। বৈপ্লবিক আন্দোলন দুইটিখাতে প্রবাহিত হইতে থাকেঃ উপরের স্তরের বুর্জোয়া এবং রাজারা শুধু চার্চের প্রভুত্ব খর্ব করিতে চায়; কিন্তু শহরের সাধারণ নাগরিক, কারিগর এবং গ্রামের কৃষকেরা চলতি সামাজিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত লড়িতে প্রস্তুত। ইহাদের নেতা টমাস মুঞ্জার*। তিনি লুথারের নরমপন্থী মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, 'বিপ্লবের লক্ষ্য যদি হয় শুধু চার্চের সংস্কার তবে বিপ্লবের সংগ্রাম না করাই উচিত'। মুঞ্জারের আন্দোলন এক শহর হইতে অন্য শহরে ছড়াইয়া পড়ে; ১৫২৪ সাল হইতে কৃষকের ব্যাপক বিদ্রোহ সুরু হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহের নাম 'কৃষক যুদ্ধ'।

(২)

জার্মানিতে ষোল শতকেও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ হয় নাই। বরং তখন উহা আরও কঠোর হয়। ষোল শতকের জার্মান কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলেন, 'সমাজের সকল শ্রেণীই কৃষকের উপর ছিল বোঝা—রাজা, সামন্তপ্রভু, দস্যু পোপ, বণিক মহাজন, দালাল ও কারখানার মনিব'। কৃষককে মনে করা হইত ভারবাহী পশু। তাহাকে বেশী সময়ই মনিবের জন্য খাটিতে হইত। কৃষক তাহার রুজী হইতে দিত টাইথ্, খাজনা এবং টেক্স। মনিবের গৃহে তাহাকে কাজ করিতে হইত; তাহা ছাড়া মনিবের আদেশে খড় সংগ্রহ করিতে হইত, কাঠ কাটিতে হইত। মাছ ধরা, শিকার করা—এগুলি ছিল

* Munzer

মনিবের অধিকার। শিকারের সময়ে কৃষকের পাকা ফসল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু চুপ করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কৃষকের জমি, কৃষকের ফসল এবং কৃষকের খাটুনিই যে ছিল মনিবের কবলে তাহা নয়, তাহার শরীরের উপরও ছিল মনিবের দৌরাত্ম্য; যে কোন শাস্তির জন্য তাহাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। কখনও সে সুবিচার আশা করিতে পারিত না; বিচারকেরা নিজেরাই শোষকের দলের। জার্মানিতে তখন কৃষকের মুখে চার রকম দস্যুর কথা শুনা যাইত—মনিব, পুরোহিত, দালাল ও আইনজীবী। আদালতে কৃষককে দোষী সাব্যস্ত করাই থাকিত আইন-জীবীর কাজ।

এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কৃষকেরা পনর শতকের শেষ দিকে এবং ষোল শতকের প্রথম দিকে ক্রমাগত বিদ্রোহ করে। ১৫২৪-এর বিদ্রোহকে ইতিহাসে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। একই সময়ে জার্মানির সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথমটায় কৃষকেরা সামন্তপ্রভু এবং বণিকদের নিকট কতকগুলি দাবি উপস্থিত করে। কিন্তু এই দাবি যখন উপেক্ষিত হয় তখনই তাহারা সংঘবদ্ধ আক্রমণ সুরু করে। কৃষকেরা দুর্গ এবং মঠ ধূলিসাৎ করিতে থাকে। শহরের গরীবেরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা অনেকগুলি শহর দখল করে।

কৃষকের দাবি সর্বত্র একরকম ছিল না। জার্মানির উত্তর অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয় খনির শ্রমিক এবং শহরের সাধারণ মজুরেরা। এখানে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন টমাস মুঞ্জার। এঙ্গেলস্ বলেন, 'মুঞ্জারের রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল সাম্যবাদের কাছাকাছি। তিনি শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার পরিকল্পিত সমাজে তিনি ব্যক্তিগত স্বত্ব ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন'।

সামন্তপ্রভুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা সহজেই বুঝিতে পারে যে কৃষকদের মধ্যে একতা নাই। মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেই অনেক কৃষক সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে। সামন্তপ্রভুরা বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ করে। কৃষকেরা হটিয়া যায়। যেখানে আক্রমণ সফল হয় নাই, সেখানে সামন্তপ্রভুরা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়া কৃষকদের তুষ্ট করে।

লুথার প্রকাশ্যভাবেই শোষকশ্রেণীকে সহায়তা করিতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন,—বিদ্রোহের মত ধর্মদ্রোহী ও অনিষ্টকর কাজ নাই; বিদ্রোহীকে যে কোন শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

জার্মানির উত্তরদিকে থুরিঞ্জিয়াতেই বিদ্রোহীরা সংকল্পে দৃঢ় থাকে। এখানে টমাস মুঞ্জার মজুর, শহরের গরীব এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন।

শহরের গরীবদের সহায়তায় তিনি মুলহাউসে একটি সাম্যবাদী সংঘের সৃষ্টি করেন। ইহারা দুইমাসের অধিক শহর নিজেদের দখলে রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামন্তপ্রভুরা শহর জয় করে এবং টমাস মুঞ্জার নিহত হন। নিষ্ঠুর হস্তে বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের পরে কৃষকের অবস্থা পূর্বের চেয়েও শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব জার্মানিতে অত্যন্ত উৎকট রকমের ভূমিদাস প্রথার প্রবর্তন হয়; কৃষকদের জন্য জমি তো নাই-ই, আছে শুধু দারিদ্র্য ও অভাব।

যে কারণে ফ্রান্সের জেকুয়ারী বিদ্রোহ এবং ওয়াট টাইলরের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের কৃষকদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছিল, সেই কারণেই বর্তমান বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে কৃষকেরা কখনও শ্রমিক দলের নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব সফল করিতে পারে না। তখন জার্মানিতে এইরূপ একটি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সবে মাত্র জন্ম হইয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর তখনকার বিকাশের অবস্থায় কখনও তাহাদের নিকট হইতে বিপ্লবোচিত নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যায় না। কৃষকেরা কেন নিজেরা নেতৃত্বভার নিতে পারে না? লেনিন বলেন, 'কৃষকেরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে; সংঘবদ্ধতা ছাড়া নেতৃত্ব সম্ভব নয়।'

জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণী কৃষকদের বিদ্রোহ সমর্থন করে নাই। সামন্ত-তন্ত্রের সঙ্গে লড়িতে পারে, বুর্জোয়া তখনও তত শক্তি অর্জন করে নাই। রাজার শক্তি বৃদ্ধি, সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা হ্রাস, রোমের প্রভুত্ব হইতে মুক্তি, পার্থিব ব্যাপারে চার্চের ক্ষমতার বিলোপ—এইটুকুতেই বুর্জোয়া সন্তুষ্ট।

কৃষকের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার নয় বছর পর ওয়েস্টফেলিয়ার মুনস্টার শহরে কারিগর এবং শহরের অন্যান্য গরীবেরা বিদ্রোহ করে এবং শহর দখল করে। বিশপের সৈন্যরা শহর অবরোধ করিয়া রাখে বটে, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাহা পুনর্দখল করিতে পারে নাই। নাগরিকেরা শহরে সাম্যতন্ত্র প্রবর্তন করে এবং যৌথ জীবন যাপন করিতে থাকে। সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় বটে, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় নাই। জার্মানির শোষকশ্রেণী ভাবিল অন্যান্য শহরগুলিও মুনস্টারকে অনুসরণ করিতে পারে; তাই তাহারা বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া বিশপের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসে। একবছর পর মুনস্টার শহরের পতন হয়।

জনগণের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরাজয় হয়; জয়লাভ করেন নরম-পন্থী লুথার। বুর্জোয়া ধর্মের বিরোধী নয়; লুথারের সংস্কারের মধ্যে ইহারা এমন একটা ধর্ম পাইল যাহা তাহাদের স্বার্থের পরিপোষক। ক্যাথলিক চার্চ অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নানা উপলক্ষে ছুটির দিন, চার্চের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ, কৃষকের নিকট

হইতে নানারকমের আদায়—এগুলিতে বুর্জোয়ার ব্যবসায় এবং শোষণ নির্বিঘ্নে চলিতে পারিত না।

লুথারের চার্চে ধর্মযাজককে সোজা রাজার অধীনে আনা হয়; চার্চের ক্রিয়াকাণ্ড সহজ করিয়া দেওয়া হয়; পবিত্র ধর্মগ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া লওয়া হয়। এঙ্গেলসের ভাষায়, বুর্জোয়া তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থের উপযোগী একটা সস্তা ধর্ম লাভ করে।

(৩)

ষোল শতকে বাণিজ্যে ও শিল্পে ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে হল্যাণ্ডই ছিল সকলের চেয়ে উন্নত। তখন এনটোয়ার্প পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। হল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক যদিও সেখানে বুর্জোয়ার শক্তিই তখন সকলের চেয়ে বেশী। রাজা এবং ক্যাথলিক চার্চই সে সময়ে বুর্জোয়ার বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। হল্যাণ্ড তখন স্পেনের পঞ্চম চার্লসের অধীনে; পঞ্চম চার্লস একসঙ্গে স্পেনের রাজা, জার্মানির সম্রাট এবং আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলির অধিপতি। এই ক্ষুদ্র দেশটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সকলের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং এখানে অবাধ শোষণের সুবিধা খুবই।

ষোল শতকের মধ্যভাগে ফরাসী প্রচারক ক্যাল্‌ভিন নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। বুর্জোয়াদের মধ্যে যাহারা একটু উগ্র তাহারা ক্যালভিনের মত গ্রহণ করে। চার্লসের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ফিলিপের সময়ে ওলন্দাজদের উপর অত্যাচার এবং শোষণ এত বাড়িয়া যায় যে তাহারা বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহীরা ক্যাথলিক চার্চগুলি ভাঙিয়া দিতে থাকে। কারিগর, শিক্ষানবীশ এবং অন্যান্য শ্রমিকেরাই বিদ্রোহের সৈনিক। কিন্তু ইহাদের নেতা বুর্জোয়া। শীঘ্রই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হল্যাণ্ডের সবচেয়ে ধনবান অভিজাত উইলিয়ম অফ্ অরেঞ্জ। প্রথমটায় স্পেনের সৈন্যরাই জয়লাভ করিতে থাকে; কিন্তু বিপদ দেখিয়া ওলন্দাজেরা বাঁধ খুলিয়া দেয়; বন্যার জলে চারিদিক ভাসিয়া যায়। ফিলিপের সৈন্যরা পলাইয়া প্লাবনের হাত হইতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করে।

স্বাধীনতা লাভ করার পরেও হল্যাণ্ড অনেকদিন পর্যন্ত স্পেনের ও পর্তুগালের উপনিবেশগুলি হাত করার জন্য যুদ্ধ করে। বাণিজ্যে হল্যাণ্ডেরই এখন শ্রেষ্ঠ স্থান। শিল্পের দিক হইতেও হল্যাণ্ডই সকলের চেয়ে উন্নত। এক ইউট্রেক্ট শহরেই সিল্ক এবং পশমের কারখানায় তখন ৫০,০০০ শ্রমিক; সারা হল্যাণ্ডে কাপড়ের কারখানাগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬,৬০,০০০।

ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব

(১)

ষোল শতকের শেষদিকে এবং সতর শতকের গোড়ায় ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে নানারকম পরিবর্তন দেখা দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কৃষকদের উপর ভূস্বামীর আক্রমণ। তখন বাজারে পশমের দর খুব বেশী; উচ্চদরে পশম বিক্রয় হইত। ভূস্বামীরা মেষপালনের জন্য চারণভূমি বাড়াইতে থাকে। যৌথভূমি গ্রাস না করিয়া আয়তন বাড়ানো সম্ভব নয়। ভূস্বামীরা ব্যবস্থা করে, যার দখলে যত জমি সে যৌথভূমির তত অংশ পাইবে। ভূস্বামীর দখলে জমি বেশী; অতএব যৌথভূমিরও বেশী অংশ তাহাদেরই। ভূস্বামীর পরেই ছিল বড় কৃষকদের ভাগ। মাঝারি ও ছোট কৃষকেরা প্রায় বঞ্চিতই থাকিত। সবচেয়ে মন্দভাগ্য জমিহীন কৃষক। ভূস্বামীরা ইহাদের বাড়ির সংলগ্ন বাগানও আত্মসাত করে।

যৌথভূমি ভাগ হওয়ায় ইংলণ্ডের অধিকাংশ কৃষকই সর্বস্বান্ত হয়।

এই সময়ে গ্রামে একদল ধনবান, সম্পন্ন কৃষকের আবির্ভাব হয়। সাধারণ কৃষকের চেয়ে ইহাদের চাষ-আবাদ একটু উন্নত ধরনের। ইহাদের লাঙ্গলটানার ঘোড়া বেশী, চাষের যন্ত্রপাতি বেশী; জমিতে সার দেওয়া হয়, তাই জমিও ভাল। এইসব কৃষকের সঙ্গতি ও সচ্ছলতার কারণ তাহাদের নিজেদের খাটুনি নয়; ছোট এবং মাঝারি কৃষককে শোষণ করিয়াই তাহারা বড় হয়। বীজের অভাব হইয়াছে, নূতন ফসল উঠিতে এখনও কিছু দেরী, ঘরে খাওয়ার কিছু নাই, একটা গরু কিংবা ঘোড়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, লাঙ্গল অকেজো হইয়া পড়িয়াছে, অথবা মনিবের খাজনা ও রাজার টেক্স দেওয়ার টাকা নাই.—অতএব বড় কৃষক অভাবগ্রস্ত কৃষককে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে। উচ্চসুদে তাহাকে টাকা দেয়; সে ঋণ শোধ করে টাকায় কিংবা ফসলে। এইভাবে সে তাহার সামান্য জমিটুকু খোয়ায়।

নূতন যৌথজমির অংশ দখলে লইয়াই ভূস্বামী এবং বড় কৃষক তাহা ঘেরাও করে। এনক্লোজারের* কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যৌথ-জমির অংশই নয়, ইজারাদাররা বংশপরম্পরায় যে সব জমি চাষ করিয়া

* Enclosure

আসিতেছে তাহাও বাদ যায় না। পশম হইতে মুনাফা হয় বেশী, তাই ভূস্বামী মেষ পালন করে আগের চেয়ে অনেক বেশী; ইহাদের জন্য চাই সুবিস্তৃত চারণভূমি। এই কারণেই ভূস্বামী ও কৃষকেরা সাধারণ কৃষককে বেদখল দিতে থাকে। টমাস মুর* তাই লিখিয়াছিলেন, 'মেষ মানুষকে গিলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে'।

এনক্লোজার সুরু হওয়ায় সামন্তপ্রথা দুর্বল হইয়া পড়ে। নূতন 'ভদ্রলোক'-শ্রেণীর ভূম্যধিকারী সৃষ্টি হয়; বাজারের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জমিতে ইহারা সার দেয়, জলাভূমি উদ্ধার করিয়া চাষের উপযোগী করে। ভূমিদাসদের দ্বারা চাষ না করাইয়া অল্প মজুরিতে মজুর খাটানোই ইহারা লাভজনক মনে করে। ভূমিদাসের বদলে মজুর খাটানোয় গ্রামে পুঁজি-তন্ত্রের প্রবর্তন হয়।

কিন্তু ইংলণ্ডের সব জায়গায় সমানভাবে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হয় নাই। উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলে তখনও সামন্ততন্ত্রের চিহ্ন ছিল। পূব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে শিল্পের, বিশেষত পশম এবং বস্ত্র শিল্পের বিকাশ হয় অনেক আগে হইতেই। এই সব শিল্পের কাজ হইত গ্রামেই বেশী; শহরে গিল্ডের নিয়মকানুন ছিল শিল্পের বিকাশের পথে অন্তরায়। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক কৃষকের ঘরেই তাঁত চলিত। গ্রামের তৈয়ারী জিনিসে যে শুধু স্বদেশের বাজারের চাহিদাই মিটিত তাহা নয়, বিদেশের বাজারেও তাহা চালান দেওয়া হইত।

গ্রামের কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে ছিল ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের জন্য এবং নূতন নূতন উপনিবেশ দখলের জন্য সে সময়ে কতকগুলি কোম্পানী গড়িয়া উঠে; রাষ্ট্র হইতে উহাদের সাহায্য দেওয়া হইত। কোম্পানীগুলিকে এক একটা এলাকায় এক-চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হইত। এইরূপ সুবিধা দেওয়ার কারণ কি? টেক্স হইতে যে আয় হইত তাহাদ্বারা রাজার সকল রকম খরচ নির্বাহ হইত না। এদিকে নূতন টেক্স ধার্য করিতে হইলে পার্লামেণ্টের সম্মতি দরকার। সুতরাং এত হাঙ্গামায় না গিয়া রাজা কোম্পানীগুলিকে নানা-রকম সুবিধা দিত এবং উহার বিনিময়ে মোটা টাকা লইত। শুধু বিদেশের উপনিবেশগুলিতেই নয়, স্বদেশেও সাবান, লবণ, চামড়া, তামাক প্রভৃতি নানা-রকম দ্রব্য সরবরাহেও ছিল উহাদের একচেটিয়া অধিকার।

কোম্পানীগুলির একচেটিয়া ব্যবসায়; সুতরাং ইহারা ইচ্ছামত দাম চড়াইত। এই কারণে জনসাধারণকে ভুগিতে হইত। এদিকে অধিকাংশ

---

* Thomas More

বুর্জোয়াই যৌথ কারবারগুলির একচেটিয়া অধিকারে অসন্তুষ্ট ছিল। এই একচেটিয়া অধিকারের দরুন শিল্পের প্রসার সম্ভব হইত না।

এ সময়ে রাষ্ট্রের বাজেটে ক্রমাগত ঘাট্‌তি পড়িতে থাকে। আয়ের বেশী অংশই খরচ হইতে রাজার অমাত্য ও অনুচরদের জন্য; তাহা ছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহের বিপুল খরচ তো ছিলই। ঘাট্‌তি পূরণের জন্য রাজা যখন নূতন টেক্সের প্রস্তাব করে, তখনই বিরোধ উপস্থিত হয় পার্লামেণ্টের সঙ্গে। পার্লামেণ্টের চতুর্দিকে দাঁড়ায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া; রাজার সমর্থন করিতে থাকে সামন্ত অভিজাতেরা।

(২)

বার শতকের শেষ দিকে এবং তের শতকের প্রথম দিকে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংরেজ রাজাদের যুদ্ধ প্রায় লাগিয়াই ছিল; রাজারা সামন্ত জমিদারদের যুদ্ধের জন্য টাকা দিতে এবং যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিত। রাজা জন্‌ ফ্রান্সের নিকট যুদ্ধে হারিয়া গেলে, সামন্তরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ধর্ম-যাজকেরাও সামন্তদের পক্ষে দাঁড়ায়। রাজা বিদ্রোহীদের দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাগনাকার্টা নামক সনন্দে স্বাক্ষর করেন। লর্ডদের একটি পরিষদ* গঠিত হয়; এই পরিষদ রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। রাজা জনের পুত্র তৃতীয় হেন্‌রী সনন্দের শর্তগুলি ভঙ্গ করেন; সামন্তরা আবার বিদ্রোহ করে এবং নূতন পরিষদ গঠন করে; এই পরিষদই পরে পার্লামেণ্ট নামে অভিহিত হইতে থাকে। ১২৬৫ সনে প্রথম পার্লামেণ্ট বসে; উহাতে সামন্ত, ধর্মযাজক ও শহরের নাগরিকদের প্রতিনিধিরা ছিল। চৌদ্দশতকে পার্লামেণ্ট দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়—প্রথমটি অভিজাত জমিদারদের, দ্বিতীয়টি ছোট ভূস্বামী এবং নাগরিকদের। প্রথমটিকে বলা হয়, 'হাউস্‌ অফ্‌ লর্ড‌স্‌,' দ্বিতীয়টিকে 'হাউস্‌ অফ্‌ কমন্স'।

সতর শতকে এই পার্লামেণ্টের সঙ্গেই রাজার বিরোধ অত্যন্ত তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। টাকার সমস্যা বাদেও চার্চের সংস্কারের প্রশ্নটিও তখন প্রবল হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের চার্চের যথেষ্ট আয় ছিল। ইওরোপের অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডের চার্চেরও কর্তা রোমের পোপ। রাজারা পোপের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করিতে পারিত না। পোপ রাজা অষ্টম হেনরির বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মতি দিতে রাজী হন নাই; এই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটি হইতেই ইংলণ্ডের রাজা রোমের পোপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে

* Council of Lords

ইংলণ্ডের চার্চ রাজার অধীনে আসে, রাজাই এখন চার্চের কর্তা। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু চার্চের আমূল সংস্কার করা কখনও রাজার ইচ্ছা নয়, কেননা রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে চার্চ গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বদাই রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিবে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে একদল চার্চের গণতন্ত্র-সম্মত সংস্কার দাবি করিতে থাকে। ইহাদের বলা হয় 'শুচিতা-বাদী' বা পিউরিটান*। পার্লামেণ্টে অনেক পিউরিটান সদস্য ছিল। ইহারা পার্লামেণ্টে চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকে; অবশ্য টাকা এবং টেক্সের প্রশ্নই ছিল তাহাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয়। পার্লামেণ্ট টেক্সের প্রস্তাব মঞ্জুর করে না। রাজারা পার্লামেণ্টকে উপেক্ষা করিয়াই টেক্স ধার্য করিতে চায়। ফলে সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠে। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লস্ পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভাঙ্গাই বন্ধ করিয়া দেন। এগার বছর এই ভাবে চলে; পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়াই টেক্স ধার্য এবং আদায় হইতে থাকে।

প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় স্কটল্যাণ্ডে; ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্কটরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে। অবস্থা আশংকাজনক ভাবিয়া রাজা পার্লামেণ্ট ডাকেন; কিন্তু এই অস্থায়ী পার্লামেণ্ট† যুদ্ধের জন্য কোন টাকা মঞ্জুর করিতে রাজী হয় নাই। এই পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজা নূতন পার্লামেণ্ট ডাকেন; কিন্তু নূতন পার্লামেণ্ট আরও বেশী উগ্র এবং অবাধ্য। এই সময়ে রাজার স্বেচ্ছা-চারিতায় বিরক্ত হইয়া লণ্ডনের অধিবাসীরা চঞ্চল হইয়া উঠে; তাহারা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। রাজার প্রধান উপদেষ্টা আর্কবিশপ 'লড্'কে তাহারা হত্যা করিতে উদ্যত হয়; কোন ক্রমে তিনি বাঁচিয়া যান। যে কোন সময় সত্যকার বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। রাজা এবার আর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে সাহস পান নাই; বরং জনসাধারণের কতকগুলি দাবি মিটাইতে রাজী হন। এই পার্লামেণ্ট ছিল দীর্ঘকাল স্থায়ী; এজন্য ইহাকে বলা হয় 'লং'-পার্লামেণ্ট‡।

'লং'-পার্লামেণ্ট নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন; তাই সদস্যরা লর্ড চ্যান্সেলার স্টাফোর্ড এবং আর্কবিশপ লডের বিচার দাবি করে; বিচারে দুই-জনই দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়। পার্লামেণ্টের দাবিতে রাজা বহু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে উচ্চ রাজপদ হইতে সরাইতে বাধ্য হন। অবশেষে, পার্লামেণ্টে আইন পাস হয়—রাজা পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া স্বেচ্ছায় কোন কর ধার্য করিতে পারিবেন না। সমস্ত দাবিই আদায় করা

---

* Puritan ; † Short Parliament ; ‡ Long Parliament

হয় বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়া। জনসাধারণের আন্দোলন এবং বিক্ষোভের পুরোভাগে ছিল কারিগর, শিক্ষানবীশ এবং জার্নিম্যানেরা।

রাজা বাহ্যত জনসাধারণের দাবি মিটানোর মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গোপনে তিনি প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ইংলণ্ডের উত্তর অংশে সামন্তদের প্রভুত্ব; তিনি সেখানে পলাইয়া যান এবং ১৬৪২ সালের অগস্ট মাসে পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

(৩)

ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়; সারা ইংলণ্ড দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। উত্তর অঞ্চলে সামন্ত প্রভুদের প্রাধান্য; ইহারা রাজার প্রধান সমর্থক। কিন্তু ইংলণ্ডের পূর্ব-দক্ষিণ অংশই সবচেয়ে সমৃদ্ধ; এই অঞ্চল শিল্পোন্নত। এখানকার জনসাধারণ পার্লামেণ্টের পক্ষ গ্রহণ করে। লণ্ডন শহরের বণিক, ব্যাঙ্কার, কারিগর সকলে পার্লামেণ্টের পক্ষে দাঁড়ায়।

গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকটায় রাজার সৈন্যরাই বেশ একটু সুবিধা করে; রাজার সৈন্য এবং সেনাপতিরা যুদ্ধকার্যে অভিজ্ঞ, ভালভাবে অস্ত্র সজ্জিত। কিন্তু পার্লামেণ্টের পক্ষে যাহারা যুদ্ধ করিতে আসে, তাহারা সকলে একই শ্রেণীর লোক ছিল না; সুতরাং তাহাদের মধ্যে একতার অভাব হয়। প্রথম হইতেই গ্রামের কৃষক ও মজুর, শহরের কারিগর ও শ্রমিক গৃহযুদ্ধকে বৈপ্লবিক রূপ দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। তাই বুর্জোয়ার নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাদের লড়াইয়ের কায়দা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব, ইহাদের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা ছিল অনন্যসাধারণ।

বিপ্লব অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু রাজার বিরোধী শিবিরে বিরোধ ফুটিয়া উঠে। যতটুকু নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ, বুর্জোয়া তাহার বেশী যাইতে চায় না। পার্লামেণ্টে ইহারা সামন্ত প্রথার যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল তাহার বিরুদ্ধে আইন পাস করে; রাজার চার্চের এবং সামন্ত ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়। সামান্য মূল্যে বুর্জোয়া মালিকেরা এইসব জমি কিনিয়া লয়। টেক্স এমনভাবে ধার্য করা হয় যেন বুর্জোয়ার উপর কোন চাপ না পড়ে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসানো হয়; ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মজুর, কৃষক এবং অন্যান্য সাধারণ লোকেরা। এই ব্যবস্থায় ইহাদের চড়াদামে জিনিস কিনিতে হয়।

শ্রেণী-সংঘর্ষ এখন তীব্রতর হয়; পার্লামেণ্টের নিজের সৈন্যবাহিনীই পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনীর

সংস্কার করা হয়; ইহাতে জনসাধারণের ক্রোধ কতকটা প্রশমিত হয়। নিচের স্তরের সেনাপতি ও কর্মচারীরা এখন সকলেই কারিগর কিংবা কৃষকশ্রেণীর; কয়েকটি উচ্চস্তরের সেনাপতির পদও ইহাদের মধ্য হইতে পূরণ করার ব্যবস্থা হয়। সেনাবাহিনীকে গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে ঢালিয়া সাজানোর ফলে সাধারণ সৈন্যরাও রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দেয় এবং রাজনৈতিক দাবিদাওয়া লইয়া আন্দোলন করে। এইভাবে সেনাবাহিনী যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে।

জেনারেল ফেয়ারফেক্স ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ; কিন্তু তাহার সহকারী অলিভার ক্রমওয়েলের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা।

ক্রমওয়েল জনসাধারণের লোক ছিলেন না। তিনি একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী; সামন্ততন্ত্রের তিনি ঘোর বিরোধী। পার্লামেণ্টের আপসের পথ তিনি পছন্দ করিতেন না। রাজকীয় বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া চূড়ান্ত জয়লাভ করাই ছিল তাহার চেষ্টা। তাহার অধিনায়কত্বে জনসাধারণের বাহিনী রাজাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

সে সময়ে চার্চের যাহারা সংস্কার চাহিত তাহারা দুইটি দলে ভাগ হইয়া যায়। নরমপন্থীদের বলা হয় 'প্রিস্‌বিটারীয়ান্‌'; ইহারা বিশপের পদ উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী; ইহাদের মতে চার্চ পরিচালনা করিবে নির্বাচিত পাদ্রীরা এবং চার্চের উপর থাকিবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। অপর দলকে বলা হয় 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।' ইহারা চার্চকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী; ইহাদের মতে ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার; স্বাধীন গণতন্ত্রী ধর্মপ্রতিষ্ঠানই চার্চ পরিচালনা করিবে। ক্রমওয়েল এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'-দের দলের।

সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা তখন যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে; পার্লামেণ্টে যে-সব সদস্য রাজার পক্ষীয় ছিল সেনাবাহিনী তাহাদের তাড়াইয়া দেয় এবং নিজের পক্ষীয় লোক দিয়া পার্লামেণ্ট ভর্তি করে। এই সময়ে ক্রমাগত কয়েকবার পার্লামেণ্টের সেনাবাহিনীর হাতে রাজার সৈন্যদের পরাজয় হয়; রাজা স্কটল্যাণ্ডে পলাইয়া যান, কিন্তু স্কটরা তাহাকে পার্লামেণ্টের হাতে সমর্পণ করে। বুর্জোয়া এবং অভিজাতদের মধ্যে যাহারা বুর্জোয়ার সমর্থক, তাহারা ভাবিল যে বিপ্লবের কাজ সমাধা হইয়াছে। রাজার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, রাষ্ট্রক্ষমতা এখন পার্লামেণ্টের হাতে; সামন্ত-তন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিলোপ করা হইয়াছে। কিন্তু জন-সাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; বিপ্লব হইতে তাহারা কিছুই পায় নাই। জনসাধারণ তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি চায়, রাজনৈতিক অধিকার

চায়, ধর্মের ব্যাপারে আরও বেশী স্বাধীনতা চায়। অসন্তোষ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে।

সেনাবাহিনীর অনেকেই ছিল 'লেভেলার' দলের। ভূস্বামীরা যৌথভূমির যে-সব জমি দখল করিয়া ঘেরাও করিত, তাহা ভাঙ্গিয়া সমান করিয়া দিত এই লেভেলাররা। লেভেলাররা ঘেরাও করা জমির প্রত্যর্পণ দাবি করে; তাহা ছাড়া ইহাদের দাবি ছিল—রাজার ক্ষমতার বিলোপ, হাউস্ অফ্ লর্ডসের বিলোপ এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার। লেভেলারদের প্রভাবে সেনাবাহিনী একটা প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত হয়। শুধু সেনাবাহিনীতেই নয়, বাইরেও ইহাদের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমওয়েল এই বৈপ্লবিক শক্তিকে ভাঙ্গিয়া দিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সেনাবাহিনীর গণতান্ত্রিক কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি উহার জায়গায় সামরিক কর্মচারীদের কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাবাহিনী নূতনভাবে সংগঠিত করিয়া ক্রমওয়েল বিপ্লববিরোধীদের পার্লামেণ্ট হইতে বিতাড়িত করেন। তখনও পার্লামেণ্টে কিছু কিছু রাজার সমর্থনকারী সদস্য ছিল। পার্লামেণ্ট এখন সম্পূর্ণভাবে সামরিক বিভাগের অধীন। ক্রমওয়েল রাজার বিচারের জন্য একটি ট্রাইবিউন্যাল গঠন করেন; জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজা দোষী সাব্যস্ত হন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া মে মাসে ক্রমওয়েল ইংলণ্ডকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেন। এইভাবে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইংলণ্ডে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪)

যে সময়ে বুর্জোয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন ইংলণ্ডের চরম দুর্দিন। গৃহযুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সকল জিনিসেরই দাম চড়া, কিন্তু মজুরি বাড়ে নাই। এদিকে, কর বৃদ্ধি হইয়াছে প্রতি বছরই। গৃহযুদ্ধের পূর্বে শিল্পের প্রসার হইতেছিল, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সঙ্কুচিত হওয়ায় শিল্পের অবনতি হইতে থাকে। আভ্যন্তরিক বাজারে কেনা-বেচা কম, কেননা সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশের বাজারও বন্ধ; ইওরোপের অধিকাংশ দেশই নূতন গভর্নমেণ্টকে মানিয়া লইতে চায় না।

স্কটল্যাণ্ডে নূতন গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে রাজতন্ত্রীদের একটা দল খাড়া হয়। আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও বৈপ্লবিক

আন্দোলন মন্দীভূত হয় নাই, বরং বিস্তার লাভ করিতে থাকে। দেশে নূতন একটা বৈপ্লবিক দলের সৃষ্টি হয়, ইহাদের বলা হয় ডিগার।* ইহারা মনে করিত যৌথভূমির জমি দখল করিয়া চাষ করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত; এই জমির জন্য কাহারও অনুমতি লওয়া অথবা কাহাকেও খাজনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাহারা জমি দখল করিয়া চাষ করিতে থাকে। পার্লামেণ্টের সৈন্যরা ইহাদের জোর করিয়া জমি হইতে তাড়াইয়া দেয়। ডিগারদেরই নয়, লেভেলারদেরও জোর করিয়া দাবাইয়া দেওয়া হয়। ক্রমওয়েল বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করিয়াই আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। উভয় দেশের বিদ্রোহই তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। বুর্জোয়ার জয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বৈদেশিক গভর্ন-মেণ্টগুলি নূতন সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লয়; ইংলণ্ড আবার বিদেশের বাজারে মাল চালান দিতে থাকে। বাণিজ্যের ব্যাপারে হল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে বিরোধ বাধে; শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডেরই জয় হয়।

বৈদেশিক নীতিতে সাফল্য, বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন এবং অর্থনৈতিক সংকট হইতে ত্রাণ,—বুর্জোয়া মনে করিত এসবের জন্য কৃতিত্ব ক্রমওয়েলের। তাই ক্রমওয়েল তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, বুর্জোয়া তাহাতেই সায় দিত। ক্রমওয়েল ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নিজেকে ইংলণ্ডের একনায়ক ঘোষণা করিলেন। সারা জীবন তিনি এই পদে বহাল থাকিবেন।

ক্রমওয়েলের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। তিনি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া দমন করিয়াছেন, বৈপ্লবিক আন্দোলন দাবাইয়াছেন। তাহার রাজনৈতিক ভূমিকা শেষ হইয়াছে। সকলেই ক্রম-ওয়েলের একনায়কত্বে বিরক্ত হইয়া উঠে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়। বুর্জোয়া দেখিল, সামরিক কর্তৃত্ব হইতে রেহাই পাওয়ার একমাত্র পথ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে বসানো হইল। পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় বটে, কিন্তু সামন্ততন্ত্র চিরতরে লুপ্ত হয়। যে শ্রেণী চার্লসকে সিংহাসনে বসাইয়াছে, রাজা সেই শ্রেণীর অধিকার স্বীকার করিয়া লন; আরও অনেক নূতন নূতন সুবিধাও দেন।

বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। তাহাদের হাতে পুঁজি জমিতে থাকে; জনসাধারণের দারিদ্র ও উপনিবেশের লুঠের উপরই বুর্জোয়ার এই সমৃদ্ধি, শিল্প হইতেও যথেষ্ট ধনাগম হইতে থাকে। কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের বস্ত্র তখন প্রতিবছর বিদেশে রপ্তানি হইত। সারাদেশ পুঁজি-

---

* Diggers

তন্ত্রের প্রভাবে আসে; কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াও ভাসা-ভাসাভাবে দেখা দেয়। রাজা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। দেশে রাজার পক্ষে একটা দল দাঁড়ায়; ইহাদের বলা হয় টোরি—আজিকার কনসারভেটিভ্ বা রক্ষণশীলরা এই দলেরই। বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক দলকে বলা হয় 'হুইগ',—ইহারাই এযুগের উদারনৈতিক। একদল রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চায়, অন্যদল পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চায়। গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে; কিন্তু নূতন করিয়া আবার যুদ্ধ কেহই চায় না। শেষ মুহূর্তে উভয়দলই স্টুয়ার্ট রাজবংশকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া দিতে রাজী হয়।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে দুইদলের মধ্যে একটা রফা হয়; স্থির হয় যে উইলিয়ম অফ্ অরেঞ্জকে সিংহাসনে বসানো হইবে। নূতন রাজা সিংহাসনে বসিয়া জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে সনদে স্বাক্ষর করেন। রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই; পার্লামেন্ট যে-সব আইন পাস করিবে, রাজা তাহাতে মাত্র স্বাক্ষর দিবে। এই রকম শাসনতন্ত্রকে বলা হয় নিয়মানুগ রাজতন্ত্র।*

মার্কস বলেন, ১৬৮৮'র শাসনতন্ত্র ভূস্বামী ও পুঁজিতন্ত্রীকে যুক্তভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

---

* Constitutional monarchy

ফরাসী বিপ্লব

এযুগে সরকারের টেক্স দিতে হয় শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলকেই। আমরা কখনো ভাবিতেই পারি না, কোন একটি দেশের গভর্নমেণ্ট সেই দেশের এক শ্রেণীর নিকট হইতে টেক্স নেয়, অন্য শ্রেণীকে টেক্স হইতে রেহাই দেয়। এখন এরকম হয় না বটে, কিন্তু আঠার শতকের ফরাসী গভর্নমেণ্ট তাহাই করিত। বড়লোক অভিজাত ও ধর্মযাজকদের কোনরূপ টেক্স দিতে হইত না, সমস্ত টেক্স দিতে হইত গরীব জনসাধারণকে।

ফ্রান্সের গভর্নমেণ্ট যখন প্রায় দেউলিয়া হইতে চলিয়াছে, আয়ের চেয়ে খরচ অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে—তখন ফ্রান্সের কোন কোন মহৎ ব্যক্তি ভাবিলেন, এতদিন যাহারা বিশেষ সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে তাহাদের উপরও টেক্স ধার্য করা সঙ্গত; মাত্র একটি শ্রেণী হইতে টেক্স লইয়া রাষ্ট্রের বিরাট ঘার্টতি পূরণ করা সম্ভব নয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অর্থসচিব টারগট* রাষ্ট্রের টেক্স ব্যবস্থায় কিছু সংস্কার করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বড়লোকেরা বাধা দেয়। ইহাদের যুক্তি,—'যাহাতে কাহারও সম্পত্তির উপর হাত না পড়ে তাহা দেখাই আইনের একমাত্র কর্তব্য নয়; সামাজিক মর্যাদার দরুন প্রত্যেকেরই যে সমস্ত জন্মগত অধিকার রহিয়াছে তাহা রক্ষা করাও আইনের কর্তব্য। সকলের নিকট হইতে টেক্স আদায় করিয়া শ্রেণীগত ভেদাভেদ তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে, সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ফরাসী রাজতন্ত্রের গঠন অনুযায়ী সমাজের তিনটি শ্রেণী বা এস্টেট্† তিন রকমে রাষ্ট্রের সেবা করে। ধর্মযাজক লোককে সৎ-শিক্ষা দেয় এবং রাজার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে; অভিজাত রাজাকে সদুপদেশ ও সশস্ত্র শক্তিদ্বারা রক্ষা করে; সকলের নিচের শ্রেণী অর্থাৎ জনসাধারণ অন্য আর কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং টেক্স ও কায়িক শ্রমদ্বারা সমাজের সেবা করাই ইহাদের কাজ। এই বিভেদ উঠাইয়া দিয়া সমতা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ সমাজের শাসনকাঠামোর সর্বনাশ ডাকিয়া আনা।'

ধর্মযাজক ও অভিজাতই ছিল সমাজের বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত শ্রেণী। ইহাদের বলা হয় যথাক্রমে প্রথম এস্টেট্ ও দ্বিতীয় এস্টেট্। ধর্মযাজকদের

---

* Turgot † Estate

সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০,০০০ এবং অভিজাতদের ১৪০,০০০। ইহারা ধনী-শ্রেণীর হইলেও ইহার অর্থ এই নয় যে সকলেই ধনবান ছিল এবং সকলেই কোনরূপ কাজ না করিয়া চলিতে পারিত। গরীব পাদ্রী এবং গরীব অভিজাতও যথেষ্ট ছিল।

জনসাধারণেরই সমাজে কোন অধিকার ছিল না; ইহাদের বলা হয় তৃতীয় এস্টেট্। ফ্রান্সের ২৫,০০০,০০০ লোকের মধ্যে ইহারাই শতকরা ৯৫ জন। ইহাদের সকলের অবস্থাই যে সমান ছিল তাহা নয়। অন্তত ২৫০,০০০ লোকের অবস্থা ছিল অন্যদের তুলনায় খুবই ভাল; ইহারা উচ্চ মধ্যবিত্ত। কারিগরদের সংখ্যা ছিল ২,৫০০,০০০; ইহারা বাস করিত শহরে। কারিগর ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ছাড়া বাকী ২২,০০০,০০০ কৃষক। ইহারা জমিতে কাজ করিত; কৃষকেরা নিজেদের সামান্য উপার্জন হইতে রাষ্ট্রকে দিত টেক্স; ধর্মযাজককে টাইথ্ এবং ভূস্বামী অভিজাতকে খাজনা।

সাধারণত আমরা আয় অনুসারেই ব্যয় করি; গভর্নমেণ্টও তাহাই করে। কিন্তু আঠার শতকের ফরাসী গভর্নমেণ্টের রীতি ছিল উল্টো। বেপরোয়া খরচ করিত; আয় বুঝিয়া খরচ করিত না, হিসাবের বালাই ছিল না। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা প্রমাণ হইবে। গভর্নমেণ্টের যাহাবা পেন্সন পায় তাহাদের একটা তালিকা থাকিত; ডিউক্রেস্ট নামক একজন ক্ষৌরকারের নাম দেখা গেল এই তালিকায়; তাহার নামে বরাদ্দ হইয়াছে বাৎসরিক পেন্সন ১,৭০০ লিভার। ডিউক্রেস্ট রাজার মেয়ের চুল ছাটিবে, তাই এই পেন্সন; কিন্তু মেয়ে মারা যায় অতি অল্প বয়সে। চুল ছাটার বয়সই হয় নাই। কিন্তু ডিউক্রেস্টের বছর-পাওনা ঠিকই আছে। এই রকম হাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অন্যায় খরচ হইলে উচ্চহারে টেক্স না উঠাইয়া উপায় নাই। সাধারণত আয় দ্বারা খরচ ঠিক হয়; ফরাসী গভর্নমেণ্টের বেলায় কত খরচ হইয়াছে তাহা দ্বারা ঠিক হইত কত আয় হওয়া দরকার। উপরের শ্রেণী-গুলি টেক্স দিত না, বরং তাহারাই সাধারণ লোকের নিকট হইতে কর আদায় করিত। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত উচ্চ মধ্যবিত্তরাও নানা ফন্দীতে প্রত্যক্ষ কর* এড়াইয়া চলিতে পারিত; সুতরাং সবটা চাপ পড়িত গরীবের উপর।

কৃষকের জীবনে টেক্সের ভার যে কিরূপ মর্মান্তিক ছিল তাহার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন বিখ্যাত ফরাসী মনীষি ডি-টোকুইভিল†। 'জমির উপরে ফরাসী কৃষকের গভীর আকর্ষণ; জমি কিনিতে সে তাহার সমস্ত সঞ্চয় খরচ করে; কেনার সময় প্রথমেই তাহাকে একটা টেক্স দিতে হয়।......কৃষক জমি চাষ করিতেছে; কিন্তু জমিদারের ডাকে নিজের জমির চাষ ফেলিয়া

* Direct tax † De-Tocque-ville

যাইতে হয় তাহার কাজে; তাহাও আবার বিনা মজুরিতে। জমি হইতে হরিণ তাড়াইয়া কৃষক তাহার ফসল রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু জমিদার নিষেধ জানায়। কৃষক তাহার ফসল লইয়া নদী পার হয়, জমিদারের লোক কর আদায়ের জন্য আগে হইতেই অপেক্ষা করিতে থাকে। বাজারেও আবার সেই লোকগুলি, জমিদারের প্রাপ্য চুকাইয়া তবে শস্য বিক্রয় করিতে পারে। বিক্রয়ের পর যে শস্য তাহার বাঁচে, জমিদারের জাঁতায় না ভাঙ্গাইয়া সে উহা স্পর্শও করিতে পারে না; এজন্য কতকটা শস্য না ছাড়িয়া উপায় নাই। জমিদারকে খুশী করার পর হাজির হয় পাদ্রী......তাহার প্রাপ্য সে ছাড়িবে কেন?'

মনে হয় ইহা যেন এগার শতকের চিত্র। সাতশ' বছরে কি কোন পরিবর্তন হয় নাই? পরিবর্তন হইয়াছে ঠিকই; ২২,০০০,০০০ কৃষকের মধ্যে ১৭০০ সালে মাত্র ১,০০০,০০০ ছিল আগেকার অর্থে ভূমিদাস। বাকী কৃষকেরা স্বাধীন। স্বাধীনতা পাইলেও, আগেকার রীতি পুরাপুরি বদলায় নাই। তখনও সামন্তযুগের আঁটা-আঁটি কিছু ছিলই। সামন্ততন্ত্রের অনেক কিছুই নিঃশেষ হইয়াছে, যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল কৃষকের নিকট তাহা অসহনীয় হইয়া উঠে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আয়ের শতকরা আশীভাগই কৃষককে দিতে হইত খাজনা ও টেক্স। বাকী কুড়িভাগের উপর তাহার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হইত। একবার অজন্মা হইলেই যে উপবাস ছাড়া অন্য উপায় থাকিত না তাহা না বলিলেও চলে। তখন অনেক কৃষকই ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক সাজিয়া রাস্তায় ঘুরিত।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে ফরাসী বিপ্লব হয় ১৭৮৯ সনে। আঠার শতকের ফরাসী কৃষক অবশ্য সতর শতকের চেয়ে অনেকটা সচ্ছল ছিল। বিপ্লবের অন্তত একশ' বছর আগে হইতেই ফরাসী কৃষকেরা জমি কিনিতে সুরু করে; ১৭৮৯ সন নাগাত দেখা যায় যে ফ্রান্সে এক-তৃতীয়াংশ জমি তাহাদের হাতে আসিয়াছে। জমির ক্ষুধা তাহাদের না কমিয়া বরং বাড়িয়া যায়। আগের চেয়ে অবস্থা ভাল হওয়ায় তাহারা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে নানারকম অন্যায় জুলুমের হাত হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের পশুর জীবনে ছেদ পড়িবে না। আগেও যে তাহারা এরূপ ভাবে নাই তাহা নয়। ফরাসী দেশে কয়েকবারই কৃষকের বিদ্রোহ হইয়াছে; কিন্তু সে সব বিদ্রোহে সামন্ততান্ত্রিক বিধিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় নাই। পুরাপুরি সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় অন্য শ্রেণীর সহায়তা ও নেতৃত্ব।

এই নেতৃত্ব তাহারা পায় উদীয়মান বুর্জোয়ার নিকট।

বুর্জোয়াই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করে এবং বিপ্লব হইতে নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ পুরাপুরি আদায় করে। বিপ্লব না করিয়া তাহাদের উপায় ছিল না। সামন্ততন্ত্রেরই বিশেষ একটি অবস্থায় বুর্জোয়ার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু সামন্ততন্ত্রের নিয়ম এবং কানুন ইহাদের বিকাশের পথে প্রকাণ্ড বাধা। আগেকার নিয়ম এবং কাঠামোর মধ্যে শিল্প এবং ব্যবসায়ের প্রসার সম্ভব নয়; রাষ্ট্র হইতে নূতন কানুন তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু বুর্জোয়ার তাহাতে কোন হাত নাই; শিল্প এবং ব্যবসায়ের উপর নূতন নূতন টেক্স এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদের অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ বুর্জোয়ার নিকট অসহনীয়। মুমূর্ষু সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ নির্মূল না করিলে বুর্জোয়ার পথ পরিষ্কার হয় না।

বুর্জোয়া কাহারা? লেখক, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, বিচারক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণী; বণিক, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার প্রভৃতি টাকাওয়ালা—ইহারাই বুর্জোয়া। আঠার শতকে সমাজের কাঠামো পরিবর্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তখনও সামন্ততান্ত্রিক কানুনগুলির প্রাধান্য কমে নাই। রাষ্ট্রের পরিবর্তন না করিয়া এই কানুনগুলির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাত করাই এখন বুর্জোয়ার চেষ্টা।

বুর্জোয়ার প্রতিভা ছিল, ধন ছিল—কিন্তু আইনের দিক হইতে তাহাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। একজন অভিজাতের গৃহে হয়ত টাকাওয়ালা বুর্জোয়ার নিমন্ত্রণ, কিন্তু তাহাকে খাইতে দেওয়া হয় ভৃত্যদের সঙ্গে। আত্ম-সম্মানে আঘাত পাইয়াও কত মধ্যবিত্ত পুরাতন ব্যবস্থার শত্রু হইয়াছে! বুর্জোয়ার হাতে জমি ছিল না, পুঁজি ছিল। রাষ্ট্রকে তাহারা ধার দেয়; কিন্তু সুদে আসলে টাকা ফিরিয়া পাওয়া চাই। অপব্যয়ী রাষ্ট্র; দেউলিয়া হইলে তাহাদের টাকা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। বুর্জোয়ার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু অধিকার নাই। সম্পত্তির উপর যাহাতে কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ না হয়, সে সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিল। সরকারকে তাহারা টাকা ধার দেয়, টাকা যাহাতে মারা না যায় সে সম্পর্কেও তাহাদের আশ্বস্ত হওয়া দরকার। তাই গভর্নমেণ্টে হাত থাকা চাই। এককথায়, আঠার শতকে বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক প্রাধান্য যেরূপ বাড়িয়াছে, তদনুরূপ রাষ্ট্র-নৈতিক প্রতিষ্ঠা নাই। দুইটির সামঞ্জস্য হইতে পারে একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়া। ফরাসী জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, বুর্জোয়া এই সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে ছাড়ে নাই।

ফরাসীদেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত, আগের মত চলা আর সম্ভব নয়। ফ্রান্সের তৎকালীন অর্থসচিব কেলোন* ছিলেন একজন বিশিষ্ট

---

* Calonne

অভিজাত। তিনি স্বীকার করেন যে চলতি অবস্থার ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। 'ফরাসী রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ নাই; এক প্রদেশের হয়ত কোন টেক্সই দিতে হয় না; অন্য প্রদেশকে টেক্সের সমস্তটা ভার বহন করিতে হয়। ধনীর উপর কোন টেক্স নাই, গরীবের উপরই সবটা বোঝা। একশ্রেণী এতরকম বিশেষ-সুবিধা ভোগ করে যে সামাজিক ভার-সাম্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। শাসনকার্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।' কেলোন স্বীকার করেন যে দেশশাসন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট; বিপ্লবের জন্য তাহারা প্রস্তুত। বুর্জোয়ার কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই।

ফরাসী বিপ্লবের একজন নেতা বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন উপস্থিত করেন।*

প্রথম,—তৃতীয় এস্টেট কি?—সব কিছু। দ্বিতীয়,—এতদিন ফরাসী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে উহার স্থান কি ছিল?—কিছুই না। তৃতীয়,—উহা কি চায়?—কিছু একটা হইতে চায়। তৃতীয়, এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত কারিগর, কৃষক এবং বুর্জোয়া সকলেই লড়াই করিতে থাকে 'একটা কিছু হওয়ার জন্য'; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবে লাভবান হয় বুর্জোয়া। বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব করিয়াছে বটে, কিন্তু লড়াই করিয়াছে এবং প্রাণ দিয়াছে সাধারণ লোক। জনসাধারণের প্রতিনিধি মারাট্ ঘোষণা করেন: 'বিদ্রোহের সময়ে একটির পর একটি বাধা ডিঙ্গাইয়া সাধারণ লোকেরা আগাইয়া যায়; কিন্তু প্রথমটায় ইহারা শক্তি সঞ্চয় করিলেও ধূর্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত ষড়যন্ত্রকারী-দের নিকট হার মানিতে বাধ্য হয়। উচ্চমধ্যবিত্ত একটু সুবিধা করিয়া লইয়াই জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়; কারিগর, দোকানী, কৃষক ও শ্রমিক —ইহারাই বিপ্লব সফল করে, কিন্তু অর্জিত ফল সবই হাত করে বুর্জোয়া।'

বিপ্লব সফল হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় বুর্জোয়া। যে অভিজাতেরা জন্মগত অধিকারের দাবি করিত, তাহাদের জায়গায় ব্যবসায়ীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলের মুখে তখনকার একমাত্র আওয়াজ ছিল; 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।' কিন্তু সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা শুধু বুর্জোয়ার জন্য। নেপোলিয়নের আইনবিধি বুর্জোয়ার সম্পত্তিকে নিরাপদ করিয়াছে। নেপোলিয়নের বিধির ২০০০ অনুচ্ছেদের মধ্যে মাত্র ৮টি শ্রমিকদের সম্বন্ধে। শ্রমিকদের সংঘ গড়ার এবং ধর্মঘট করার অধিকার নিষেধ হয়। কিন্তু

---

* First, what is the third Estate? Everything. Second, what has it been hitherto in our political system? Nothing. Third, what does it ask? To become something.

মালিকের সংঘ গড়ায় কোন বাধা নাই। আইনে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় যে আদালতে শ্রমিকের মজুরি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে মালিকের কথাই বিশ্বাস্য। বুর্জোয়াই এই বিধি তৈয়ার করে নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য, নিজেদের সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য।

বুর্জোয়ার উত্থান সম্পর্কে—এঙ্গেলস্

ইওরোপ যখন মধ্যযুগ কাটাইয়া উঠিতেছিল, তখন শহরের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল বিপ্লবী। এই শ্রেণী মধ্যযুগের সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট একটা স্থান কায়েম করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু যেভাবে উহার ক্ষমতা প্রসার লাভ করিতেছিল, সেই তুলনায় এই স্থান ছিল সংকীর্ণ। বুর্জোয়ার বিকাশের সঙ্গে সামন্তব্যবস্থার সঙ্গতি নাই; অতএব উহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

কিন্তু সামন্ত প্রথার প্রধান আন্তর্জাতিক কেন্দ্র রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এই চার্চই সমগ্র পশ্চিম ইওরোপকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল; চার্চ সামন্তপ্রথারই ঢোলে নিজস্ব একটা যাজকতন্ত্র গড়িয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ইওরোপে চার্চই হইয়া দাঁড়ায় সকলের চেয়ে শক্তিশালী সামন্ত প্রভু; ক্যাথলিক জগতের পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক চার্চ। সুতরাং সামন্তব্যবস্থাকে দূর করিতে হইলে, প্রথমত প্রয়োজন এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের ধ্বংস সাধন।

আমরা এখন পরিষ্কারই বুঝিতে পারি, রোমান চার্চের সঙ্গে সংঘর্ষে বুর্জোয়া কেন অগ্রণী হয়। চার্চকে ঘায়েল করিয়াই যদি সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করিতে হয়, তবে সে সময়ের প্রত্যেকটি সংঘর্ষই ধর্মের আবরণ লইতে বাধ্য। কিন্তু যখনই শহরের শিক্ষিতশ্রেণী এবং ব্যবসায়ীরা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, তখনই তাহা গ্রামের কৃষকের মধ্য হইতে একটা বলিষ্ঠ সাড়া পাইয়াছে।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার সুদীর্ঘ সংগ্রাম শেষ হইয়াছিল তিনটি বৃহৎ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে।

প্রথমটি জার্মানির ধর্মসংস্কার আন্দোলন বা প্রটেস্টাণ্ট রিফর্মেশন। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে আন্দোলন চালান, জনসাধারণ দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্রোহ দ্বারা তাহাতে সাড়া দেয়; প্রথমটি ১৫২৩ সালে নিম্ন অভিজাতদের বিদ্রোহ। দ্বিতীয়টি ১৫২৫-এর প্রকাণ্ড কৃষক বিদ্রোহ। যাহারা বিদ্রোহের নেতা তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। লুথারের সংস্কার স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে মানানসই একটা নূতন ধর্মমতের সৃষ্টি করে। লুথার যেখানে পরাজিত, ক্যালভিন সেখানে বিজয়ী।

চরমপন্থী বুর্জোয়া ক্যালভিনের ধর্মমতের মধ্যে তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিধ্বনি পায়। ক্যালভিন বলিতেন,—মানুষের ভাগ্য পূর্ব হইতে স্থির করা আছে, ব্যক্তির তাহাতে হাত নাই। এই 'প্রারব্ধবাদ' বুর্জোয়া জীবনের এবং সে সময়কার অবস্থারই ধর্মীয় অভিব্যক্তি। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে সাফল্য এবং ব্যর্থতা নির্ভর করে এমন সব অবস্থার উপরে যাহাতে মানুষের ইচ্ছা অভিপ্রায়ের কোন হাত নাই। সকল কিছুই অজ্ঞাত অর্থনৈতিক কারণে ঘটিয়া থাকে।

ক্যালভিনের ধর্মমত ছিল গণতান্ত্রিক। ক্যালভিন পুরাতন চার্চকে ভাঙিগয়া গণতন্ত্র-সম্মত করিতে চাহিয়াছিলেন। ঈশ্বরের রাজ্যকেই যেখানে ভাঙিগয়া নূতন করিয়া গড়া হয়, সেখানে কি পার্থিব রাজা, ভূস্বামীদের আধিপত্য মানিয়া লওয়া যায়? জার্মান লুথারের ধর্ম রাজারাজড়াদের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়, কিন্তু ক্যালভিনের ধর্মমত হল্যাণ্ডে একটি রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা করে এবং স্কটল্যাণ্ডে উগ্রপন্থী রিপাব্লিকান দলসমূহের জন্ম দেয়।

দ্বিতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া অভ্যুত্থান হয় ইংলণ্ডে; ক্যালভিনের ধর্মমতের মধ্যে বুর্জোয়া তাহাদের নিজেদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন দেখিতে পায়। ইংলণ্ডের এই অভ্যুত্থানের জন্ম দেয় শহরের মধ্যবিত্ত। কিন্তু জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে জনসাধারণ। প্রত্যেকটি বুর্জোয়া বিদ্রোহেই লোক যোগাইতে হইয়াছে কৃষকের; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিদ্রোহ সফল হওয়ার পর জয়েরই অর্থনৈতিক ফলাফলগুলির চাপে ধ্বংস হইয়াছে কৃষকেরাই। ক্রমওয়েলের বিদ্রোহের একশত বছরের মধ্যে ইংলণ্ডে স্বাধীন কৃষকদের অস্তিত্ব লোপ পায়। অথচ এই কৃষক এবং শহরের সাধারণ লোকদের বাদ দিয়া বুর্জোয়া কখনও লড়িয়া উঠিতে পারিত না, রাজা প্রথম চার্লসকেও ফাঁসী-মঞ্চে তুলিতে সমর্থ হইত না। ঠিক একই রকম হয় ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সে এবং ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে। মনে হয় ইহা বুর্জোয়া সমাজের বিকাশেরই একটা নিয়ম।

বৈপ্লবিক কার্যকলাপের আতিশয্য হইতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; যেমনই হউক অবশেষে একটা ভারকেন্দ্র পাওয়া যায়। ইহাই নূতন যাত্রার সুরু। উদীয়মান বুর্জোয়া এবং গতায়ু সামন্তভূস্বামীদের মধ্যে একটা আপস-রফা হয়, ইংলণ্ডে 'গোলাপের যুদ্ধের'* সময়েই পুরাতন সামন্তভূস্বামীরা পরস্পরকে উৎসাদন করিয়াছিল।। ইহাদের বংশধরেরা ততটা সামন্তঘেঁষা নয়, যতটা বুর্জোয়াঘেঁষা। টাকার মূল্য তাহারা পরিষ্কারই বুঝিয়াছিল, তাই ক্ষুদ্র

* Wars of Roses

কৃষকদের জমি হইতে তাড়াইয়া সেই সব জমির উপর ভেড়ার পাল ছাড়িয়া দেয় এবং ধনাগমের পথ প্রশস্ত করে। অষ্টম হেন্‌রী চার্চের সম্পত্তি হাত করিয়া তাহা বিলাইয়া দিয়া বহু বুর্জোয়া ভূস্বামী সৃষ্টি করেন। অভিজাতেরা শিল্প-উৎপাদনের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, বরং পরোক্ষে উহা দ্বারা লাভবান হইতে চাহিল। এই কারণেই ১৬৮৮-তে অভিজাত ও বুর্জোয়ার মধ্যে সহজেই মীমাংসা হইতে পারিয়াছিল। পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী তাহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্টভাবে সংরক্ষিত রাখিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটা অভিজাতদের হাতেই ছাড়িয়া দেয়। বুর্জোয়াও সেই সময় হইতেই শাসক-গোষ্ঠীর একটা অংশরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে বুর্জোয়া ও অভিজাতে মিলিয়া যে নূতন শাসকশ্রেণী তৈয়ারী হয়, তাহার এখন বড় কাজ হইয়া দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে দাবানো।

বিরাট ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর তৃতীয় অভিযান; ফরাসী বিপ্লবেই সর্বপ্রথম ধর্মের আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়। এই প্রথম, অভিজাতের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত বুর্জোয়া সংগ্রাম চালায়। একশ' বছর আগেকার ইংলণ্ডের বিপ্লব অতীতের রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় নাই; ফরাসী বিপ্লব কিন্তু সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছিয়া দেয়। অর্থনৈতিক বিকাশের যে স্তরটিকে মার্কস পণ্যোৎপাদন আখ্যা দিয়াছেন, সেই স্তরটিতে মানুষের যে সব ব্যবহারিক সম্পর্ক ছিল তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে রোমান আইনের মধ্যে; বিপ্লবের ফলে রোমান ব্যবহারবিধিকে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থার সঙ্গে নিপুণভাবে খাপ খাওয়াইয়া দেওয়ানী আইন রচিত হয়; ইহাই 'নেপোলিয়নের কোড্' নামে পরিচিত।

বিপ্লব যে সময়ে ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক বিজয় সুনিশ্চিত করিয়া তুলে সেই সময়ে ওয়াট, আর্করাইট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করেন। ইহার ফলে অর্থনৈতিক শক্তির ভারকেন্দ্র আর আগেকার জায়গায় থাকে নাই। বুর্জোয়ার বিত্ত এখন ভূস্বামী অভিজাতদের বিত্তের চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। ১৬৮৮'র বিপ্লবের পর দুইশ্রেণীর মধ্যে যে রফা হয় তাহা আর শ্রেণীগুলির আপেক্ষিক সংস্থানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল না। অভিজাত তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা শিল্পপতি বুর্জোয়ার দাবি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিত; নূতন অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে একটা বড় রকমের অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়। নূতন সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। আঠার শতকের রিফর্ম এ্যাক্ট, শস্যকর রহিত আইন প্রভৃতি দ্বারা শিল্পপতি-দের প্রাধান্য চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পূর্ণ নিজের শ্রেণীর স্বার্থে

ইহাই বুর্জোয়ার শেষ জয়লাভ। পরে, বুর্জোয়া যে জয়লাভই করুক না কেন,—নূতন একটি সামাজিক শক্তিকে বিজয়লব্ধ ফলের বখ্‌রা না দিয়া পারে নাই। গোড়ার দিকে এই শক্তি ছিল বুর্জোয়ার সহযোগী, পরে উহা হইয়া দাঁড়ায় এইশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহারা শ্রমিকশ্রেণী।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ

(১)

একজন মেষপালক পশম বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায় তাহা দিয়া রুটি কিনে; এখানে টাকা তাহার নিকট সাধারণ টাকাই। কিন্তু যে পশম কিনে, সে যদি আবার সেই পশম বেশী দরে বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করে তবে সেই টাকা আর তাহার নিকট টাকা নয়, তাহা হইয়া দাঁড়ায় তাহার হাতে পুঁজি।

একজন কারখানার মালিকের কথা ধরা যাউক; সে শুধু পশমই কিনিবে না, বাজারে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনিবে। নিজের কারখানায় শ্রমিককে দিয়া সে পশম হইতে কম্বল তৈয়ার করায় এবং তাহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠায়। মালিক যে মজুরি দেয়, শ্রমিক তাহা অপেক্ষা বেশী মূল্য উৎপাদন করে; এই বেশী অংশটুকুই মালিকের মুনাফা। এইরকম উৎপাদনকে বলা হয় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন। মালিক যে টাকা খাটায় তাহা পুঁজি; শিল্পে খাটানো হয়, তাই উহা শিল্প-পুঁজি।

একবার এইরূপ উৎপাদন সুরু হওয়ার পর মুনাফা ক্রমশ বাড়িতে থাকে; মুনাফা হইতে নূতন পুঁজির সৃষ্টি হয়। কিন্তু আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন সুরু হওয়ার সময়ে প্রথম পুঁজি যোগাড় হইয়াছিল কোথা হইতে? কিরূপে সর্বহারা শ্রমিকের শ্রেণীই বা সৃষ্টি হইয়াছিল? অনেকের ধারণা,—লোকে কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তাহার সবটাই খরচ করিয়া ফেলিত না; কিছু অংশ সঞ্চয় করিত। ধীরে ধীরে মিতব্যয়ী লোকদের সঞ্চয়গুলি জমিয়াই পুঁজির সৃষ্টি হইয়াছে। আসল সত্য তাহা নয়। আধুনিক শিল্পের জন্য যে বিরাট পুঁজির দরকার তাহা যে শুধু পরিশ্রমী লোকদের সঞ্চয়ের ফলে সম্ভব হইয়াছে এরূপ বলা অসংগত। ব্যবসায় হইতেই প্রথম পুঁজির সঞ্চয় হয়। সে সময়ের ব্যবসায় শুধু পণ্য বিনিময়ই ছিল না; দেশজয়, দস্যুতা, লুণ্ঠন, শোষণ—এসবও ছিল ব্যবসায়েরই অঙ্গ।

ইটালির রাষ্ট্রগুলি শুধু শুধুই ক্রুসেডের সংগঠন করে নাই; শুধু শুধুই ইওরোপের লোকদের ধর্মযুদ্ধের প্ররোচনা দেয় নাই; ক্রুসেডের পরে দেখা গেল যে ভেনিস, জেনোয়া ও ফ্লোরেন্সের বণিকেরা বিপুল সম্পত্তি হাত

করিয়াছে। পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। অনেকে মনে করেন, তের-চৌদ্দ শতকেই প্রাচ্যের লুণ্ঠিত সম্পত্তি হইতে ইওরোপে পুঁজির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই পুঁজিই কি যথেষ্ট?

পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের জন্য আরও বেশী পুঁজির প্রয়োজন। এই পুঁজির সঞ্চয় হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে ষোল শতক হইতে। কার্ল মার্কস বলিয়াছেন, 'আমেরিকায় সোনা-রূপার আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীদের দাস বানানো, প্রাচ্যের দেশগুলি জয় ও লুণ্ঠন, নিগ্রোদের ধরিয়া আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় চালান দেওয়া—এগুলি হইতে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের সূচনা; এইভাবেই হয় পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়।'

পিজারো, কোর্টেজ প্রভৃতি স্পেনবাসীদের আমেরিকা লুণ্ঠনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ওলন্দাজেরাও কম যায় নাই; অবশ্য ইহাদের শোষণের পন্থা ছিল অন্যরকম। জাভার একজন ওলন্দাজ গভর্নর একবার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, 'হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসন বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ ও নির্বিচার হত্যার ইতিহাস।' ১৬১৩ হইতে ১৬৫৩'র মধ্যে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লাভ করে প্রতিবছর ৬৪০,০০০ গিল্ডার। 'মালাক্কা হাত করার জন্য ওলন্দাজেরা পর্তুগীজ গভর্নরকে ঘুষ দেয়; গভর্নর ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদের রাজধানীতে প্রবেশ করিতে দেয়। শহরে ঢুকিয়াই তাহারা গভর্নরকে হত্যা করে, যেন ঘুষের টাকা না দিতে হয়। ওলন্দাজেরা যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই তাহারা অবাধ লুণ্ঠন চালাইয়াছে। জাভার একটা প্রদেশে ১৭৫০'এ লোকসংখ্যা ছিল ৮০,০০০; ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা কমিয়া দাঁড়ায় ১৮,০০০।'

সতর শতকে হল্যাণ্ডই ছিল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ পুঁজিতান্ত্রিক দেশ; কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের জন্য প্রথম যে পুঁজির প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সংগৃহীত হয় ঘৃণ্যতম উপায়ে।

পুঁজিতন্ত্রের পূর্ণতম বিকাশ হয় ইংলণ্ডে। প্রথম যে পুঁজির দরকার হয়, তাহা সংগ্রহ হইয়াছিল কিরূপে? পরিশ্রম এবং সঞ্চয়ের ফলেই কি যথেষ্ট পুঁজি জমিতে পারিয়াছিল? ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই ইহার সঠিক জবাব পাওয়া যায়। ইংরেজ ভারতের উপকূলে অবতরণ করে ব্যবসায়ের জন্য। দেশীয় রাজারা তাহাদের ব্যবসায়ের অনুমতি দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজ বণিকেরা কিছুটা অস্ত্রের সাহায্যে এবং কিছুটা প্রতারণা দ্বারা সারা দেশ গ্রাস করে; উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া এবং দেশীয় শিল্প ধ্বংস করিয়া ইহারা বিরাট পুঁজির মালিক হয়।

১৭৬৯-৭০-এর মন্বন্তর ইংরেজ বণিক শাসকদের সৃষ্টি। ইংরেজের কোম্পানী বাংলাদেশের কৃষকের চাউল সামান্য মূল্যে হাত করিয়া তাহা

আটকাইয়া রাখে; ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; দুর্ভিক্ষের সময়ে উচ্চমূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া কোম্পানী অবিশ্বাস্য রকম মুনাফা আদায় করে। মন্বন্তরে ১ কোটি লোক মারা যায়; না খাইয়া এক-তৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ন হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সময়ে কোম্পানী কৃষকের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে দুর্ভিক্ষের আগের বছরগুলির চেয়ে বেশী। ভারতে ইংরেজের ইতিহাসের এই কলুষিত অধ্যায় সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

নিগ্রোদের ধরিয়া আমেরিকায় চালান দেওয়া ছিল ধনাগমের এবং পুঁজির সঞ্চয়ের একটা প্রশস্ত উপায়। প্রথম এই ব্যবসায় আরম্ভ করে পর্তুগীজ বণিকেরা। ইংরেজদের মধ্যে দাস-ব্যবসায়ে অগ্রণী হয় জন হকিন্স; রাণী এলিজাবেথ্ হকিন্সের সাফল্যের জন্য তাহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। এলিজাবেথও লাভের শরিক হইতে চাহিয়াছিলেন, দাস চালান দেওয়ার জন্য হকিন্সকে তিনি একটি জাহাজ ধার দেন। এই জাহাজটির নাম ছিল 'জিসাস্' (খৃষ্ট)।

আমরা স্পষ্টই দেখিলাম দেশজয়, দস্যুতা, লুণ্ঠন, শোষণ ইহাই পুঁজির সঞ্চয়ের প্রথম উৎস; সঞ্চয়ী মানুষের খাটুনি শিল্প-পুঁজির মূল নয়।

(২)

শ্রমিকের শ্রমশক্তি না কিনিয়া পুঁজি খাটানোর কথাই উঠে না। সুতরাং গোড়ায় যেমন উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজির দরকার হইয়াছিল তেমনি দরকার হইয়াছিল উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখি চারিদিকে সংখ্যাতীত বেকার শ্রমিকের দল; ইহারা কাজের জন্য এক কারখানা হইতে অন্য কারখানায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং আমরা ভাবিতেই পারি না, এমন দিনও ছিল যখন কারখানার কাজের জন্য শ্রমিক মিলিত না। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শ্রমিক এখনকার মতই আগেও ছিল। কিন্তু তাহা নয়। যদি কাহারও দখলে জমি থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে অন্যের কাজ করিতে যায় না। মার্কস এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়াছেন। 'এক ভদ্রলোক মোটা টাকা ও বহু শ্রমিক সঙ্গে লইয়া অস্ট্রেলিয়ায় যান; সেখানে জমির অভাব নাই। শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে চাষের জমি লয়; এবং মনিবের চাকুরি ছাড়িয়া দেয়। ভদ্রলোক অল্পসময়ের মধ্যেই দেখিতে পান যে তাহার তিনশ' মজুরের একটিও আর নাই যে তাহার রান্না করিয়া দেয় কিংবা দৈনন্দিন কাজগুলি করে।' কৃষকের দখলে যতক্ষণ জমি থাকে, ততক্ষণ আর সে অন্যের কাজে যায় না; কারিগরও তেমনি—যতক্ষণ যন্ত্রপাতি

হাতে আছে ততক্ষণ আর অন্যের নিকট কাজের প্রার্থী হয় না। কৃষকের দখলে যখন জমি থাকে না, কারিগরের যখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হাতছাড়া হয়,—তখনই তাহারা কাজের তল্লাসে যায় অন্যের নিকট। ইচ্ছা করিয়া ইহারা কখনও যায় না, বাধ্য হইয়াই যায়। উৎপাদনের উপায়গুলি হইতে ইহারা বঞ্চিত। তখনও ইহাদের একটা জিনিস আছে, শ্রম করার ক্ষমতা; সর্বহারারা এখন শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

অতএব শ্রমশক্তি বিক্রয়ের জন্য বাজারে শ্রমিকের আবির্ভাবের ইতিহাস শ্রমিককে উৎপাদনের উপায়গুলি হইতে বঞ্চিত করারই ইতিহাস। ইংলণ্ডেই প্রথম আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ হয়। সুতরাং সে দেশের ইতিহাসেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, কিরূপে স্বাধীন জীবিকা হারাইয়া জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ সর্বহারা মজুরে পরিণত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ভূস্বামী কর্তৃক জোর করিয়া যৌথজমি ঘেরাও করার ফলে ষোল শতকে বহু কৃষক জমিহীন হয়। স্বাধীন উপজীবিকা হারাইয়া ইহারা অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, অনেকেই হয় চোর কিংবা ভবঘুরে। এইভাবে বহু আগেই ইংলণ্ডে সর্বহারা শ্রমিক দলের সৃষ্টি হয়।

জমি ঘেরাও করার ব্যাপারটা দেখা দেয় আবার আঠার শতকে; তখন ভূস্বামীরা আগের চেয়েও বেশী জমি দখলে নেয়। জমিহীন কৃষকের সংখ্যা তাই খুব বেশী বাড়িয়া যায়। ষোল শতকে ভূস্বামী জোর করিয়া বে-আইনীভাবে জমি দখল করে, কিন্তু আঠার শতকে তাহারা আইনের জোরে জমি দখল করিতে থাকে। ১৬৮৮'র বিপ্লবে ভূস্বামী অভিজাত ও বুর্জোয়ার মধ্যে যে রফা হয় তাহার ফলে শাসনকার্যে অভিজাতদেরই থাকে বেশী হাত। সুতরাং এখন আর জোর করিয়া জমি দখলের প্রয়োজন হয় না; তাহারা পার্লামেণ্টে 'এনক্লোজার' আইন পাস করাইয়া লয়। জমির মালিক জমিহারা হইয়া মজুররূপে কারখানায় ঢুকে।

মার্কস্ স্কটল্যাণ্ডের একজন অভিজাত মহিলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'সাদারল্যাণ্ডের ডাচেস্ যৌথজমি দখল করিয়া প্রায় সব স্বাধীন কৃষকদের বঞ্চিত করেন; এখন তিনি ইহাদের ঘরছাড়া করিতে থাকেন। তাহার জমিদারীর লোকসংখ্যা কমিয়া দাঁড়ায় পনর হাজার; চার বছরের মধ্যে ইহাদের উৎখাত করিয়া তিনি গ্রামের পর গ্রাম চারণভূমিতে পরিণত করেন। এই সম্ভ্রান্ত মহিলা কয়েকবছরের মধ্যে ৭৯৪,০০০ একর যৌথ জমি নিজের দখলে আনেন।'

অন্য উপায়েও বহু লোককে ঘরছাড়া করা হয়। ইংলণ্ডের কারখানা-শিল্পে যখন স্টীম ইঞ্জিনের প্রবর্তন হয়, তখন আর ক্ষুদ্র কারিগরের কিংবা গৃহশিল্পীর পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। কারখানায়

বৃহৎ আকারে উৎপাদন হয়, উৎপাদনের খরচ কম। অতএব বাজারে কারখানা-জাত দ্রব্য বিক্রয় হয় অপেক্ষাকৃত কম দরে। কারিগর তাহার ক্ষুদ্র কারখানায় এবং গৃহশিল্পী নিজের ঘরে যে-সব দ্রব্য তৈয়ার করে, বাজারে তাহার চাহিদা নাই; সুতরাং স্বাধীন বৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা দলে দলে পুঁজিপতির কারখানার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে বিত্তহীন শ্রমজীবীশ্রেণীর। সামন্ততন্ত্রের শেষে ব্যবসায় হইতে যে পুঁজির সঞ্চয় হয় তাহার সঙ্গে মিলিয়া এই সর্বহারা বিরাট যন্ত্রশিল্পের বনিয়াদ তৈয়ার করিয়াছে।

(৩)

ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিনের প্রবর্তন হইতেই যন্ত্রশিল্পের সুরু। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংলণ্ডে স্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার হয় ৩০টি কয়লার খনিতে, ২২টি তামার খনিতে, ২৮টি লোহার কারখানায় এবং ৮৪টি কাপড়ের কলে। মেশিনের আবিষ্কার হইয়াছে অনেক আগেই, সে ইতিহাস আমরা বলিয়াছি। কিন্তু স্টীম ইঞ্জিনদ্বারা মেসিন চালনাই শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতি বদলাইয়া দেয়; কারখানায় বৃহদাকারে উৎপাদন স্টীমইঞ্জিনের ব্যবহার হইতে সম্ভব হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, আধুনিক শক্তিচালিত মেসিনের প্রবর্তনের আগেই কারখানার উদ্ভব হয়, কিন্তু কারখানাশিল্প ছাড়া কখনও স্টীমইঞ্জিনের ব্যবহার সম্ভব নয়।

সুনিপুণ সংগঠন এবং সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের দরুন কারখানায় উৎপাদন হয় প্রচুর; ইহার একটা বড় কারণ ক্রমবর্ধমান পুঁজি। বাজারে চাহিদাও যথেষ্ট; বৈদেশিক বাণিজ্য তো আছেই, লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় স্বদেশের চাহিদাও কম নয়। ইংলণ্ডে আঠার উনিশ শতকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের চেয়ে বাড়িয়া যায়। ১৭০০'র আগে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছিল একশ' বছরে ১,০০০,০০০; কিন্তু ১৭০০'র পর একশ' বছরে বাড়ে ৩,০০০,০০০। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ জীবনযাত্রার উন্নত মান; কৃষির উন্নতির জন্য লোকে এখন ভাল খাইতে পরিতে পায়। শিল্পবিপ্লবের মতই কৃষিতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়।

যে বছর ইংলণ্ডের জনসাধারণ প্রথম চার্লসকে ফাঁসী দেয়, সে বছরই হল্যাণ্ড হইতে আমদানি ওলকপি তাহারা নিজেদের দেশের মাটিতে চাষ করে। ওলকপি নূতন ফসল; সেজন্যই নয়,—উহার একটা অন্যরকম গুরুত্বও আছে। আগে জমির এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবছরই পতিত রাখা হইত; এখন তাহা অনাবশ্যক। প্রথম বছর খাদ্য শস্যের চাষ হয়। পরের বছর-

গুলিতে ক্রমান্বয়ে ওলকপি, তৃণ, বার্লি চাষ করিয়া জমির উর্বরতা ঠিকই রাখা হয়। এক-তৃতীয়াংশ পতিত ফেলিয়া রাখা প্রয়োজন হয় না। কৃষির এইরকম পরিবর্তনে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। পশুখাদ্যের চাষ হওয়ায় জমির আগাছাই যে শুধু দূর হয় তা নয়, বলিষ্ঠ গরু ভেড়ারও এখন অভাব নাই। একটা হিসাবে দেখা যায়, আঠার শতক সুরু হওয়ার একশ' বছরের মধ্যে ভেড়ার ওজন ২৮ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৮০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। শিল্পে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল, নিড়ানি প্রভৃতি কৃষির যন্ত্রপাতিও উন্নত হয়। শিল্প ও কৃষিবিপ্লবের ফলে, কৃষিজাতদ্রব্য কিংবা কারখানাজাতদ্রব্য বেশী পরিমাণে উৎপাদন হয় সত্য, কিন্তু সারাদেশে সকলের নিকট তাহা সহজে পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। সেজন্য বড় বড় রাস্তা তৈয়ার হয়, বড় বড় খাল কাটা হয়।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত ধরনের রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প-বিপ্লব—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ খুবই নিকট। বৈষয়িক জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনে ইংলণ্ডে নূতন যুগের সূচনা হয়।

(৪)

সাধারণত আমরা মনে করি, শিল্পে মেসিনের প্রবর্তন হওয়ায় শ্রমের লাঘব হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। মালিক মনে করে, মেসিনের জন্য সে যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়াছে, সুতরাং যতবেশী উহাকে চালু রাখা যায় ততই তাহার লাভ। এই কারণেই শ্রমিককে খাটিতে হয় বেশী সময়। এমনকি সুসভ্য ইংলণ্ডেও উনিশ শতকে শ্রমিকেরা ষোল ঘণ্টার উপর খাটিয়াছে।

কারখানায় আসার আগেও শ্রমিকেরা দীর্ঘসময় কাজ করিয়াছে; রোজ ষোল ঘণ্টার বেশীও তাহারা খাটিয়াছে। কিন্তু নিজের ঘরে, কিংবা নিজের কারখানায় খাটুনি এক ঘেয়ে ও বিরক্তিকর ছিল না। কারখানার কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলায় তাহারা অভ্যস্ত নয়। ঠিক সময়ে কাজ আরম্ভ করা, ঠিক সময়ে শেষ করা, মেসিনের সমতালে চলা,—এরকম অভিজ্ঞতা তাহাদের সম্পূর্ণ নূতন। পূর্বে তাহাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক টানা খাটিতে হইত না। কারখানায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় জল চাওয়ারও উপায় নাই। একে দীর্ঘ সময় খাটুনি, তাহাতে আবার মজুরি নামমাত্র; নানা অজুহাতে জরিমানা আদায় করিয়া এই কম মজুরি আরও কমাইয়া দেওয়া হয়। এ-সব আজগুবি মনে হইতে পারে, কিতু শিল্পযুগের প্রথম দিকে ইহাই ছিল রীতি। পুঁজিপতি মনে করিত,—শ্রমিকের শ্রমশক্তি সে কিনিয়াছে, মেসিন

তাহার সম্পত্তি; সুতরাং ইচ্ছামতো উহাদের খাটানো যায়—মেসিন আর মজুরের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার দরকার নাই। অবশ্য পার্থক্য কিছুটা করিত—মেসিনের জন্য মালিক একসঙ্গে বহু টাকা খাটাইয়াছে, সুতরাং মেসিনের যত্ন নিত খুবই; মজুরের ভাল মন্দ দেখার দরকার নাই।

শিশুরা এবং মেয়েরাও মেসিন চালাইতে পারে; তাই জোয়ান মজুরের মজুরি ছিল কম; অনেক সময় ইহারা বেকার থাকিত। ১৮৩৩'এ পার্লামেন্টের কমিশনারেরা শিশু-শ্রমসম্পর্কে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করে; শিশু-শ্রমিকের উপর অত্যাচার যে কিরূপ বীভৎস ছিল একটি উদাহরণ হইতেই তাহা স্পষ্ট হইবে। এগার বছরের বালক ক্লার্ক একটি কারখানায় সপ্তাহে রোজগার করিত মাত্র ৪ শিলিং; কমিশনারদের নিকট বালকটি বলে, "যদি আমরা কখনও ঘুমাইয়া পড়িতাম আমাদের বেত মারা হইত; আমি ভোর ছয়টায়—কখনো পাঁচটায়—কারখানায় যাইতাম; রাত নয়টা পর্যন্ত অবিরাম কাজ করিতাম; একদিন আমার কিছু বেশী পয়সার প্রয়োজন হয়, তাই সারা রাত আমি কাজ করিয়াছিলাম.........এখন আমি ৪ শিলিং পাই; একটু উন্নতি হইয়াছে। ছোট ভাইটিকে এখন সঙ্গে নেই; তাহার বয়স সাত; মাঝে মাঝে আমার বিশ্রামের দরকার হইলে সে কাজ করে। তাহাকে আমি কিছুই দেই না; অন্য কেহ হইলে ১ শিলিং দিতাম।"

শিশুরা আগেও কাজ করিত। কারিগরের ছেলে ছোট বেলায়ই কাজে ভর্তি হইত। ছেলের কাজের জন্য যত্ন নিত পিতা; পিতারই থাকিত ছেলের ভালমন্দের দায়িত্ব। কিন্তু কারখানায় শিশু কাজ করে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে; সর্দারের চাবুক তাহাকে শাসায়, কড়া পাহারায় রাখে। পুরা কাজ না দিয়া তাহার উপায় নাই।

কারখানা-শিল্প সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে রাতারাতি অনেকগুলি শহর গড়িয়া উঠে। নূতন শহর প্রায় সবই কয়লার খনির কাছে। ১৭৭০'এ ইংলণ্ডের গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল মোট সংখ্যার শতকরা চল্লিশ; ১৮৪১ সালে তাহা নামিয়া আসে ছাব্বিশে। শহরগুলিতে শ্রমিকদের বাসস্থান ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। ম্যানচেস্টারের শহরতলীর শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট লেখা হইয়াছে—'কলেরার হাত হইতে একটি পরিবারও বাঁচিতে পারে নাই; কোথায় বাস করে, তাই দিয়া বুঝা যায় কতদিন একজন লোক বাঁচিবে। বাসস্থানের অবস্থা যেখানে ভয়াবহ, মৃত্যুসংখ্যা সেখানে বেশী না হইয়া যায় না; মহামারী ও মৃত্যু শ্রমিকের সকল সময়ের সাথী।'

শ্রমিকের জীবনের এসমস্ত সমস্যা সম্পর্কে বড়লোকেরা কি ভাবে? কাপড়ের কলের মালিক মিঃ লি'র কারখানায় শিশুরা খাটে ভোর ছয়টা হইতে রাত আটটা পর্যন্ত। এই ব্যক্তি বলিতেন, 'বাধ্যতা, পরিশ্রম ও শৃংখলার অভ্যাস

নৈতিক জীবনের সহায়ক।' ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মত প্রকাশ করেন। 'শিক্ষা পাইলে তাহারা অবাধ্য হইয়া উঠিবে, নিজেদের দুরবস্থার কারণ সম্পর্কে সচেতন হইবে।' আর্কডিকন পেলির মত বিশিষ্ট ধর্মযাজক বলিলেন, 'দারিদ্র হইতে সুখের উদ্ভব হয়......মিতব্যয়িতা একটা বড় সুখ, বড় সন্তোষ; প্রাচুর্যের মধ্যে সুখ কিংবা সন্তোষ নাই।...... কঠোর পরিশ্রমের পর যে বিশ্রাম লওয়া হয়, তাহা একান্ত তৃপ্তিদায়ক। দরিদ্রের বিশ্রাম সুখ ধনীর ঈর্ষার কারণ।'

ধর্মযাজক পেলির মুখ হইতে এই প্রীতিপ্রদ কথাগুলি বাহির হয় ১৭৯৩ সালে; এই সময়ে ফরাসী দেশের সাধারণ লোকেরা অভিজাত ও বড়লোকদের তাড়াইয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িতেছিল। সমুদ্রের অপরতীরে যে বিপ্লব চলিতেছিল, তাহার ভয়াবহতায় ইংলণ্ডের বড়লোকেরা বিচলিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়। বিপ্লবের ঢেউ যেন ইংলণ্ডের কূল স্পর্শ না করিতে পারে, সেজন্যই পেলিপ্রমুখ বড়লোকদের সাবধানতা।

কিন্তু বেশী দিন শ্রমিকদরে ভুলাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। তাহারা প্রথম সংগ্রাম সুরু করে খাটুনি কমানোর জন্য। কিছু কিছু সহৃদয় বড়লোক শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করেন; চৌদ্দ হইতে ষোল ঘণ্টা শ্রম যে অমানুষিক তাহা সকলেই বুঝে। পার্লামেণ্টে কেহ কেহ শ্রমিকদের পক্ষে লড়েন; খাটুনির সময় দশ ঘণ্টায় কমাইয়া আনার জন্য ইহারা একটা আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। প্রস্তাবেব পক্ষে ৯৩ জন সদস্য ভোট দেন। পুঁজিপতিরা ইহাতে আতঙ্কিত হয়; ইহাদের মতে পার্লামেণ্টে এইরূপ আলোচনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে।

এই প্রকার নিরুপায় অবস্থার মধ্যে শ্রমিকেরা বেপরোয়া হইয়া উঠে। মেশিন আসার আগে তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল, তাহাদের স্বাধীন উপজীবিকা ছিল। তাই তাহারা মনে করে, মেশিনই তাহাদের শত্রু। প্রতিকারের পথ এখন সুস্পষ্ট—মেশিন ভাঙিগয়া দিলেই শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। দলে দলে শ্রমিকেরা মেশিন ভাঙগার জন্য বাহির হয়। ইতিহাসে মেশিন ভাঙগার আন্দোলনকে বলা হয় 'লুডাইট' আন্দোলন।

মালিকেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; তাহারা পার্লামেণ্টের শরণাপন্ন হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে আইন পাস হয়,—'মেশিন ভাঙগার শাস্তি প্রাণদণ্ড।' এই নিষ্ঠুর আইনের বিরুদ্ধে 'হাউস্ অফ্ লর্ডস'-এ একজন মাত্র সদস্য প্রতিবাদ জানান; 'হাউস্ অফ্ লর্ডস'-এ ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা।

তিনি বলেন, 'যথেষ্ট সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে চরম দুরবস্থার দরুনই শ্রমিকেরা এই পথ লইয়াছে।...... আপনারা ইহাদের অসংযত জনতা আখ্যা দিয়াছেন......কিন্তু এই জনতার প্রতি

আমাদের ঋণ কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি? এই জনতাই আমাদের ঘরে ও জমিতে খাটে; এই জনতাই জাহাজ চালায়; এই জনতার শক্তিতেই আমরা সারা পৃথিবীকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছি—এই জনতা আপনাদের উপেক্ষা করিয়া চলার শক্তি রাখে।'

১৮১২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'হাউস্ অফ্ লর্ডস্'-এ এই বক্তৃতা করেন সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড বাইরন।

মেশিন ভাঙ্গা ভ্রান্ত পথ; এই পথে কখনও শ্রমিকের সমস্যার সমাধান হয় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের দুশমন মেশিন নয়, মেশিনের মালিক; মালিকই জনসাধারণকে তাহাদের জীবনধারণের উপায়গুলি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। শ্রমিকেরা অচিরেই বুঝিতে পারে যে, মেশিন ভাঙ্গিয়া লাভ নাই। বহু শ্রমিক সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা জানাইয়া মালিকদের নিকট আবেদন করিতে থাকে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। অনেকে পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করে; কিন্তু তাহাও উপেক্ষিতই হয়। যাহা হউক, শ্রমিকের দুঃখ লাঘব করার উদ্দেশ্যে অবশেষে কতকগুলি আইন পাস হয়। কিন্তু আইন পাস করা, আর আইন কার্যকরী করা এক কথা নয়। শ্রমিকেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারে,—আইনের মধ্যে এত রকমের ফাঁক আছে যে মালিকের পক্ষে আইনের কড়াকড়ি এড়াইয়া চলা সহজ। মালিক-শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হইলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই বিচারকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট্ মালিকের পক্ষ টানিয়াই রায় দেয়। এডাম স্মিথ্ ঠিকই বলিয়াছিলেন, "আইন-আদালত গরীবের বিরুদ্ধে ধনীকেই রক্ষা করে।" শ্রমিকেরা তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিতে পারে। তাহাদের মধ্যে নূতন চেতনা জাগে,—পার্লামেণ্টের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পাইলেই তাহারা পার্লামেণ্টে নিজের শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে; তখন শ্রমিকের স্বার্থে আইন প্রণয়ন সহজ হইবে। এই চেতনা হইতেই ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের জন্ম হয়। চার্টিস্টদের দাবি ছিল,—(১) সর্বজনীন ভোটাধিকার; (২) পার্লামেণ্টের সদস্যদের জন্য বেতন (তবেই গরীবের প্রতিনিধিরাও রাজনৈতিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে); (৩) প্রতিবছর নূতন নির্বাচন; (৪) নির্বাচন প্রার্থীর সম্পত্তিবিষয়ক যোগ্যতা বাতিল; (৫) গোপনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা বা ব্যালট; (৬) প্রত্যেকটি নির্বাচকমণ্ডলীতে সমান সংখ্যক ভোটার।

ধীরে ধীরে চার্টিস্ট আন্দোলন থামিয়া যায়; তবুও প্রায় সব দাবিই একে একে পূরণ হয়। শ্রমিকেরা গণতন্ত্রের জন্য লড়ে, কেননা তাহারা মনে করিত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলেই তাহাদের দুঃখ দূর হইবে। শ্রমিক শ্রেণীর দাবি অনুসারে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় সত্য, কিন্তু শ্রমিকের ভাল বাসস্থান, উন্নত জীবনযাত্রার মান,

উচ্চ মজুরি কিংবা কম খাটুনি,—কিছুরই তেমন ব্যবস্থা হয় নাই। যদি কিছু তাহারা পাইয়াও থাকে, পুরা পায় নাই; ভোটের অধিকার খাটাইয়া তাহারা দাবি আদায় করিতে পারে নাই। এই সব দাবি আদায়ের মূলে শ্রমিকের সংগঠন; এই সংগঠনই 'ট্রেড-ইউনিয়ন'।

ট্রেড-ইউনিয়ন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। শ্রমিকেরা শ্রেণী-সচেতন না হওয়া পর্যন্ত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধ না জন্মানো পর্যন্ত— প্রশস্ত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। শিল্প বিপ্লবের পর হইতেই সারা ইংলন্ড ট্রেড-ইউনিয়নে ছাইয়া যায়। বহু শ্রমিক শহরে জড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘ গড়িয়া উঠে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হইতেই শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, শ্রমিক শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। শ্রমিকের সংগ্রামের এখন প্রধান অস্ত্র ট্রেড-ইউনিয়ন।

ভারতে ইংরাজ

(১)

আঠার শতকে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই শিল্পোন্নতির সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। কেননা, সে সময়ে ইংরাজ বণিক ভারতে যে অর্থ সঞ্চয় করে তাহাই তাহারা খাটায় ইংলণ্ডের শিল্পে। ভারতের অর্থই ছিল ইংলণ্ডের শিল্পের পুঁজি। ভারতে ব্যবসায় হইতে যে পুঁজির সঞ্চয় হয়, তাহাই ইংলণ্ডের শিল্প-পুঁজি। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়, সমাজে নূতন শ্রেণী দেখা দেয়।

চৌদ্দ শতকে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপ্‌ল, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশ জয় করে। ভেনিস, জেনোয়া এবং ফ্লোরেন্সের বণিকদের প্রাচ্যদেশগুলির সঙ্গে কাজকারবার বন্ধ হইয়া যায়। ইওরোপে ইটালির বণিকেরাই প্রাচ্যের মাল চালান দিত। ইটালির পথে প্রাচ্যের সঙ্গে ইওরোপের বাণিজ্য চলাচল বাধা পায়। ইওরোপের বণিকেরা তাহাতে দমে নাই। ভারতের ধন এবং ঐশ্বর্যের কথা তাহারা জানিত। তাই নূতন পথের সন্ধানে তাহারা বাহির হয়। সে ইতিহাস আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে; কোন কোন দেশের বণিকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতাও অর্জন করে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া যায় ইংলণ্ড। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বণিকদের যৌথ কারবার ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী রানী এলিজাবেথের সনন্দ লইয়া ভারতে আসে। প্রথম ইংরেজ জাহাজ "হেক্টর" সুরাট বন্দরে আসিয়া লাগে। ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। সেখানে তিনি উপযুক্ত সমাদর লাভ করেন বটে, কিন্তু পর্তুগীজদের বৈরীভাবের জন্য বেশীদিন আগ্রায় থাকা সম্ভব হয় নাই; তিনি সুরাটে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর কতকগুলি জাহাজ লইয়া ক্যাপ্টেন বেস্ট ভারতে পৌঁছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাহার সন্ধি হয়; ইংরাজদূত টমাস রো রাজধানী আগ্রায় থাকিয়া যান। সম্রাট ইংরাজ বণিকদের সুরাটে ফ্যাক্টরী স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী কলিকাতায়

অপর একটি ফ্যাক্টরী স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। সম্রাট সাজাহান কোম্পানীকে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা দান করেন। বাংলার শাহসুজার নিকট হইতেও কোম্পানী নানারকমের সুবিধা পায়। এদিকে, রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ পান বোম্বাই বন্দর; কোম্পানী রাজার নিকট হইতে বন্দরটি কিনিয়া লয়। এইভাবে, ভারতে ইংরাজের বাণিজ্য বিস্তার হয়; কিন্তু কোম্পানী এদেশে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে পলাশীর যুদ্ধের পরে।

কোম্পানী নিজেই যে শুধু বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত তাহা নয়, কোম্পানীর বণিকেরাও বে-আইনীভাবে ব্যক্তিগত লাভের জন্য বাণিজ্য করিত। ভারতের অভ্যন্তরে ইহারা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় মাল চালান দিত। কিন্তু তাহারা শুল্ক দিত না।

বাংলায় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশেম নবাব হন। তিনি কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই তিনটি জিলার কর আদায়ের ক্ষমতা দেন; প্রাক্তন নবাব মীরজাফরের দেনাও কোম্পানীকে শোধ দেন; তাহা ছাড়া ভেট স্বরূপ আরও পাঁচ লাখ টাকা কোম্পানীকে দিতে রাজী হন। কোম্পানী একজন নবাবকে সরাইয়া অন্য একজনকে সিংহাসনে বসাইত এবং নূতন নবাবের নিকট হইতে প্রচুর টাকা আদায় করিত;—কোম্পানীর এটা ছিল একটা ব্যবসায়।

নবাব মীরকাশেম কোম্পানীকে সব রকমে খুশি করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ বণিকেরা বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইবে, তাহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। দেশীয় ব্যবসায়ীরা শুল্ক দেয়, কিন্তু বিদেশী বণিকেরা একরকম জোর করিয়াই দেশের অভ্যন্তরে বিনাশুল্কে একস্থান হইতে অন্যস্থানে মাল পাঠায়। ফলে, দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; নবাবের রাজস্ব কমিতে থাকে; বিদেশী বণিকেরা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য প্রায় নিজেদের একচেটিয়া করিয়া লয়।

মীরকাশেম অভিযোগ করিলেন, 'ইংরাজ বণিকেরা প্রতি পরগনায়, প্রতি গ্রামে এবং প্রতি ফ্যাক্টরীতে লবণ, সুপারী ইত্যাদি কিনে এবং বিক্রয় করে... রায়ত এবং ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ইহারা মাল কিনিয়া চার ভাগের এক ভাগ মূল্যও দেয় না; জোরজুলুম করিয়া ইহারা পাঁচ টাকার জিনিস এক টাকায় কিনে।'

নবাব মীরকাশেমের প্রতিবাদ এবং অভিযোগ সত্ত্বেও ইংরাজ বণিকেরা কোনরূপ বুঝাপড়ায় আসিতে রাজী হয় না। নবাব বিরক্ত হইয়া দেশীয় ব্যবসায়ীদের উপর হইতেও শুল্ক উঠাইয়া লন; ইহাতে নবাবের রাজস্বে ঘাটতি পড়িল বটে, কিন্তু দেশীয় বণিকেরাও যাহাতে বিদেশী বণিকদের মত

সমান সুবিধা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি এ ব্যবস্থা করেন। ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিল; নবাব মীরকাশেম যুদ্ধের ঝুঁকি লইলেন। নবাব যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; তবুও স্বদেশীয়দের স্বার্থ বিসর্জন দিতে রাজী হইলেন না।

কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলী ছিলেন মীরকাশেমের ঠিক উল্টো। নবাব মীরকাশেম তাহার রাজধানী ইংরাজ বণিকদের প্রভাব হইতে দূরে সরাইয়া নেন মুঙ্গেরে। মহম্মদ আলী রাজধানী আর্কট ছাড়িয়া মাদ্রাজে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মাদ্রাজ ইংরাজ বণিকদের বড় ঘাঁটি। মীরকাশেম ইংরেজদের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দেন, মহম্মদ আলীর দেনা কিন্তু ইংরাজ বণিকদের নিকট বাড়িতেই থাকে। বণিকদের নিকট হইতে তিনি ধার নিতেন, পরিবর্তে বণিকেরা এক একটি করিয়া বহু জিলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায়। এইভাবে তাহার সমস্ত রাজ্য পাওনাদারদের হাতে চলিয়া যায়। মহম্মদ আলীর মত অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজা, নবাবেরাও ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া কোম্পানী এবং কোম্পানীর বণিকদের হাতে প্রচুর সম্পত্তি তুলিয়া দেন।

১৭৬৫ সনের দিকে কোম্পানী উহার অংশীদারদের লভ্যাংশ বাবত প্রতি বছর ইংলণ্ডে পাঠাইত দেড় কোটি টাকার উপরু। এই টাকা শুধু ব্যবসায়ের মুনাফা হইতেই নয়, বাংলার রাজস্ব হইতেও সংগৃহীত হইত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকট হইতে কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে; রাজস্ব আদায়ের ভার এখন আর নবাবের নয়, নবাব শুধু বিচার-আচারের কর্তা। একতৃতীয়াংশ রাজস্ব দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে। তাহা ছাড়া বৃটিশ কর্মচারীদের মাহিনা এদেশে বড় একটা খরচই হয় না। কোম্পানীর ছাড়াও বণিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীন ব্যবসায়ের মুনাফাও বৃটেনে চলিয়া যাইত। ১৭৬৬, ১৭৬৭ এবং ১৭৬৮,—এই তিন বছরে বাংলায় আমদানি হয় সওয়া ছয় কোটি টাকার মাল, অথচ বাংলা হইতে রপ্তানি হয় উহার দশগুণ বেশী টাকার মালপত্র।

চমৎকার ফিকিরে কোম্পানী মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন করিত। উহাকে বলা হইত কোম্পানীর 'টাকা-বিনিয়োগ' বা 'ইনভেস্টমেণ্ট।' ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে লেখা হইয়াছে : বহু বছর হইতেই বাংলার রাজস্বের একটা বড় অংশ পৃথক করিয়া রাখা হইত ভারতে মাল ক্রয় করিয়া বিলাতে পাঠানোর জন্য। ভারতের টাকা ভারতে খাটাইয়া বিলাতে মাল পাঠানোর নাম বৃটিশ বণিকের 'ইনভেস্টমেণ্ট।' জাহাজ ভর্তি করিয়া ভারতবর্ষ যাহা পাঠাইত তাহা কখনো সমমূল্যের বিনিময়ে বাণিজ্য নয়, উহা ছিল বিদেশীকে ভারতের কর-প্রদান।

আঠার শতকের মাঝখানে ইংলণ্ডে প্রলিটারিয়েট এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তখনও শিল্প-বিপ্লব হয় নাই। ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ভারতের পুঁজি যাওয়ার পরই শুরু হয় যান্ত্রিক আবিষ্কার। ১৭৬৫-তে ওয়াট স্টীমইঞ্জিন আবিষ্কার করেন; ১৭৬৭-তে হারগ্রীভের স্পিনিং জেনী এবং ১৭৭৫-এ আর্করাইটের তুলা ধুনার যন্ত্র ও টাঁকু আবিষ্কার হয়। ইংরাজেরা ভারত হইতে যে পুঁজি সংগ্রহ করে তাহাতেই এগুলিকে কাজে লাগানোর মত সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(২)

ভারতের অর্থ বৃটেনের কলকারখানায় পুঁজিরূপে খাটে; এদিকে, ভারতই আবার বৃটেনের কারখানাজাত দ্রব্যাদির বাজার। কোম্পানীর, গভর্নর-জেনা-রেলের, এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মারফত বৃটেনে তৈয়ারী মাল একরকম জোর করিয়াই ভারতের বাজারে ভারতীয়দের নিকট বিক্রয় করা হইত। এদিকে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় মাল বন্ধ করার জন্য ভারতে তৈয়ারী বস্ত্রাদির উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসানো হয়।

বিলাতের লোকের ব্যবহারের জন্য ভারত হইতে যে সূক্ষ্মবস্ত্র চালান হয় উহাকে শুল্ক দিতে হইত শতকরা ৬৮ পাউন্ড; অবশ্য যদি বিলাত হইয়া এই মাল ইওরোপের অন্যদেশে যায়, তবে আর ভারতীয় সূক্ষ্মবস্ত্রের উপর এত উচ্চহারে শুল্ক ধার্য হইত না; শতকরা তিন পাউণ্ডের মত শুল্ক লওয়া হইত। ইংলণ্ডের বাজার হইতে ভারতীয় মাল এইভাবে বিতাড়িত হয়।

পার্লামেণ্টের একটি কমিটির নিকট উইলসন্ সাহেব সাক্ষ্য দেন: 'তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রের দামের চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ কি ষাট টাকা কম মূল্যে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র বেশ লাভ লইয়া বিক্রয় করা যাইত। তাই ইংলণ্ডের বস্ত্র যাহাতে ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রয় হইতে পারে, সেজন্য ভারতীয় বস্ত্রের উপর সংরক্ষণশুল্ক বসানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ ব্যবস্থা না করা হইলে ম্যানচেস্টার কিংবা পেইস্‌লির সূতাকলগুলি বন্ধ হইয়া যায়। ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি বন্ধ করার জন্যই উচ্চ-হারের সংরক্ষণশুল্ক বসানো হয়; কিন্তু ভারতের রাজস্বের একটা অংশ দ্বারা কোম্পানী ভারতের বাজার হইতে বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে থাকে। কোম্পানী এই মাল চালান দিত ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে। বাজারের অভাবে ভারতের বস্ত্রশিল্প একপ্রকার উঠিয়াই যায়। এদিকে স্বদেশের বাজারেও ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বন্ধ করার জন্য দেশীয় বস্ত্রের উপর আভ্যন্তরিক শুল্ক বা 'ইন্‌ল্যান্ড ডিউটি' বসানো হয়। এইভাবে বৃটেন

নিজের দেশের বাজার নিজের দেশের বস্ত্রের জন্য নিরাপদ করিল, আবার ভারতের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের আমদানির পথ সুগম করিল। এই রকম ব্যবস্থা না করিয়া বৃটেনের গভর্নমেণ্টের উপায় ছিল না; কেননা নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইংলণ্ডের মাল ইওরোপে যাইতে দিত না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের গভর্নমেণ্ট ভারতের বাজারে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেয়; ভারতের বাজার এখন ইংলণ্ডের সকল ব্যবসায়ীর জন্যই উন্মুক্ত।

ভারতকে এখন একমাত্র কাঁচামাল উৎপাদনের দেশে পরিণত করাই হইয়া দাঁড়ায় বিদেশী শাসকের নীতি। ভারত হইতে কাঁচামালের যোগান লইয়া ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্প পাকামাল উৎপাদন করিতে থাকে; এই মালই আবার ভারতের বাজারে চালান দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া এবং ভারতের বাজারে যাহাতে ভারতীয় দ্রব্যের কাট্‌তি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া পূর্বেই ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করা হইয়াছে।

জার্মানির প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ লিস্ট লিখিলেন: যদি অবাধ রপ্তানি বন্ধ করা না হইত, তবে প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের টিঁকিয়া থাকা সম্ভব হইত না। ভারতে কাঁচামাল ও শ্রম সহজলভ্য। ইংলণ্ড সহজেই বুঝিতে পারে যে, যে-দেশ পাকামাল উৎপাদন করে শ্রেষ্ঠত্ব সে দেশেরই; কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী।

লিস্ট আরও লিখিলেন, ভারতীয় সূক্ষ্মবস্ত্রের উপর উচ্চহারের সংরক্ষণ শুল্ক বসাইয়া ইংলণ্ড পুরাপুরি ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়। ইংলণ্ডের লোক নিজের দেশের তৈয়ারী মোটা সিল্ক পরিধান করিবে, তথাপি ভারতের সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করিবে না। অবাধ বাণিজ্যের কথা বৃটেন আগে হইতেই বলিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের শিল্প গড়িয়া না তোলা পর্যন্ত নিজেরা অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে নাই।

ভারতের বাজারে বৃটিশের পাকামাল ছড়ানোর জন্য এবং ভারতের বাজার হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এদেশে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। রেলওয়ে তৈয়ারীর জন্য ভারতের রাজস্ব হইতে বৃটিশ কোম্পানীগুলিকে সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০০ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে হইতে লাভ হয় নাই কিছুই; কিন্তু লাভ না হইলেও বৃটিশ কোম্পানীগুলির ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই; ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতীয় রাজস্ব হইতে ইহাদের রীতিমতই সুদ দিয়াছে।

(৩)

বিদেশী শাসক এবং বণিক শুধু শিল্পী কারিগরদেরই যে ধ্বংস করিয়াছে তাহা নয়, কৃষককে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। শিল্প হইতে ভারতীয়দের এখন আর কোন আয় নাই, একমাত্র আয়ের পথ কৃষি। কিন্তু জমিচ্যুত করিয়া এবং জমির উপর উচ্চহারে খাজনা বসাইয়া কৃষককেও ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হয়।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাংলার সর্বশেষ মুসলমান শাসকের সময়ে জমি হইতে রাজস্ব আদায় হয় ৮০ লক্ষ টাকা; মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বৃটিশ শাসকেরা আদায় করে ২ কোটি টাকার উপর। উৎপাদনের উপরে যেটুকু বাঁচে, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ে উহার সবটাই ধার্য হয় খাজনা। কৃষকের হাতে কিছু সঞ্চয় হয় এরূপ সম্ভাবনা থাকে নাই।

জমি সম্পর্কে বৃটিশের নির্মম ব্যবস্থার ফলে ১৭৭০-এ বাংলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'মন্বন্তর' নামে খ্যাত। মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। উনবিংশ শতকের শেষ ত্রিশ বছরে ক্রমাগত কয়েকটি দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হয় দেড় কোটি লোকের। খাজনার উচ্চহার এবং খাজনা আদায় সম্পর্কে সরকারের কড়াকড়িই এতলোকের মৃত্যুর কারণ।

১৭৭২ সালে হেস্টিংস্ জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া নীলামে চড়াইয়া পাঁচ বছরের জন্য নূতন লোককে বন্দোবস্ত দিতে থাকেন। যাহারা নীলাম ডাকিয়া নেয়, তাহারা কৃষককে অত্যাচার করিয়া যতবেশী সম্ভব আদায়ের চেষ্টা করে। অচিরেই পাঁচ বছরের বন্দোবস্থ এক বছরে পরিণত হয়। কৃষকের দুর্দশা এবার একেবারে চরমে উঠে। কোন কোন জায়গায় কৃষকেরা বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হয়। রংপুর জিলায় দেবীসিংহের অত্যাচারের দরুন যে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়, বৃটিশ সরকার নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারা তাহা দাবায়। রংপুরের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট্ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বাংলায় এত ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। স্থির হয় যে জমিদারেরা সরকারকে প্রতি বছর ২৬,৪০০,৯৮৯ টাকা রাজস্ব দিবে। এই রাজস্ব জমিদারদের আদায়ের দশ ভাগের নয় ভাগ। আঠার শতকের প্রথমদিকে জাফর খাঁ এবং সুজা খাঁ যে রাজস্ব আদায় করিত উহা তাহার দ্বিগুণ। কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করার প্রথম বছরে যে রাজস্ব আদায় করিয়াছিল উহা তাহারও দ্বিগুণ। দশ ভাগের নয় ভাগ

যখন সরকারই লইয়া যায় তখন আর এক ভাগ লইয়া জমিদারেরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহারা অত্যাচার করিয়া কৃষকের নিকট হইতে যতবেশী সম্ভব আদায় করিতে থাকে। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করিয়া বৃটিশ শাসক জমির উপর কৃষকের চিরকালের স্বত্ব অস্বীকার করে, জমিদারকেই স্বীকার করে জমির মালিক। সুতরাং কৃষককে জমি হইতে উচ্ছেদ করা সহজ হয়। জমিদারের অত্যাচার এমন একটা অবস্থায় পৌঁছিল, যখন কৃষক জমি ছাড়িয়া অব্যাহতি পাওয়াই শ্রেয় মনে করে।

ভারতীয় বস্ত্রের উপর ইংলণ্ডের সংরক্ষণ শুল্ক বসানোর দরুন রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বহু কারিগর ও শিল্পী বেকার হইয়া পড়ে। ভারতেও আভ্যন্তরিক শুল্ক বসাইয়া ভারতীয় বস্ত্রের কাট্‌তি কমাইয়া দেওয়া হয়; ইহাতে সংখ্যাতীত লোক বেকার হয়। এদিকে কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় বহু কৃষক জমিহীন হইয়া পড়ে। এইভাবে সৃষ্টি হয় বেকার শ্রেণীর এবং জমিহীন শ্রমিকের। ভারতে কল আমদানি করিয়া বৃটিশ বণিকেরা এখন ভারতের সস্তা শ্রম কাজে লাগাইতে থাকে। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধেই এদেশে রেল, পাটকল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতে বৃটিশ ফিনান্স-ক্যাপিটালের পথ পরিষ্কার হয়। এইভাবে হয় ভারতে সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন।

শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব

(১)

ইংলণ্ডে শ্রমশিল্পের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন সুরু করে; শ্রমের ঘণ্টা কমানো এবং মজুরি বাড়ানো তাহাদের দাবি। শিল্পপতিদের পক্ষে সিনিয়র যুক্তি দেখান, শ্রমের ঘণ্টা হ্রাস করা সম্ভব নয়; কেননা শ্রমিকের শেষ ঘণ্টার খাটুনি হইতেই পুঁজিপতির মুনাফা সৃষ্টি হয়। এই শেষ ঘণ্টা কমাইয়া দিলে পুঁজিপতি কোন মুনাফা আদায় করিতে পারিবে না; অতএব কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া মালিকের আর অন্য উপায় থাকে না।

সিনিয়রের বিশ্লেষণ যে ভুল তাহার প্রমাণ—আইন করিয়া শ্রমের ঘণ্টা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কারখানা বন্ধ হইয়া যায় নাই।

ইংলণ্ডে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হইয়া মজুরি বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে থাকে; শিল্পপতিদের পক্ষ হইতে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা বলিতে থাকেন, মজুরি বৃদ্ধি কখনও সম্ভব নয়; কেননা, মোট মজুরি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পূর্ব হইতেই ঠিক করা আছে—এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। মোট শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলেই তবে জনপ্রতি মজুরি বাড়িতে পারে।

এইরকম যুক্তিতে শ্রমিকের আশান্বিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু ইহার সত্যতায় বিশ্বাস করা শ্রমিকের পক্ষে শক্ত। ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়া তাহারা মজুরি বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা মোটেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে তাহাদের মজুরি দেওয়ার জন্য পূর্ব হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ফাণ্ড রহিয়াছে। শ্রমিকের আগেকার খাটুনি হইতে পুঁজিপতির হাতে যে সঞ্চয় হয়, তাহাই নাকি এই ফাণ্ড। এই ফাণ্ডটিই খরচ হয় শ্রমিকের মজুরি বাবত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা উল্টো। শ্রমিক তাহার এখনকার খাটুনি দ্বারা যে উৎপাদন করে তাহা হইতেই দেওয়া হয় মজুরি। কারখানায় কি আমরা দেখিনা যে শ্রমিককে এক সপ্তাহ খাটাইয়া তবে তাহার সপ্তাহের মজুরি মিটাইয়া দেওয়া হয়? এক কথায়, ইংলণ্ডের অর্থনীতির পণ্ডিতেরা ছিলেন শ্রমিকের স্বার্থের বিরোধী।

(২)

কোন কোন মহৎব্যক্তি শ্রমিকের দুঃখ ও দুর্গতি দেখিয়া নূতন সমাজের কথা ভাবেন; কিন্তু ইঁহাদের কল্পনাপ্রসূত নূতন সমাজ দিবাস্বপ্নের বেশী কিছু নয়। এই কল্পনা-বিলাসী ভাবুকেরা নূতন আদর্শদ্বারা এত বেশী অনুপ্রাণিত হন যে তাহারা তাহাদের কল্পিত 'রামরাজ্য'কে বাস্তব রূপ দিতে প্রয়াসী হন। অবশ্য ব্যাপারটা যে খুব কঠিন তাহা নয়; চতুর্দিকটায় খানিকটা তাকাইয়া যাহা কিছু খারাপ তাহা পরিহার করিলেই হয়। সর্বত্র দরিদ্র লোক রহিয়াছে, রামরাজ্যে দারিদ্র উঠাইয়া দিলেই চলে। দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনে অপচয় দেখা যায়; এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করা হউক যেন 'রামরাজ্যে' কোনরূপ অপচয় না হইতে পারে। রোগ, শোক ও দুঃখ এগুলির যায়গায় রামরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা হউক স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখ।

সম্ভবত পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ করাই ছিল কল্পনাবিলাসী ভাবুকদের প্রধান চিন্তা। পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে তাঁহারা দেখিয়াছেন শুধু অন্যায়। তাঁহারা চাহিতেন একটি পরিকল্পিত সমাজ যেখানে সকলের প্রতিই করা হইবে ন্যায় বিচার। পুঁজিতন্ত্রে মুষ্টিমেয় 'কতিপয়' উৎপাদনের যন্ত্রগুলির মালিক, তাই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাহাদেরই একচেটিয়া। সকলের জন্য স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যদি উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণগুলি সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়। ইহাই সমাজতন্ত্র—এবং ইহাই ছিল কল্পনা-বাদী ভাবুকদের স্বপ্ন।

ইহাদের পরে আসেন কার্ল মার্কস। কার্ল মার্কসও সমাজতন্ত্রের কথাই বলিয়াছেন; তিনিও শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তন করিতে চান। 'পরিকল্পিত সমাজের কথা তিনিও বলিয়াছেন। কল্পনাবাদীদের মতই তিনিও উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করার যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি 'রামরাজ্যে'র কোন পরিকল্পনা তৈয়ার করেন নাই, কল্পনাবাদীদের সঙ্গে তাঁহার বড় রকমের পার্থক্য এইখানেই। মার্কস ভাবী সমাজের ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু ভাবী সমাজের বাস্তব রূপ আঁকেন নাই। অতীতের সমাজ কিরূপে আবির্ভূত হইল, বিকাশ পাইল, লোপ পাইল এবং কিরূপে উহার পতন হইতে বর্তমান সমাজ জন্ম লইল—উহা দেখাই ছিল তাহার বেশী আগ্রহ। বর্তমান সমাজকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখার প্রতিই ছিল তাঁহার বিশেষ ঝোঁক—বর্তমান সমাজের অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি কাজ করিতেছে এবং নূতন পরিবর্তন সূচিত করিতেছে, সে-গুলিই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে খুলিয়া ধরেন। পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিষয়গুলিই ছিল তাহার

গবেষণার বস্তু। তাঁহার বিরাট গ্রন্থের নাম 'ক্যাপিটাল—পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ।'

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিশ্লেষণ হইতেই মার্কস উপসংহার করেন যে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কল্পনাবাদীরা সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিতেন; মার্কস সমাজতন্ত্রকে সেভাবে দেখেন নাই। মার্কস ভাবিতেন, পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কতকগুলি শক্তি সক্রিয় হইয়া সমাজকে ভাঙ্গনের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে; পুঁজিতন্ত্রী সমাজে দেখা দিয়াছে সর্বহারা শ্রমিকের দল; সংঘবদ্ধ বৈপ্লবিক শ্রমিকেরা পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। মার্কসের আবিষ্কারটুকুতে পুঁজিপতি মালিকের দল মোটেই সান্ত্বনা পাইতে পারে না। মার্কসের অর্থনীতি শ্রমিকের অর্থনীতি। মার্কসের অর্থনীতি দেখাইয়াছে, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্ল মার্কসের তত্ত্ব শ্রমিকের দিগ্‌দর্শন; কার্ল মার্কস শ্রমিককে ভবিষ্যতের ভরসা দিয়াছেন।

পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন প্রথা শ্রমিকের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাই মার্কসের অর্থনীতির প্রথম কথা।

দাসত্বের যুগে দাসকে শোষণ করা হইত, ইহা বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না।

সামন্ততন্ত্রের যুগেও ভূমিদাসকে শোষণ করা হইত। ইহাও সুস্পষ্ট। ভূমিদাস নিজের জমিতে হয়ত খাটিত সপ্তাহে চারদিন; আর তিনদিন খাটিত মনিবের জমিতে।

উভয়ক্ষেত্রেই শোষণের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। আমরা বিভ্রান্ত হই পুঁজিতন্ত্রের ব্যাপারে। পুঁজিতন্ত্রে কি সত্যই শ্রমিককে শোষণ করা হয়? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রমিক স্বাধীন মানুষ; দাস কিংবা ভূমিদাসের মত মনিবের জন্য খাটিতে হয় না। শ্রমিক ইচ্ছা হয় কাজ করিবে, না হয় না করিবে। শ্রমিক মনিবের অধীনে কাজ করে; সপ্তাহ শেষ হইলে সে তাহার মজুরি বুঝিয়া লয়। ইহা কি কখনও শোষণ?

কার্ল মার্কস ইহাতে সায় দিতে পারেন নাই। তিনি বলেন,—দাসযুগে কিংবা সামন্তযুগে যেমন শ্রমিককে শোষণ করা হইয়াছে, পুঁজিতন্ত্রেও তাহাই করা হয়। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে পুঁজিতন্ত্রে শোষণের কাজটুকু করা হয় প্রচ্ছন্নভাবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। মার্কস তাহাই খুলিয়া ধরেন তাঁহার 'বাড়্‌তি-মূল্য' বা 'সারপ্লাস্ ভ্যালু'র তত্ত্বটিদ্বারা।

এই তত্ত্বটির আসল কথা,—দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে শ্রম দেওয়া হয়, তাহাদ্বারাই নির্ধারিত হয় দ্রব্যের মূল্য। মার্কস বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন : 'ব্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ শ্রমের সঙ্গে শ্রমের বিনিময়, শ্রমদ্বারাই যথার্থত দ্রব্যের মূল্য ঠিক করা হয়।'

দ্রব্যের মূল্য বলিতে মার্কস সকল দ্রব্যের কথা বলেন নাই। যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় বিনিময়ের জন্য—বাজারের বিক্রয়ের জন্য, এরকম দ্রব্যের কথাই তিনি বলিয়াছেন। নিজের ব্যবহারে না লাগাইয়া বিনিময়ের জন্য যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয়, মার্কস এরূপ দ্রব্যকে বলেন 'পণ্য'। পণ্য-উৎপাদন পুঁজি-তন্ত্রী সমাজেরই বিশেষত্ব। এই পণ্যের বিশ্লেষণ হইতেই মার্কসের গবেষণার সুরু।

কেহ যদি একটি কোট তৈয়ার করেন নিজের ব্যবহারের জন্য, তবে তাহা পণ্য নয়। কোটটি যদি বানানো হয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য, টাকা কিংবা অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য তবে তাহা পণ্য।

এখন প্রশ্ন, কি মূল্যে এই পণ্যের বিনিময় হইবে। কোটটির তুলনা করা যাউক একজোড়া জুতার সঙ্গে। দুইটি দুই জাতের পণ্য, দুইটির গুণ দুই রকম, দুইটি দুই রকমের অভাব মিটায়। অতএব, পরিষ্কারই দেখা যাইতেছে—কোট এবং জুতার মধ্যে তুলনা চলিতে পারে উহাদের এমন সাদৃশ্য নাই মোটেই। শুধু কোট ও জুতারই যে সাদৃশ্য নাই তাহা নয়; পেন্সিল, রুটি, কাগজ কোন দ্রব্যের সঙ্গেই দুইটির একটিরও সাদৃশ্য নাই। কিন্তু তবুও ইহাদের পরস্পরের বিনিময় হয়; কেননা কোট, জুতা, পেনসিল, কাগজ সবই মানুষের শ্রমের ফল। পণ্য মাত্রই মানুষের শ্রমদ্বারা উৎপাদিত। অতএব, দ্রব্যগুলির উৎপাদনে কতটুকু শ্রম দেওয়া হয়, তাহাদ্বারাই পণ্যের মূল্য অর্থাৎ কি হারে একটি পণ্যের অপর পণ্যের সঙ্গে বিনিময় হইবে তাহা ঠিক হয়। শ্রমের আবার পরিমাপ করা হয় শ্রমের সময় দ্বারা। বস্ত্র মাপ করা হয় দৈর্ঘ দ্বারা, চিনি মাপ করা হয় ওজন দ্বারা, তেমনি শ্রমের পরিমাপ হয় শ্রমের সময় দ্বারা। যদি একটি কোট তৈয়ার করা যায় ষোল ঘণ্টায়, আর একজোড়া জুতা আট ঘণ্টায়—তবে কোটের মূল্য জুতার দ্বিগুণ। একটি কোটের বিনিময় দুই জোড়া জুতার সঙ্গে। অবশ্য কোট তৈয়ার করিতে যে ধরনের শ্রম দেওয়া হইয়াছে, জুতা তৈয়ার করিতে সে ধরনের শ্রম দেওয়া হয় নাই। দর্জির শ্রম আর মুচির শ্রম একই রকম নয়। কিন্তু তবুও দুইই মানুষের শ্রম, মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়। এই হিসাবেই কোট এবং জুতা পরস্পর তুলনীয়; দুইই মানুষের শ্রমের ফল, এই হিসাবে দুইই এক। প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ একজন কুলির শ্রম এবং ঘড়িনির্মাতার শ্রম কি সমান? দক্ষ-শ্রম অ-দক্ষশ্রমের কয়েকগুণ ধরিলেই হয়। যেমন, কুলির আট ঘণ্টা শ্রম ঘড়ি নির্মাতার এক ঘণ্টা শ্রমের সমান।

আরও একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—কোন একটি দ্রব্য তৈয়ার করিতে যাহার যত বেশী সময় দরকার হয়, তাহার দ্রব্যের মূল্য তত বেশী। একজোড়া জুতা তৈয়ার করিতে একজন মুচির দরকার হয় দশ ঘণ্টা, অপর একজনের

আট ঘণ্টা, তৃতীয় একজনের ছয় ঘণ্টা। তবে কি প্রথম মুচির তৈয়ারী জুতার মূল্য সকলের বেশী? মার্কস উত্তর দিয়াছেন : যদি শ্রমের সময় দ্বারাই মূল্য ঠিক হয়, তবে মনে হইতে পারে, যে সবচেয়ে অলস তাহার তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যই সবচেয়ে বেশী; কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। শ্রম-সময় বলিতে বুঝিতে হইবে সামাজিক শ্রম-সময়, একক ব্যক্তির শ্রম-সময় নয়। শ্রমের একটা গড় আছে। একটা কারখানায় একশ' মুচি কাজ করে; অধিকাংশ মুচিই আট ঘণ্টায় এক জোড়া জুতা তৈয়ার করে; কিছু মুচির হয়ত দশ ঘণ্টা লাগে; আবার কয়েকজন ছয় ঘণ্টায়ই তৈয়ার করে। জুতা তৈয়ারীর জন্য আট ঘণ্টাই ধরিতে হইবে গড় অথবা শ্রম-সময়।

ধরা যাউক যেন সামাজিক শ্রমদ্বারাই দ্রব্যের মূল্য ঠিক হয়; কিন্তু ইহা হইতে কিরূপে প্রমাণ হয় যে পুঁজিতন্ত্রী সমাজে শ্রমিক শোষিত হইতেছে, মালিকেরা সর্বহারা শ্রমিকের শ্রমের উপর বিলাসের জীবন গড়িতেছে? কিরূপে প্রমাণ হয় যে শ্রমিক,—মধ্যযুগের ভূমিদাসের মত—কিছুটা সময় কাজ করে নিজের জন্য, কিছুটা সময় মনিবের জন্য?

মার্কস খুব সহজেই তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজে শ্রমিক একজন স্বাধীন মানুষ। শ্রমিক দাসত্ব-যুগের দাসের মত মনিবের গোলাম নয়, আবার মধ্যযুগের ভূমিদাসের মত জমিতেও আট্‌কা নয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কিরূপে সে শুধু মনিবের অধীনতা হইতেই নয়, উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা হইতেও মুক্ত হইয়াছে। ভূমি, উৎপাদনের যন্ত্রাদি কিরূপে মাত্র মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়,—সে ইতিহাস আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। যাহারা এগুলি হইতে বঞ্চিত তাহারা শুধু যন্ত্রাদির মালিকের নিকট নিজেদের ভাড়াটেরূপে খাটাইয়াই জীবিকা অর্জন করিতে পারে। অবশ্য শ্রমিক কখনও নিজেকে বিক্রয় করিয়া দেয় না, শ্রমিক বিক্রয় করে তাহার একমাত্র সম্পত্তি,—নিজের শ্রমশক্তি।

টাকাকে পুঁজিতে পরিণত করিতে মালিকের যাইতে হয় স্বাধীন শ্রমিকের খোঁজে—স্বাধীন দুই অর্থে, তাহার নিজের সম্পত্তি--শ্রমশক্তি—বিক্রয়ের বাধা তাহার কিছুই নাই; আবার অন্য কোনও পণ্যও তাহার নাই যাহা সে বিক্রয় করিতে পারে; শ্রমিকের এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা সে তাহার শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইতে পারে। বস্ত্র তৈয়ারীর উপকরণ যদি তাহার থাকিত, তবে বাজারে সে বস্ত্রই বিক্রয় করিত; কখনও নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে যাইত না।

কি হারে এই স্বাধীন শ্রমিক তাহার পণ্য বিক্রয় করিবে? অর্থাৎ তাহার শ্রমশক্তির মূল্য কি? অন্যান্য পণ্যের মতই শ্রমশক্তি উৎপাদন করিতে যে

শ্রম প্রয়োজন তাহা দ্বারাই শ্রমশক্তির মূল্য ঠিক হয়। সহজ কথায়, শ্রমিক এবং তাহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যাহা দরকার তাহাই শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য। জীবনযাত্রার মান সর্বত্র একরকম নয়; তাই শ্রমশক্তির মূল্য ইংলণ্ডে বেশী, ভারতবর্ষে কম।

মার্কস বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'শ্রমশক্তির মূল্যের অর্থ শ্রমিকের ভরণ পোষণের জন্য যে সকল দ্রব্য এবং উপকরণের প্রয়োজন, সে সকলের মূল্য......শ্রম-কারী হিসাবে যেন সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করিতে পারে তদনুযায়ী হওয়া চাই ভরণপোষণের উপকরণ।......শ্রমিককে একদিন মরিতে হইবে......মৃত্যু অথবা বার্ধক্যের দরুন যদি শ্রমিকের শ্রমশক্তি নষ্ট হইয়া যায় তবে নূতন শ্রমশক্তি'কে উহার জায়গা লইতে হয়... ..তাই শ্রমিকের ভরণপোষণ অর্থে বুঝিতে হইবে শ্রমিকের সন্তানাদির তথা সমগ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ।'

সহজকথায়, শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তির পরিবর্তে যে মজুরি পাইবে তাহা শ্রমিকের নিজের এবং তাহার পরিবারের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই।

মার্কস শ্রমশক্তিকে বলিয়াছেন বিশেষ প্রকারের পণ্য। 'বিশেষ' কথাটির অর্থ কি? এই দিক হইতেই ইহার বিশেষত্ব যে, শ্রমশক্তি নিজের মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য সৃষ্টি করিতে পারে। শ্রমিক মালিকের ভাড়াটে; যতটুকু সময় খাটিলে তাহার শ্রমশক্তির মূল্য উঠিয়া আসে তাহার চেয়ে বেশী সময় সে খাটে। যদি মোট দশ ঘণ্টা তাহাকে খাটিতে হয়, তবে ছয় ঘণ্টা খাটিয়াই হয়ত সে তাহার শ্রমশক্তির মূল্য অর্থাৎ মজুরি উঠাইয়া লয়; শ্রমিক আরও চার ঘণ্টা বেশী সময় খাটে; এই সময়টুকু সে নিজের জন্য খাটে না, মনিবের জন্য খাটে। প্রথম ছয় ঘণ্টা 'আবশ্যক-শ্রমসময়', পরের চার ঘণ্টা 'বাড়তি-শ্রমসময়।' দশ ঘণ্টায় যে মোট মূল্য উৎপাদন হয়, উহার দশভাগের ছয় ভাগ মজুরি; আর দশ ভাগের চার ভাগ বাড়তি মূল্য বা 'সারপ্লাস ভ্যালু।' পরের চার ঘণ্টার মূল্য আত্মসাত করে মনিব; ইহাকেই বলা হয় মালিকের মুনাফা বা প্রফিট্।

কোন একটি পণ্যের মধ্যে যে মোট শ্রম নিহিত তাহা দিয়া ঠিক হয় সমগ্র পণ্যটির মূল্য। পণ্যটির মধ্যে আছে পুরাতন শ্রম এবং নূতন শ্রম; নূতন শ্রমের আবার দুই অংশ—একটির জন্য মালিক মজুরি দিয়াছে, অপর অংশটির জন্য মনিবকে কিছুই খরচ করিতে হয় নাই। ধরা যাউক যেন একটি কারখানায় বস্ত্র উৎপাদন হয়. একজন শ্রমিক দশ ঘণ্টায় একটি বস্ত্র উৎপাদন করে; বস্ত্রটির মধ্যে আছে সুতা। সুতার মূল্য পুরাপুরি চুকাইয়া দিয়া মালিক বাজারে সুতা হাত করিয়াছে; একটি বস্ত্রের মধ্যে যে সুতা রহিয়াছে

তাহার মূল্য হয়ত আট ঘণ্টা শ্রম সময়ের সমান। মালিক পুরা মূল্য দিয়াই বাজারে সুতা কিনিয়াছে। বস্ত্রের মধ্যে যে সুতা আছে তাহা আট ঘণ্টা, বস্ত্র উৎপাদনকারী শ্রমিকের মজুরি ছয় ঘণ্টা, এবং শ্রমিক আরও খাটে অতিরিক্ত চার ঘণ্টা। বস্ত্রের মোট মূল্য কুড়ি ঘণ্টা। পুরাতন মূল্য আট ঘণ্টা এবং নূতন মূল্য ছয় ঘণ্টা হইতে মালিকের কিছুই লাভ হয় না; শ্রমিককে অতিরিক্ত চার ঘণ্টা খাটাইয়া আরও যে নূতন মূল্য সৃষ্টি হয় তাহাই মালিকের লাভ। মালিক বস্ত্রটি বাজারে বিক্রয় করে উহার যথার্থ মূল্যে অর্থাৎ কুড়ি ঘণ্টার শ্রমের মূল্যে; তবুও তাহার লাভ থাকে চার ঘণ্টার শ্রমের মূল্য। প্রতি ঘণ্টায় ধরা যাউক চার আনা মূল্য সৃষ্টি হয়; বস্ত্রের মোটমূল্য পাঁচ টাকা। বস্ত্রের যাহা ঠিক মূল্য, সেই মূল্যেই বাজারে উহা বিক্রয় করিয়াও মালিকের লাভ থাকে চার ঘণ্টা শ্রমসময়ের মূল্য অর্থাৎ এক টাকা। অতএব বস্ত্রের যে অংশটুকুর জন্য মালিক খরচ করিয়াছে তাহা তো সে বিক্রয় করেই, যে অংশটুকুর জন্য সে খরচ করে নাই তাহাও বিক্রয় করে; শ্রমিক অবশ্য এই অংশটুকুর জন্য শ্রম খরচ করিয়াছে। পণ্যের মূল্যে এবং পণ্যটি উৎপাদন করিতে মালিকের যাহা খরচ হয়; তাহা কখনও সমান নয়। পণ্যটি বাজারে উহার যথার্থ মূল্যে বিক্রয় করিয়াও মালিক মুনাফা রাখে।

অতএব, এখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে—পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনে কি ভাবে শ্রমিককে শোষণ করা হয়। সংক্ষেপে, পুঁজিতন্ত্র উৎপাদন করে পণ্য; উৎপাদনকারী তাহা নিজে ব্যবহার করে না, বাজারে বিক্রয় করে।

পণ্যউৎপাদনে যে পরিমাণ সামাজিক শ্রমের প্রয়োজন তাহা দিয়াই ঠিক হয় পণ্যের মূল্য।

উৎপাদনের উপকরণগুলির (ভূমি, যন্ত্র, কারখানা) স্বত্ব হইতে শ্রমিক বঞ্চিত। জীবনধারণের জন্য শ্রমিককে বিক্রয় করিতে হয় একমাত্র পণ্য—তাহার নিজের শ্রমশক্তি।

অন্যান্য পণ্যের মতই শ্রমশক্তির উৎপাদনের জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহাই উহার মূল্য—অর্থাৎ শ্রমিকের ভরণপোষণের উপকরণই শ্রমশক্তির মূল্য।

অতএব শ্রমিককে যে মজুরি দেওয়া হয় তাহা তাহার ভরণপোষণের উপযোগী হওয়া দরকার।

শ্রমিক মোট শ্রমসময়ের একটা অংশের খাটুনি দিয়াই মজুরির মূল্য উৎপাদন করে। অর্থাৎ মোট খাটুনির একটা অংশমাত্র সে নিজের জন্য ব্যয় করে।

বাকী সময়টা শ্রমিক মনিবের জন্য খাটে। শ্রমিক যে মোট মূল্য উৎপাদন করে উহার চেয়ে কম শ্রমিকের মজুরি। এই অবশিষ্ট মূল্য বাড়তি মূল্য অথবা 'সারপ্লাস্ ভ্যালু'।

বাড়্‌তি মূল্য মালিকের প্রাপ্য। পুঁজিতন্ত্রে বাড়্‌তি মূল্য দ্বারা শোষণের মাত্রা ঠিক করা হয়।

(৩)

কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন সত্য, কিন্তু শিল্পজগতে যে সমস্ত শক্তি কাজ করিতেছে সেগুলি তাহাদের পথে বাধা হইবে কিনা তাহা ইহারা মোটেই ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহাদের ধারণা ছিল, আদর্শ সমাজের একটা পরিকল্পনা ঠিক করিয়া ধনী-দরিদ্র সকলের নিকট উহা উপস্থিত করিলেই চলিবে; ছোট আকারে পরিকল্পনাটিকে রূপ দেওয়ার প্রয়াসও করা যাইতে পারে; এ ব্যাপারে জনসাধারণের যুক্তিবত্তা ও ন্যায়বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায়।

বিখ্যাত ইংরাজ সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েন শ্রমিকদের বিপ্লবের আহ্বান জানান নাই, বরং তাঁহার গ্রন্থে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নিকট তিনি আবেদন জানান, তাহার রাজত্বকালেই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজের জন্ম হইবে।

বিখ্যাত ফরাসী সমাজতন্ত্রী চার্লস্ ফোরিয়ারও শ্রমিকশ্রেণীর দিকে না তাকাইয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টায় সাহায্য চান বড়লোকদের নিকট। সেণ্ট সাইমনের শিষ্যরাও বিশ্বাস করিতেন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বুর্জোয়ার সঙ্গে সহযোগিতা প্রয়োজন।

মার্কস কল্পনাবাদীদের এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" গ্রন্থে মার্কস এবং এঙ্গেলস্ ইহাদের সম্পর্কে লিখেন : "ইহারা (কল্পনাবাদীরা) সমাজের প্রত্যেকটি লোকের অবস্থার উন্নতি করিতে চান, এমন কি যাহারা পরম সৌভাগ্যবান্ তাহাদেরও। তাই ইহারা শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলের নিকট আবেদন জানান, বিশেষ ভাবে শাসকশ্রেণীর নিকট। একবার যদি লোকে বুঝে তাহারা কিরূপ সমাজে বাস করে, তবে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সমাজ সম্পর্কে তাহারা অবশ্য সচেতন হইবে।

"তাই তাহারা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, বিশেষত বৈপ্লবিক কর্মপন্থা পরিহার করেন; শান্তির পথে ইহারা লক্ষ্যে পৌঁছিতে চান,......পরীক্ষামূলক-ভাবে তাঁহারা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার, ছোট আকারে সাম্যতন্ত্রী উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন......শূন্যে সৌধ নির্মাণের এই প্রয়াসে ইহারা বুর্জোয়ার মনের নিকট এবং বুর্জোয়ার থলিয়ার নিকট আবেদন জানান।"

বুর্জোয়ার সাহায্য লওয়ার ব্যাপারটা মার্কস এবং এঙ্গেলস্ মোটেই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। ইহাদের মতে, শাসকশ্রেণী বর্তমান সমাজকে

চালু রাখিতেই চেষ্টা করিবে, আর শ্রমিকেরা বৈপ্লবিক কর্মপন্থা দ্বারা নূতন সমাজ প্রবর্তনের চেষ্টা করিবে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেবেল এবং অন্যান্যদের নিকট লেখা পত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলস্ লিখেন : 'চল্লিশ বছর ধরিয়া আমরা বলিয়া আসিতেছি যে শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাস গড়ে; বর্তমান সমাজবিপ্লব বুর্জোয়া ও শ্রমিকের লড়াইয়ের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইবে। এই কারণে, শ্রমিকের আন্দোলন হইতে যাহারা শ্রেণীসংগ্রামকে বাদ দিতে চায়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সংঘ গড়িয়া তোলার সময়ে আমরা সুস্পষ্ট আওয়াজ তুলিয়াছিলাম, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকেরাই সফল করিবে।'

'শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে',—মার্কস ও এঙ্গেলসের এই উক্তির তাৎপর্য কি? ইতিহাসকে ইঁহারা কিভাবে দেখিয়াছেন তাহা হইতেই এই উক্তির যথার্থ অর্থ পাওয়া যাইবে। আমরা কি বিশ্বাস করি যে ইতিহাসের ঘটনাগুলি কতকগুলি আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, ইহাদের যোগসূত্র বলিয়া কিছুই নাই? আমরা কি মনে করি যে ইতিহাস গড়িয়া উঠে বড়-লোকদের প্রভাবে?

এই দুইটির একটিতেও যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও মার্কসবাদী নন। মার্কসের মতে ইতিহাসের ধারা এবং ইতিহাসের পরিবর্তনগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সমাজের অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে।

ইতিহাসের ঘটনাগুলি স্বয়ংসিদ্ধ নয় মোটেই; বরং ইহারা পরস্পর জড়ানো। ইতিহাসকে মনে হয় বিশৃংখল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস নিয়মের অধীন; নিয়ম আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

এঙ্গেলস্ মার্কসের দর্শন সম্পর্কে লিখিয়াছেন : সারা বিশ্ব—প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং মানস,—একটা ক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা গতিশীল, বিকাশের পথে নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে......অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব; আইন, ধর্ম ও শিক্ষা—ইহারা পরস্পরের সঙ্গে একই সূত্রে সংগ্রথিত; প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এসবের ভিত্তিমূল অর্থনীতি। উৎপাদনকারীরূপে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই আসল কথা। কোন একটি বিশেষ সমাজে এবং বিশেষ যুগে ব্যক্তির জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই সমাজের এবং সেই যুগের উৎপাদন পদ্ধতি।

মার্কস নিজেই বলিয়াছেন : আইনগত সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের রূপ বুঝিতে হইলে নিছক আইন কিংবা রাষ্ট্রতত্ত্বের গবেষণা হইতে তাহা বুঝা যায় না; মনের বিকাশ কথাটি দ্বারাও কিছুই বোধগম্য হয় না। জীবনের বৈষয়িক ব্যাপারগুলির মধ্যে রহিয়াছে ইহাদের মূল......উৎপাদনের কাজে মানুষকে অংশ গ্রহণ করিতেই হয়......সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে ইহারা পরস্পরের

সঙ্গে সম্পর্কে ঢুকে......সম্পর্কগুলি গড়িয়া উঠে উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে সমতালে। এই সম্পর্কগুলির সমষ্টিই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো—অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তির উপরই আইনের এবং রাষ্ট্রের সৌধ গড়িয়া উঠে। অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সামাজিক-চেতনা বা মানস-জীবনও গড়িয়া উঠে। মানুষের বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ভাবগত ক্রমগুলির জন্ম দেয়। মানুষের চেতনা তাহার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না; পক্ষান্তরে, সমাজে তাহার অস্তিত্বই চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মার্কসের দর্শন ইতিহাসের বিশ্লেষণমূলক একটা ব্যাখ্যা দেয়। মানুষ যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করে—উৎপাদন এবং বিনিময়ের পদ্ধতি—তাই সকল সমাজের ভিত্তি।

"সমাজে কি উৎপাদন হয়, কিভাবে উৎপাদন হয়—তাহার উপর নির্ভর করে ধনবণ্টনের পদ্ধতি এবং শ্রেণীবিভাগের রূপ।" একই প্রকারে, প্রত্যেকটি সমাজের সত্য ও ন্যায়ের ধারণা এবং কৃষ্টির রূপ সেই সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরটির উপর নির্ভরশীল। এখন আমাদের দেখিতে হইবে রাষ্ট্র-নৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লব আসে কিরূপে? মানুষের ভাব এবং ধারণার পরিবর্তন হইতেই কি বিপ্লব হয়? কখনও নয়; কেননা, অর্থনীতির মধ্যে—উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতিতে—পরিবর্তন হইতেই দেখা দেয় ভাব ও ধারণার পবিবর্তন।

প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনা, প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের সকল সময়ের চেষ্টা। মানুষ দ্রব্য উৎপাদনের এবং বণ্টনের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করে। পরিবর্তনগুলি যদি মৌলিক এবং সুদূরপ্রসারী হয়, তবেই সমাজে বিরোধ দেখা দেয়, সংঘাত সৃষ্টি হয়। পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির সময়ে সমাজে যে সব সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, সেগুলি দৃঢ়বদ্ধ অভ্যাসে পরিণত হয়। জীবন-যাত্রার পুরাতন ভঙ্গী আইন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ধর্মমতের মধ্যে অনড়, অপরিবর্তনীয় আকার লয়। যে শ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা, কিছুতেই তাহারা এই অধিকার পরিত্যাগ করিতে চায় না; যে শ্রেণী নূতন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সমতালে চলিতে চায় তাহার সঙ্গে সংঘাত অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই সংঘাতের ফল বিপ্লব।

মার্কস ইতিহাসকে যেভাবে বিচার করিয়াছেন, সেভাবে বিচার না করিলে জগত অবোধ্য থাকিয়া যায়। মানুষ কিভাবে জীবিকা অর্জন করে,—তাহা হইতেই হয় সমাজে শ্রেণী বিন্যাস; পরস্পরের শ্রেণীসম্বন্ধের দিক হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে দেখিলে, ইতিহাস আর দুর্জ্ঞেয় থাকে না। এই

পথেই আমরা বুঝিতে পারি, সমাজ কি রূপে সামন্ততন্ত্র হইতে পুঁজিতন্ত্রে আসিয়াছে, পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মার্কস এবং এঙ্গেলস্ অতীতকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই ইতিহাসে বুর্জোয়ার স্থান কোথায় এবং উহাদের যথাযথ ভূমিকা কি, সহজেই সে নির্দেশ দিতে পারিয়াছিলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ পুঁজিতন্ত্র এবং পুঁজির মালিকের দোষ দেখান নাই; তাহারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে পুঁজিতন্ত্র উহার পূর্বেকার অবস্থাগুলি হইতে জন্মিয়াছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম করিয়াছে মার্কস-এঙ্গেলস্ তাহার উপর জোর দেন।

"তাই আমরা দেখি : যে উৎপাদন এবং বিনিময়ের পদ্ধতির ভিত্তির উপর বুর্জোয়া নিজেদের সমাজ গড়িয়া তোলে, সেই বুর্জোয়া সমাজের জন্ম হয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যে। উৎপাদন এবং বিনিময়ের পদ্ধতির বিকাশের বিশেষ একটি স্তরে সামন্ততান্ত্রিক বিত্ত-সম্পর্ক সদ্য বিকশিত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সমতালে চলিতে অসমর্থ হয়; উহারা নূতন উৎপাদন শক্তিকে শৃংখলিত করিয়া রাখিতে চায়। এই শৃংখল ছিঁড়িয়া বাহির হওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা; পুঁজিতন্ত্র তাহাই করে।

"পুরাতন বিত্ত-সম্পর্কের যায়গায় আসে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং উহার উপযোগী রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামো—এইভাবে বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"

অতএব, সামন্ততন্ত্র হইতে পুঁজিতন্ত্রে পরিবর্তন হইতে পারে, যেহেতু তখন নূতন উৎপাদনশক্তির এবং একটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর (বুর্জোয়ার) আবির্ভাব হয়। ব্যক্তির প্রয়োজনে এবং তাগিদে কখনও পুরাতনের স্থানে নূতনের আবির্ভাব হয় না। নূতন উৎপাদনশক্তির জন্ম হওয়া চাই, এবং এই নূতন উৎপাদনশক্তির পরিচালনার জন্য নূতন বৈপ্লবিক শ্রেণীর উপস্থিতিও চাই। সামন্ততন্ত্র হইতে পুঁজিতন্ত্রে পরিবর্তনের সময় তাহা হইয়াছিল; পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তনের সময়ও তাহাই হইবে। পুঁজিতন্ত্র যে ভাঙিয়া পড়িতেছে, মার্কস এবং এঙ্গেলস্ তাহার কি প্রমাণ দিয়াছেন?

মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে ধন জমিতেছে; বড় বড় উৎপাদকেরা ছোট ছোট উৎপাদকদের গ্রাস করিতেছে; উন্নততর কলের ব্যবহার দ্বারা মালিকেরা শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিতেছে এবং বেকারে পরিণত করিতেছে; জনগণের দারিদ্র বাড়িতেছে; পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় কয়েক বছর পর পর সংকটের সৃষ্টি হইতেছে—একটি অপরটি হইতে তীব্রতর।

পুঁজিতন্ত্রে সবচেয়ে বড় বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে—উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বণ্টনের রীতির মধ্যে; বহুলোক একত্র হইয়া সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন করে; অথচ ইহাদের শ্রমের ফল আত্মসাত করে কতিপয় মালিক। সমবেতভাবে যাহা উৎপাদন হয়, তাহা হইয়া দাঁড়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ইহাই শ্রমিক-মালিক বিরোধের মূল।

মার্কস ক্যাপিটাল গ্রন্থে এসম্পর্কে বলিয়াছেন, 'বড় পুঁজিতন্ত্রী মালিক ছোট মালিকদের গ্রাস করে। কতিপয় মালিকের হাতে পুঁজির সংকেন্দ্রন হয়; সঙ্গে সঙ্গে শ্রমপদ্ধতি সমষ্টিগত রূপ লয়;......এদিকে শোষণ, অত্যাচার, দাসত্ব বাড়িতে থাকে; কিন্তু একই সঙ্গে দেখা দেয় সংঘবদ্ধ শ্রমিকের বিদ্রোহ... পুঁজির সংকেন্দ্রন এবং শ্রমের সমাজতান্ত্রিকরূপ অবশেষে এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যখন আর পুঁজিতন্ত্রী কাঠামোর মধ্যে ইহারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হয় না।'

পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদন যেমন সমাজতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে, উৎপাদনের ফলও যাহাতে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হয়—মার্কস এবং এঙ্গেলস্ সেই রূপ সুসমঞ্জস সমাজেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন; এই বকম সমাজে উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণাদির মালিক হইবে সমাজ অর্থাৎ উৎপাদনকারী শ্রমিকেরা; উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণাদির উপর ব্যক্তির মালিকানা বিলোপ হইবে। এই পরিবর্তন আনয়ন করিবে শ্রমিক; কেননা, যে ব্যবস্থায় শ্রমিক তাহার যথার্থ ভাগ হইতে বঞ্চিত, সেরূপ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিতেই সে চেষ্টা করিবে। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা মালিকের ব্যক্তিগত স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; শ্রমিকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ চায়।

মার্কস এবং এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লিখেন, "বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কথায় আতঙ্কিত হয়; কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে দশ ভাগের নয় ভাগ লোকেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ হইয়াছে।" সমাজের এই এক ভাগের ব্যক্তিগত সম্পত্তিই শ্রমিকেরা বিপ্লবের দ্বারা সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করিবে।

"সাম্যবাদীরা তাহাদের মতামত গোপন করিতে ঘৃণাবোধ করে। তাহারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিতেছে যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে জোর করিয়া উঠাইয়া দিয়াই তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে। শাসকশ্রেণী সাম্যবাদী বিপ্লবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। বিপ্লবে সর্বহারা শ্রমিকদের সবটাই লাভ; শৃংখল ব্যতীত তাহারা কিছুই হারাইবে না।" শ্রেণীসংগ্রাম যে অপরিহার্য তাহা দেখাইয়া মার্কস সর্বদেশের শ্রমিকদের এক হওয়ার আহ্বান জানান।

মালিকের এবং সর্বহারা শ্রমিকের সংগ্রামে মালিকের পক্ষে দাঁড়ায় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ক্ষমতা শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই নিয়োজিত হয়—বর্তমান সমাজে বুর্জোয়াই শাসকশ্রেণী। অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে শ্রেণীর প্রাধান্য, শাসনদণ্ড সেই শ্রেণীরই হাতে।

"বিশেষ একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণ করার জন্য সুসংহত ক্ষমতাই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা।" আমরা সাধারণত মনে করি, রাষ্ট্র শ্রেণীর ঊর্ধ্বে—গভর্নমেণ্ট ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই প্রতিনিধি। কিন্তু আজিকার সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যক্তিগত বিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; ব্যক্তিগতবিত্তই পুঁজিতন্ত্রের মর্মস্থল। উহার উপর আক্রমণ হইলে রাষ্ট্র অবশ্য তাহা প্রতিরোধ করিতে আগাইয়া আসিবে। বস্তুত, যতক্ষণ শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততক্ষণ রাষ্ট্র শাসকশ্রেণীরই যন্ত্র।

মার্কস এবং এঙ্গেলস্ শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান জানান। এই প্রস্তুতির অর্থ,—শ্রেণীহিসাবে সচেতন হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সামাজিক বিকাশের বর্তমান স্তরটিতে তাহাদের নিজস্ব ভূমিকা কি—সে সম্পর্কে জানা। শোষণ অপসারণ করিতে, ব্যক্তিগতবিত্তের বিলোপ করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী এবং শ্রেণীশাসন নির্মূল করিতে প্রস্তুত হওয়া শ্রমিকের কর্তব্য। পুঁজিতন্ত্রের ভাঙ্গন আসন্ন; কিন্তু যদি সর্বহারা শ্রমিকের দল প্রস্তুত না থাকে, তবে দেখা দিবে অরাজকতা ও বিশৃংখলা; আর যদি তাহারা প্রস্তুত থাকে তবে এই ভাঙ্গন হইতে দেখা দিবে সমাজতন্ত্র।

সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সংকট

(১)

পুঁজিতন্ত্রের চরম বিকাশ হয় উনিশ শতকে; শুধু ইংলণ্ডেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে না; পুঁজিতন্ত্র একদেশ হইতে অন্যদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডেই প্রথম শিল্প-বিপ্লব হয়, সুতরাং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে সে দেশের মালিকেরাই অগ্রণী—প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদের প্রথম একটা ছিলই না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে, ইংলণ্ডের মালিকদের তাহাদের মালের জন্য বাজারের কথা ভাবিতেই হইত না; বরং কতশীঘ্র তাহারা বিদেশের চাহিদা অনুরূপ উৎপাদন করিতে পারিবে তাহাই ছিল সমস্যা। কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে সে অবস্থা আর থাকে নাই। আমেরিকা, জার্মানি, রুশিয়া, ফরাসী—সকলেই স্বদেশের বাজার স্বদেশের দ্রব্যের জন্য সংরক্ষিত ও নিরাপদ রাখিতে চায়; তাই বিদেশের দ্রব্যের উপর ইহারা উচ্চহারে শুল্ক বসায়। সংরক্ষণ-শুল্কের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ইংলণ্ডের মাল এখন আর অন্যদেশের বাজারে সহজে ঢুকিতে পারে না। জার্মানি, আমেরিকা—সকল দেশই নিজেদের শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। সুতরাং তাহাদের আর ইংলণ্ডের মালের তাগিদ নাই। শুল্ক-প্রাচীরের আড়ালে ইহাদের "শিশুশিল্প"গুলি বিরাট বৃহদাকার শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

১৮৭০ সাল হইতেই সুরু হয় আমেরিকায় ট্রাস্টের যুগ এবং জার্মানিতে কার্টেলের যুগ। প্রতিযোগিতার জায়গা দখল করে একচেটিয়া ব্যবসায়। ছোট ছোট মালিকেরা উৎপাদনের জগত হইতে বিতাড়িত হয়, বড় মালিকেরা ছোটদের গ্রাস করে। ছোট শিল্পকে বড় শিল্প ভাঙ্গিয়া দেয়; অনেক সময় ছোটগুলি বড়গুলির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

প্রতিযোগিতার উপর আক্রমণ বাহির হইতে আসে নাই, উহার ধ্বংসের কারণ জন্মে ভিতরেই। একচেটিয়া ব্যবসায় বাহির হইতে আসিয়া প্রতিযোগিতার উপর চড়াও হয় নাই; প্রতিযোগিতার মধ্য হইতেই উহার উদ্ভব। রাস্তাঘাটের এবং যানবাহনের সুবিধা হওয়ায়,—উৎপাদনের উপকরণাদি এক-জায়গায় জড়ো করা সহজ হইয়াছে। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি হওয়ায়, উৎপাদনের মাত্রাও বাড়িয়াছে। অতএব, বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বড় আকারে

উৎপাদনের এখন আর অসুবিধা নাই। বড় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের খরচ কম। সুতরাং ছোট ছোট কারবারের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা সম্ভব নয়; বাধ্য হইয়া উহা বড়র সঙ্গে মিশিয়া যায়, নয়ত সরিয়া পড়ে। মার্কস এই লড়াইয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : "প্রতিযোগিতার লড়াই করা হয় দ্রব্যের দর কমাইয়া; দ্রব্যের দর কমানো সম্ভব শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যদি বাড়ে; ছোট কি বড় আকারের উৎপাদন তাহার উপর নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা। অতএব বৃহত্তর পুঁজি ছোট পুঁজিকে পরাভূত করে......প্রতিযোগিতায় ছোট উৎপাদন ধ্বংস হয়; হয় উহা বড় পুঁজির সঙ্গে মিশিয়া যায়, নয়ত অন্তর্হিত হয়।" সাধারণ প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় প্রভেদ এইখানে যে, প্রথমটিতে দুই পক্ষের প্রতিযোগিতা হয় পুরস্কারের জন্য; যে হারিয়া যায় তাহাকে ধ্বংস করার কথা উঠে না। কিন্তু ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় বড় ছোটকে ধ্বংস করে, অথবা গ্রাস করে। বিজয়ী পূর্বের চেয়েও শক্তিমান হইয়া সামনে যে কেহ আসে তাহাকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। অন্তত কিছুকালের জন্য উহা হইয়া দাঁড়ায় অপরাজেয়। অবাধ প্রতিযোগিতা হইতেই ট্রাস্ট, কার্টেলের জন্ম। প্রথম আমেরিকান ট্রাস্টের জন্ম হয় তৈল শিল্পে; ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী আমেরিকার শতকরা ৬৪ ভাগ তৈলের মালিক হয়। লোহা, চিনি, মদ, কয়লা এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যাপারেও ট্রাস্ট গড়িয়া উঠে। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা, যাহাতে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায় সেইভাবেই ট্রাস্ট উৎপাদিত দ্রব্যের দর ঠিক করে; দর নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রব্য সরবরাহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব চাই; অর্থাৎ কোন একটি দ্রব্য-উৎপাদনে ট্রাস্টের থাকা চাই একচেটিয়া অধিকার।

জার্মানিতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের নাম কার্টেল। একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। উহারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ হইতে দেয় না; তবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে যে বাজারে তাহারা স্বেচ্ছামত চলিবে না; উহাদের যুক্ত সংগঠন অর্থাৎ কার্টেল দ্রব্যের দর ঠিক করিয়া দেয়; বাজারে উহারা সেই দরে দ্রব্য ছাড়িতে বাধ্য থাকে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থামাইয়া দ্রব্যের দর নির্ধারণ করা এবং বাজার বাঁটিয়া দেওয়াই কার্টেলের উদ্দেশ্য। সিণ্ডিকেটে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা একটু কম। কাঁচামাল কেনা এবং পাকামাল বেচার কাজটা সিণ্ডিকেটই করিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে তাহাও সিণ্ডিকেটই ঠিক করিয়া দেয়।

অবাধ প্রতিযোগিতার পীঠস্থান ইংলণ্ডেও ট্রাস্ট গড়িয়া উঠে। ১৯১৯ সালের একটি কমিটি মন্তব্য করে : "আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে অধুনা ইংলণ্ডের সকলরকম উৎপাদনেই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে,

প্রতিযোগিতা নষ্ট করা এবং দর নিয়ন্ত্রণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।" পূর্বে ইংলণ্ডের অর্থনীতিজ্ঞরা বলিতেন : অবাধ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের চাহিদা এবং দ্রব্যের যোগান পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লয়। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। এখন সামঞ্জস্য করে শিল্পপতিরা এবং দর বাঁধিয়া দেয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা।

শিল্পে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় একচেটিয়া ব্যাঙ্কিং। শিল্পপতিদের ব্যাঙ্কারের নিকট না যাইয়া উপায় নাই; কেননা সারাদেশের টাকা উহাদের নিকট আমানত। ইহাদের ক্ষমতা অসীম। শিল্পে যেমন ট্রাস্ট গড়িয়া উঠে, ব্যাঙ্কেও তাহাই হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যাহারা ব্যাঙ্কিং জগতের অধিপতি তাহারাই আবার শিল্পেরও কর্তা। ব্যাঙ্ক-পুঁজি এবং শিল্প-পুঁজির মিশ্রণকে লেনিন বলিয়াছেন ফিনান্স-ক্যাপিটাল। সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ামক ফিনান্স-ক্যাপিটাল।

১৮৭০ এর পর হইতে পুরাতন পুঁজিতন্ত্র নূতন চেহারায় প্রকাশ হয়। অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিতন্ত্র বড় একটা নাই। প্রতিযোগিতাবিহীন এক-চেটিয়া উৎপাদন এখন পুঁজিতন্ত্রের বিশেষত্ব। শিল্পপতিরা এতবেশী উৎপাদন করিতে পারে যে নিজের দেশের বাজারে সবটুকুর কাটতি হয় না। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা স্বদেশের বাজারের চাহিদা মিটায়; উচ্চহারে মুনাফাও পায়। কিন্তু তাহারা উৎপাদন করাইতে পারে অনেক বেশী। সুতরাং উৎপাদনের কাজ পুরাদমে চালাইলে মাল কাটতির জন্য প্রয়োজন বিদেশের বাজার। বাড়তি মাল যদি চালাইতে হয় বিদেশের বাজার দখল ছাড়া অন্য পথ নাই।

কিন্তু জার্মানি, আমেরিকার মত দেশ শুল্ক-প্রাচীর খাড়া করিয়া অন্য দেশের রপ্তানির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহারাই বরং বিদেশের বাজার দখলের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী। এইভাবে শিল্পজগতে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিল্পোন্নত দেশের লোকেরা নিজেরা যাহা ক্রয় করিতে পারে উহার চেয়ে বেশী তাহাদের শিল্পগুলি উৎপাদন করে। সুতরাং বাজার খুঁজিতে যাইতে হয় উপনিবেশগুলিতে, আফ্রিকার জঙ্গলে; কিংবা এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিতে।

আফ্রিকার সারা মানচিত্রটাই নানা রংয়ে চিত্রিত। এক একটা রং এক একটা দেশের অধিকারের চিহ্ন। আশীবছর আগে সারা আফ্রিকা ছিল আফ্রিকা-বাসীদের নিজেদের দেশ। পুঁজিতন্ত্রের একচেটিয়া উৎপাদন যখন হইতে সুরু হইয়াছে, তখন হইতেই পুঁজিপতির নিকট বাড়তি মাল হইয়া দাঁড়ায় বড় রকমের সমস্যা। সেই হইতে উপনিবেশের খোঁজ; দেশ-দখল। বিখ্যাত পাদ্রী লিভিংস্টোন আফ্রিকার অভ্যন্তরে ঢুকেন; তাহাকে খুঁজিতে যান স্টানলী।

স্টান্‌লী স্বদেশে ফিরিয়া শুধু লিভিংস্টোনেরই খবর দেন নাই; নূতন নূতন দেশের কথাও বলেন। বাড়্‌তি মাল কোথায় চালানো যাইবে সে-খবর তিনি পুঁজিপতিদের দেন।

উপনিবেশগুলিতে শুধু যে বাড়্‌তি মালই চালানো সুবিধা হয় তাহা নয়, সেখান হইতে কাঁচামালও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বড় উৎপাদনের জন্য সবসময়ই চাই কাঁচামালের বেশী যোগান। রবার, তৈল, চিনি, নাইট্রেট্‌, নাতি-শীতোষ্ণ দেশের নানারকম খাদ্যশস্য, এবং খনিজদ্রব্য পুঁজিপতিদের একান্ত প্রয়োজন। যে কোন শিল্পোন্নত দেশ এখন অন্যদেশ হইতে কাঁচামাল না আনাইয়া নিজের দখলের উপনিবেশেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারে। এখন আর তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ইটালির ইথিওপিয়া আক্রমণের কথা এখনও কেহ ভুলে নাই। কফি এবং তুলা ইটালির আমদানি করিতে হইত আমেরিকা হইতে; উহার মোট আমদানির প্রায় চৌদ্দভাগই ছিল এই দুইটি কাঁচামাল। ইথিওপিয়া জয় করিয়া ইটালি পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচাইবে—ইহাই ছিল সে-দেশের পুঁজিপতি ও শাসকবর্গের ধারণা।

বাড়্‌তি মালের বাজারের জন্য উপনিবেশ দখলের সময় হইতেই পুঁজিতন্ত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। উপনিবেশের কাঁচামাল হস্তগত করা সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অপর একটি উদ্দেশ্য। শিল্পোন্নত দেশে মালই যে শুধু বাড়্‌তি হয় তাহা নয়, পুঁজিও এতবেশী জমে যে উহার সবটুকু স্বদেশের শিল্পে খাটানো সম্ভব হয় না। ট্রাস্ট প্রভৃতি একচেটিয়া শিল্প শিল্পপতিদের হাতে এত মুনাফা আনিয়া দিয়াছে যে এই পুঁজি লইয়া তাহারা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য আমাদের নিকট উহা আশ্চর্য ঠেকে। রাস্তাঘাট, শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, হাসপাতাল—বাড়্‌তি পুঁজি খাটাইয়া কত কিই না তৈয়ার করা যায়। কিন্তু পুঁজিপতিরা কখনও জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবে না। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য পুঁজি খাটাইয়া কিভাবে বেশী মুনাফা অর্জন করা যায়। দেশের এবং জনসাধারণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যদি ইহারা পুঁজি খাটাইত তবে আর পুঁজিতন্ত্র পুঁজিতন্ত্র থাকিত না। লেনিন বলেন, "ইহা না বলিলেও চলে, পুঁজিতন্ত্র যদি কৃষির উন্নতি করিতে পারিত—যে কৃষি শিল্পের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে;—যদি উহা জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করিতে পারিত......তবে আর বাড়্‌তি পুঁজির কথা উঠিত না...... কিন্তু তখন আর পুঁজিতন্ত্র পুঁজিতন্ত্র থাকিত না। যতদিন পুঁজিতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রই থাকিয়া যাইবে, ততদিন বাড়্‌তি পুঁজি জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্য খরচ করা হইবে না; কেননা উহাতে পুঁজিপতির মুনাফা কমিয়া যায়। পুঁজিপতি অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য এই বাড়্‌তি পুঁজি বিদেশে—অনুন্নতদেশে রপ্তানি করিবে। এই সব অনুন্নত দেশে

মুনাফা উপার্জন করা যায় বেশী,—কেননা সেখানে পুঁজির অভাব; ভূমির মূল্য সস্তা, কাঁচামাল সহজলভ্য।"

এইভাবে, উপনিবেশগুলিতে রেলওয়ে, বিদ্যুত, চা-বাগান প্রভৃতি গাড়িয়া তোলা হয়। কোন কোন দেশ উন্নত দেশগুলির নিকট টাকা ধার চায়। কিন্তু এই শর্তে ধার দেওয়া হয় যে উত্তমর্ণের দেশেই সেই টাকা দিয়া যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইবে। অতএব, পুঁজির মালিক, কারখানার মালিক দুয়েরই হয় প্রচুর লাভ।

উপনিবেশের কথাই আমরা বলিলাম। কিন্তু কোন একটা দেশকে শোষণ করিতে হইলে উহাকে উপনিবেশে পরিণত না করিয়াও পারা যায়। চীনে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শক্তিগুলির ছিল স্ব স্ব 'প্রভাবাধীন এলাকা'। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশগুলিতে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ইহারা সর্বদাই তাহাদের টাকা ধার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাজনক শর্ত আদায় করিয়া লইত।

আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে পুঁজির মালিক এবং কারখানার মালিক মিলিয়া নিজেদের দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাদের হাতেই গোটা দেশের জাতীয় ধন। বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন মারাত্মক অবস্থা দেখা দেয়। উহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়: অবশেষে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য উহারা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলে। সারা দুনিয়াকে তাহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়; মনে হয় প্রতিযোগিতার অবসান হইয়াছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই বুঝাপড়া ভাঙিয়া যায়। কোন একটি প্রতিষ্ঠান শক্তি সঞ্চয় করিয়াই আরও বেশী সুবিধা দাবি করিতে থাকে। অনেক সময় এই কারণে সশস্ত্র যুদ্ধ হইতে দেখা যায়।

উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্যও যুদ্ধ অপরিহার্য হয়। আশী বছর আগেও পৃথিবীর অনুন্নত অংশের সবটা দখল হয় নাই। এখন যদি নূতনভাবে পুনর্বণ্টন করিতে হয়, তবে যাহাদের দখলে আগে হইতেই বেশী যায়গা আছে, তাহাদের নিকট হইতে কিছু অংশ ছিনাইয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। জার্মানি, ইটালি এবং জাপান সর্বকনিষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশ; তাহাদের উপনিবেশের প্রয়োজন। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া উপনিবেশ দখল কঠিন। তাই একবিংশ শতকেই পুরাতন ও নূতন পুঁজিবাদীদেশগুলির দুই দুইবার সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু যুদ্ধে কোন সুরাহা হয় না। যতদিন

সাম্রাজ্যতন্ত্রের আধিপত্য, ততদিন যুদ্ধের ভীতি দূর হয় না। একবার ভাগ করিয়া লওয়ার পরেও পুনরায় বণ্টনের প্রয়োজন হয়।

(২)

"এই সব সংকটে কয়েকবৎসর পর পর যথেষ্ট উৎপাদিত দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপকরণ নষ্ট হয়। ব্যাপক সংক্রমণ দেখা দেয়—আগেকার যুগ-গুলিতে তাহা অসম্ভব ছিল; এই সংক্রমণ 'অতি-উৎপাদনে'র। সমাজ ক্ষণিকের জন্য বর্বরযুগে ফিরিয়া যায় : মনে হয় যেন একটা দুর্ভিক্ষ, কিংবা বিধ্বংসী যুদ্ধ জীবনধারণের উপকরণ ছাঁটিয়া দিয়াছে, শিল্প এবং বাণিজ্যকে অচল করিয়া ফেলিয়াছে। কেন? কারণ,—সভ্যতার দ্রুত উন্নতি, জীবনধারণের উপকরণাদির প্রাচুর্য, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার।"

উপরের কথাগুলি আধুনিক নয়, মার্কস-এঙ্গেলস্ ১৮৪৮-এ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে ইহা বলেন। মার্কস-এঙ্গেলস্ কোনরূপ দুঃসাহসিক ভবিষ্যম্বাণী করেন নাই; সে সময়ে কয়েক বছর পর পর পুঁজিতন্ত্রকে সংকটে পড়িতে হইত—তাঁহারা উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। আজও যে পুঁজিতন্ত্র এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই—তাহা গত মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগেকার অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি।

ইতিহাসের সকলযুগেই সংকট দেখা গিয়াছে। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুদয়ের আগেকার সংকটগুলি এখনকার সংকটের মত নয়। শস্যহানি, যুদ্ধ প্রভৃতি ছিল সে সব সংকটের কারণ : খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্যের অভাব হইত, তাই দাম বাড়িয়া যাইত। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের সংকট বাইরের কারণে হয় না। পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সংকটের বীজ নিহিত থাকে : এই সব সংকটের বৈশিষ্ট্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য; সংকটের সময়ে দাম বাড়ে না, বরং কমিয়া যায়। গত সংকটের সময় আমরা দেখিয়াছি—সংকটে শিল্প অচল হইয়া যায়; পুঁজি খাটানোর সুযোগ হয় না; শ্রমিক বেকার হয়, মুনাফা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এক কথায়, প্রাচুর্যের মধ্যে দেখা দেয় দারিদ্র।

কাঁচামালের কি অভাব হয়? তুলা যাহারা চাষ করে, তাহারা উহা বিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত। যন্ত্রাদির কি অভাব হয়? তাহাও নয়। কারখানার মালিকেরা তাহাদের টাকু ও তাঁত চালু রাখিতেই চায়। শ্রমেরও অভাব নাই, শ্রমিক বসিয়া থাকিতে চায় না। অতএব, উৎপাদনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সবই রহিয়াছে—কিন্তু তবুও কারখানা বন্ধ।

ইহার কারণ কি? অর্থনীতির পণ্ডিতেরা কারণ নির্ণয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু একটা বিষয়ে তাহাদের মতভেদ নাই।

বিষয়টি এই, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয়। মাটির নিচ হইতে খনিজ দ্রব্য উঠানো হয়, শস্য কাটা হয়, শ্রমিককে খাটানো হয়, বাজারে জিনিসপত্র কেনা-বেচা হয়—একমাত্র যখন পুঁজির মালিক বুঝিতে পারে যে মুনাফার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পুঁজিপতি জনসাধারণের কথা ভাবিয়া, দেশের কল্যাণের দিকে চাহিয়া উৎপাদন করায় না; মুনাফার লোভেই কারখানা চালু রাখে। মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলে কারখানা বন্ধ করিয়া দেয়। ১৮৬৫ সালে এঙ্গেলস্ লেখেন : "উৎপাদন করা হয় খুব কম...... কেন? কারণ এই নয় যে, উৎপাদনক্ষমতা নিঃশেষিত হইয়াছে; কতখানি উৎপাদন করা হইবে তাহা ক্ষুধার্ত মুখগুলির দিকে চাহিয়া ঠিক করা হয় না, ক্রেতার কেনার ক্ষমতা আছে কি না তাহা দেখিয়া ঠিক করা হয়।"

উৎপাদনের লক্ষ্য সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা একমত হইলেও, সংকট কি কারণে হয় সে সম্পর্কে একমত নন।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন, অর্থনৈতিক সংকটের কারণ খুঁজিতে হয় বাহিরে। গত একশ' বছর যাবত আমরা কিছুদিন পর পর পুঁজিতন্ত্রকে সংকটে পড়িতে দেখিতেছি, তথাপি এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিতেছেন না যে সংকটের কারণ পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। ইহাদের মতে, অর্থনৈতিক সংকট যে সকল সময় একই কারণে হয় তাহা নয়। যন্ত্রের বৈপ্লবিক উন্নতি, শুল্কব্যবস্থায় অদল-বদল, মুদ্রার মূল্যহারের পরিবর্তন, শস্যহানি—এসব নানাকারণেই সংকট দেখা দিতে পারে।

অপর একদলের মতে অর্থনৈতিক সংকটের বিশেষ কারণ নৈসর্গিক। স্টান্‌লী জেভন্স—১৮৭৫ সালে ঘোষণা করেন,—সূর্যের গায়ে কাল দাগ, ভারতে দুর্ভিক্ষ এবং ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক সংকট প্রায় সমসাময়িক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে ভারতে শস্যহানি হয়, সুতরাং ভারতীয় কৃষকের ইংলণ্ডের দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা থাকে না; ফলে ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। অতএব, দোষ সূর্যের।

অনেকে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ বলেন মানসিক। পুঁজিপতি মালিকদের আশা-নিরাশা হইতেই সংকটের সৃষ্টি হয়। যখন তাহারা প্রত্যাশা করেন যে মুনাফা বেশী হইবে তখনই বেশী পরিমাণে টাকা খাটাইতে থাকেন; উৎপাদনও বাড়িতে থাকে। তাহাদের কারখানায় জাত মাল কিছুদিন বেশ কাট্‌তি হয়; মালিকেরা উচ্চহারে মুনাফাও পাইতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরই অবস্থার পরিবর্তন হয়। মাল আর তেমন কাটে না; মালিকের অধিক লাভের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। তাহারা কাজকারবার গুটাইতে থাকেন; অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। আশা এবং নিরাশার মধ্যে ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞ পিগু সংকটের মনস্তাত্ত্বিক কারণ খুঁজিয়াছেন।

আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের কোন কোন প্রভাবশালী অর্থনীতিজ্ঞের মতে, অর্থই সকল অনর্থের মূল। আমাদের মুদ্রাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ; এই মুদ্রা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই বেকার সমস্যা, আশার ব্যর্থতা, সঞ্চয়ের হানি—সকলই দূর হইবে। মুদ্রার মূল্য যে সকল সময় একই রকম থাকেনা তাহা আমরা সকলেই বুঝি। এক পাউণ্ড মুদ্রায় কোন সময় বেশী রুটি কেনা যায়, কোন সময় কম রুটি কেনা যায়। এক ডজন সকল সময়ই বার; কিন্তু একদিন উহা পনর হইবে, একদিন দশ—যাহা অসহনীয়। যখন উৎপাদন বাড়ে, তখন বাজারে বেশী মুদ্রা বাহির করা প্রয়োজন; তা না হয়, জিনিসের দর কমিয়া যাইবে। অর্থনীতিজ্ঞদের মতে চড়া অথবা নিম্ন মূল্যহারের ফলেই অর্থনৈতিক সংকট হয়। অতএব প্রয়োজন মত বাজারে বেশী অথবা কম মুদ্রা বাহির করিলেই জিনিসের দাম ঠিক থাকে এবং উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় কোন গোলমাল উপস্থিত হয় না।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হবসনের মতে,—শিল্প ব্যবসায়ে যখন সুদিন, তখন ধনিকের হাতে খুব টাকা জমিতে থাকে। কিন্তু শ্রমিকের মজুরি সেই পরিমাণে বাড়ে না। ধনিকেরা তাহাদের বিরাট সঞ্চয় শিল্পে খাটায়—নূতন নূতন কল ও সরঞ্জাম আমদানি করিয়া কারখানায় প্রবর্তন করে। এখন দ্রব্য উৎপাদন হয় আগের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু লোকের এত দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা নাই; কেননা মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম। অতএব বহু জিনিস বিক্রয় হয় না। উৎপাদনে লাভ থাকে না। সুতরাং উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হয়. অনেক কারখানা বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, একদিকে দেখা দেয় বেকার সমস্যা; অন্যদিকে ধনিকের আয়ে ঘাট্‌তি। কিছুদিন পরই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে; আবার পূর্বের মত উৎপাদন চলিতে থাকে।

হবসন্ শ্রমিককে বেশী মজুরি দেওয়ার কথা বলিয়াছেন, সমাজের হিতকর কাজে ধনিকদের অর্থব্যয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে অর্থ ছড়াইলে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িবে; কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য অবিক্রীত থাকিবে না। ধনিকেরাও সমানভাবে মুনাফা পাইয়া যাইবে।

কিন্তু একদল অর্থনীতিজ্ঞ হবসনের এই উপদেশের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন যে মজুরি বৃদ্ধির ফলে মুনাফায় ঘাট্‌তি না হইয়া যায় না। সুতরাং মালিকশ্রেণী উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠে,—মজুরি বৃদ্ধি করিলে মুনাফায় ঘাট্‌তি হয়; আবার মুনাফা বাড়াইতে গেলে মজুরি কম হয়। এইখানেই পুঁজিতন্ত্রের উভয়-সংকট; উভয়দিক রক্ষা করা উহার পক্ষে কঠিন। অতএব সংকট এড়াইয়া চলা, কিংবা সংকটের হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

(৩)

মার্কসপন্থীরা বলেন, পুঁজিতন্ত্রে সংকট অপরিহার্য। বুর্জোয়া অর্থনীতিজ্ঞরা নানারকম কারণই দেখাইয়াছেন; সমাধানের পথও দেখাইয়াছেন। কিন্তু মার্কস বলেন, পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে পুঁজিতন্ত্রের মুক্তি নাই। পুঁজিতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ তাঁহার মতবাদেরই অংগ।

পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা। মার্কস প্রমাণ করিয়াছেন যে পুঁজিতন্ত্রে মুনাফার হার ক্রমেই নিচের দিকে যায়। হঠাৎ যে এরূপ হয় তাহা নয়; এইরূপ হইতেই হইবে।

মার্কস পুঁজিকে দুইঅংশে ভাগ করিয়াছেন—এক অংশের পরিবর্তন হয় না, অপর অংশের পরিবর্তন হয়। প্রথমটিকে বলা হয় অপরিবর্তমান পুঁজি, দ্বিতীয়টিকে পরিবর্তমান পুঁজি। মোট পুঁজির যে অংশ কল, কাঁচামাল, কারখানাবাড়ি প্রভৃতির জন্য খরচ করা হয় তাহাই অপরিবর্তমান পুঁজি; যে অংশ শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য অর্থাৎ মজুরি হিসাবে খরচ করা হয় তাহা পরিবর্তমান পুঁজি। 'অপরিবর্তমান' বলার অর্থ এই যে উৎপাদনক্রমের মধ্যে পুঁজির এই অংশটির মূল্য ঠিকই থাকে। উহার কোন পরিবর্তন হয় না। যে নূতন দ্রব্য উৎপাদন হয়, অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য তাহাতে ঢুকে; মূল্যের কোনও তারতম্য হয় না। পুঁজির দ্বিতীয় অংশটিকে 'পরিবর্তমান' বলা হয় এই কারণে যে উৎপাদনক্রমের মধ্যে উহার পরিবর্তন হয়; উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে মজুরির চেয়ে বেশী মূল্য ঢুকে। অপরিবর্তমান পুঁজি হইতে কোন নূতন মূল্য সৃষ্টি হয় না; কিন্তু পরিবর্তমান পুঁজি নূতন মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ শ্রমিক যে মজুরি পায় তাহার চেয়ে অধিক মূল্য সে উৎপাদন করে। পরিবর্তমান পুঁজি হইতেই 'বাড়্‌তিমূল্য' বা 'সারপ্লাস্‌ভ্যালু' দেখা দেয়। পরিবর্তমান পুঁজি খাটাইয়াই মালিক মুনাফা পায়।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সংগে সংগে মোট পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ বাড়ে। আমাদের চোখের উপরই আমরা দেখিতেছি, কারখানায় যন্ত্রাদি সর্বদাই বাড়ানো হয়, উন্নততর যন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। যন্ত্রের খরচ অত্যন্ত বেশী; উন্নততর যন্ত্র শ্রমিকের স্থান দখল করে, শ্রমিককে কাজ হইতে সরাইয়া দেয়। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্র যতই বাড়ে, মালিক তুলনায় মজুরি হিসাবে অর্থাৎ পরিবর্তমান পুঁজিরূপে কম খরচ করে। ধরা যাউক যেন মোট পুঁজি ৫০০;—অপরিবর্তমান পুঁজি ৩০০, পরিবর্তমান পুঁজি ২০০। মোট পুঁজি তিনগুণ বাড়ে, অর্থাৎ এখন মোট পুঁজি ১৫০০। অপরিবর্তমান পুঁজি বাড়ে চারগুণ অর্থাৎ ৩০০র যায়গায় উহা এখন ১২০০; সুতরাং পরিবর্তমান পুঁজি পূর্বের ২০০ হইতে ৩০০ হইয়াছে। উহা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু উহার

তুলনায় অপরিবর্তমান পুঁজি বাড়িয়াছে অনেক বেশী। এখন সহজেই বুঝা যায় যে পুঁজিতন্ত্র যতই বাড়িতে থাকে পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়, কিন্তু পরিবর্তমান পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম বাড়ে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, মোট পুঁজি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তমান পুঁজি বাড়ে, কিন্তু পরিবর্তমান পুঁজি অপেক্ষাকৃত কমে। উপরের উদাহরণ-গুলিতে প্রথমটায় পরিবর্তমান পুঁজি ছিল মোট পুঁজির দুই-পঞ্চমাংশ, কিন্তু পরে তাহা হইয়াছে এক-পঞ্চমাংশ দ্বিতীয় উদাহরণটিতে, পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ বাড়িলেও, উহা অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ; কেননা পরিবর্তমান পুঁজিই 'বাড়্তিমূল্য' বা পুঁজিপতির মুনাফা সৃষ্টি করে। অতএব, পরিবর্তমান পুঁজি যত কমে, মুনাফার হারও ততই কমিতে থাকে।

মুনাফার হার কমিয়া যাওয়া পুঁজিপতির পক্ষে মারাত্মক। উপরের উদাহরণগুলির প্রথমটিতে পরিবর্তমান পুঁজি বা মজুরি ২০০; শ্রমিকের দশঘণ্টা খাটুনিতে মোট মূল্য উৎপাদিত হয় ৪০০; অতএব বাড়্তি মূল্য বা মালিকের মুনাফা বাকী ২০০। মুনাফার হার $\frac{\text{২০০=মুনাফা}}{\text{৫০০=মোট পুঁজি}}$ = দুই-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ৪০; দ্বিতীয় উদাহরণটিতে, পরিবর্তমান পুঁজি ৩০০; দশঘণ্টায় শ্রমিক মূল্য উৎপাদন করে ৬০০। অতএব মজুরির মূল্য ৩০০ বাদ দিলে বাড়্তিমূল্য বা মুনাফা থাকে ৩০০। মুনাফার হার $\frac{\text{৩০০=মুনাফা}}{\text{১৫০০=মোট পুঁজি}}$ = এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০।

উপরের উদাহরণ হইতে পরিষ্কারই দেখা গেল যে মোট পুঁজি এবং অপরিবর্তমান অংশ বাড়িয়া যাওয়ায় এবং পরিবর্তমান পুঁজি অপেক্ষাকৃত কমায় মুনাফার হার কমিয়াছে। মালিক এখন তাহার ক্ষতি পুরাইয়া লইতে চায়। সাময়িকভাবে তাহা সম্ভবও হয়। পুঁজি যতই বৃদ্ধি পায়, মুনাফার হার কমে বটে; কিন্তু মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মুনাফার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে মালিককে সঞ্চয় করিতে হয় বেশী এবং ক্রমাগত সঞ্চয় বাড়াইয়া মোট পুঁজি বেশী পরিমাণে খাটাইতে হয়। সঞ্চয় যদি কোন সময় কমিয়া যায়, মুনাফার পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গেই হ্রাস পাইবে।

উপরের দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আমরা দেখাইয়াছি মজুরি ৩০০ এবং বাড়্তিমূল্য বা মুনাফা ৩০০; মুনাফার হার শতকরা ২০। ধরা যাউক, মোট পুঁজি ১৫০০'র যায়গায় হইয়াছে ২০০০; পরিবর্তমান পুঁজি ৩০০'র যায়গায় বাড়িয়া হইয়াছে ৫০০; যদি শ্রমিককে পূর্বের মতই শোষণ করা হয়,—অর্থাৎ যতঘণ্টা খাটিয়া শ্রমিক মজুরি উঠায় ততঘণ্টাই খাটিয়া 'বাড়্তিমূল্য' বা

মুনাফা সৃষ্টি করে,—তবে মুনাফার পরিমাণ হয় ৫০০-ই। মালিক শ্রমিককে যদি ৫০০ না দিয়া ৪০০ দেয় অর্থাৎ মজুরি কমাইতে সমর্থ হয়, তবে তাহার মুনাফার ঘর বাড়িয়া হয় ৬০০; মুনাফার হার হয় $\frac{৬০০}{২০০০}$ = শতকরা ৩০। এইভাবে মালিক মুনাফার হার বাড়াইতে পারে।

মালিক মুনাফার পরিমাণ এবং মুনাফার হার বাড়াইয়া সাময়িকভাবে তাহার সমস্যার সমাধান করিতে পারে। কিন্তু সংকটের হাত এড়ানোর উপায় তাহার নাই। পুঁজি বেশী খাটানোর দরুন, দ্রব্যও উৎপাদন হয় অনেক বেশী। কিন্তু মজুরি হ্রাস পাওয়া শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যায়। কম মজুরি অর্থ,—শ্রমিক কারখানায় যাহা উৎপাদন করে বাজারে তাহা কিনিতে পারে না। মার্কসের বিশ্লেষণ অনুসারে মালিকেরা মজুরি কমাইয়া মুনাফা ঠিক রাখিতে চায়; কিন্তু তাহাতে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হয়, অথচ উহার উপরই মুনাফা আদায় নির্ভর করে। কম মজুরিতে উচ্চ মুনাফা সম্ভব হয়, কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় তাহা আবার অসম্ভবও হয়। অতএব বিরোধ ঠিকই থাকিয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের চরম অবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের যুগেই পুঁজিতন্ত্র সমাজের বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। পুঁজিতন্ত্রের সকল রকম বিরোধ এই যুগটিতে সুতীব্র হইয়া উঠে। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়, উন্নততর যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হয়—কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে উহাদের পুরা প্রয়োগ হইতে পারে না। যতক্ষণ উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে মুনাফা ততক্ষণ পুরা উৎপাদন সম্ভব নয়।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরে ১৯২৭-২৮এ পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে সকল রকমের উৎপাদনই বাড়িয়া যায়। কিন্তু পর বছরই দেখা দেয় সর্বগ্রাসী সংকট। যুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের যুগটিতে পুঁজিপতিরা উন্নত যন্ত্রের প্রবর্তন করিয়া উৎপাদন করাইয়াছে। ফলে অগণিত শ্রমিক বেকার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হিসাবে দেখা যায়, ১৯১৯ হইতে ১৯২৫-এর মধ্যে কৃষি, শিল্প এবং রেলে শ্রমিকের সংখ্যা কমে শতকরা ৭; উৎপাদন বাড়ে শতকরা ২০; শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি বাড়ে শতকরা ২৯। বিপুল আকারে উৎপাদন হইলেও এত দ্রব্যের বিক্রয় সম্ভব হয় নাই। সুতরাং সংকট অনিবার্য হইয়া উঠে; শ্রেণীসংঘাতও তীব্র হয়।

সোভিয়েট ও সমাজতন্ত্র

মানুষের সমাজের প্রথম দিকটায় ছিল সাম্যতন্ত্র। ধীরে ধীরে কিরূপে সমাজে অসমতা দেখা দেয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রেণী গড়িয়া উঠে তাহা গোড়াতেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। উৎপাদনের যন্ত্রাদির পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবৈষম্য বাড়িয়া যায়; মানুষ আদিম সভ্যতার স্তর পার হইয়া ইতিহাসের স্তরে ঢুকে। ইতিহাসের ধারায় পুঁজিতন্ত্রী সমাজই সর্বশেষ শ্রেণী-সমাজ। পুঁজিতন্ত্র উহার বিকাশের পথে দুরতিক্রম্য বিরোধের সম্মুখীন হয়। উৎপাদনশক্তির অসামান্য বিকাশ হইলেও পুঁজিতন্ত্র উহাকে কাজে লাগাইতে পারে না। উৎপাদনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হইলে বিরোধের যেমন সমাধান হয় না, তেমনি নূতন উৎপাদনশক্তিকেও কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

নূতন সমাজের জন্ম দেয় সর্বহারাদের বিপ্লব। উৎপাদনের উপকরণগুলি সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর পরিকল্পনানুযায়ী উৎপাদন সুরু হয়। এঙ্গেলসের ভাষায়, "মানুষ অবশেষে তাহার নিজের সমাজ সংগঠনের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, একই সময়ে সে হয় প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ন্তা, তাহার নিজেরও কর্তা—স্বাধীন।"

বিশ শতক সুরু হওয়ার সতর বছর আগে কার্ল মার্কসের মৃত্যু হয়, সতর বছর পরে রুশ-বিপ্লব। ১৯১৭ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা হাত করিয়া লেনিন ও তাঁহার বলশেভিক পার্টি কার্ল মার্কসের মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। রুশ-বিপ্লবের পূর্বে কমিউনিস্টরা শুধু বলিতে পারিতেন, তাহাদের মতবাদ ও আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারিলে নূতন জগতের সৃষ্টি হইবে; ১৯১৭র বিপ্লবের পর তাহারা অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারেন,—"পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ভূমিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

বলশেভিকরা কিরূপে ক্ষমতা দখল করে? কিরূপে বিপ্লব সফল হয়? যে কোন যায়গায়, যে কোন সময়, যে কোন লোক বিপ্লব সফল করিতে পারে না; সাফল্যের সহিত বিপ্লব সমাধা করা সহজ কাজ নয়। বিপ্লব নির্ভর করে কতকগুলি ঐতিহাসিক অবস্থার উপর। এই অবস্থাগুলি যখন সুপরিণত রূপ লয়, তখনই হয় শত্রুকে আঘাত করার সময়। সে

সময়ে যদি বৈপ্লবিক দল পশ্চাৎপদ হয়, তবে প্রমাণ হয় যে বিপ্লব ও মার্কস-বাদে তাহাদের আস্থা নাই।

১৯১৭'র বিপ্লবের মাত্র এক মাস আগে লেনিন লিখেন : বিপ্লবের জন্য আগাইয়া আসা চাই জনসাধারণের মধ্যে; যাহারা সকলের চেয়ে অগ্রসর সেই শ্রেণীই আগাইয়া আসিবে; গোপন ষড়যন্ত্র কিংবা ক্ষুদ্র পার্টি বিপ্লবের ভিত্তি নয়। বিপ্লবের অবস্থা যখন সৃষ্টি হয় তখন দেখা যায়,—শত্রুর শিবিরে অনৈক্য দেখা দিয়াছে, এদিকে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক আয়োজনের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। ঠিক কোনটি যে বিপ্লবের মুহূর্ত তাহা সম্যক বুঝিয়া লেনিন শত্রুকে আঘাত করেন; এখানেই প্রমাণ হইয়াছে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু কখন যে আঘাত করিতে হইবে, সে সম্পর্কে তাহার অনুগামীরাও অনেকে তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলিলেন, অবস্থা এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে ক্ষমতা দখল করিয়াও হাতে রাখা সম্ভব হইবে না।

লেনিন উত্তরে বলেন : "জটিল অবস্থার মধ্যেই বিপ্লব হয়। বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সময় যদি অবস্থা জটিল না-ও থাকে, একবার বিপ্লব সুরু হইয়া গেলে অবস্থার পরিবর্তন না হইয়া যায় না। বিপ্লব নিজেই উহার বিকাশের পথে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিবে। কেননা,—মার্কসের কথায়,—'জনসাধারণের বিপ্লব' অর্থ পুরাতন সমাজব্যবস্থার ধ্বংসের উপর নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা; এতবড় কাজ কখনো সহজ, সরল নয়। জটিল অবস্থা এড়াইয়া বিপ্লব হয় না; বাঘের ভয় করিলে অবশ্য জঙ্গলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।" বিপ্লবী লেনিন এইভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করেন; তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই; রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত করার জন্য অগ্রসর হন এবং বিপ্লব সার্থক করেন।

১৯১৭'র নভেম্বরে পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েটের কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন, "এখন আমরা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়িতে আরম্ভ করিব।" পনর বছর পর—১৯৩২ সালে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের কাঠামো সুসম্পূর্ণ হয়। অর্থ, শিল্প, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান, কৃষি ও বাণিজ্য—জাতির জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগই সমষ্টিগত শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা সমষ্টির হিতের জন্য সুসংগঠিত করা হয়। সোভিয়েট রুশিয়ায় ভূমি, কারখানা, খনি, কল, ব্যাঙ্ক, রেল—কোন কিছুই ব্যক্তির সম্পত্তি রহিল না; ব্যক্তিগত বিত্তের বিলোপ করিয়া উৎপাদনের সকল উপকরণকেই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। উৎপাদনের এবং বণ্টনের সমস্ত উপায়গুলিই গভর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই সকল ব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য পরিষ্কার হয়। সোভিয়েট ব্যবস্থায় কেহ অপর কাহাকেও শোষণ করিতে পারিবে না, কেহই অপরের শ্রম হইতে লাভ আদায় করিতে পারিবে না; শ্রমিককে শোষণ করিয়া এখন আর সঞ্চয়ের ঘর ফাঁপাইয়া তোলা সম্ভব নয়; কারখানা-ওয়ালা আজ বিজ্ঞাপন দেয়,—যে কাজ চায় তাহাকে কাজ দেওয়া হইবে,—কালই আবার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করে—এরূপ আর সম্ভব নয়। পুঁজিতন্ত্রে যেমন হইয়া থাকে সমাজতন্ত্রে তাহা হইতে পারে না; কেননা উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ সবই সমাজের সম্পত্তি, ব্যক্তির নয়।

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েটের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এনড্রেল এনড্রিয়েক্ ঘোষণা করেন, সারা দেশের উৎপাদনের উপায়গুলি প্রায় সবটাই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে, শ্রেণী-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। সোভিয়েটের সকল প্রকার দ্রব্যাদির শতকরা ৯৮.৫ অংশ এ বছর রাষ্ট্র উৎপাদন করিবে; বাকী ১.৫ অংশ ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা নিজেরা উৎপাদন করিবে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শিল্পোৎপাদন এবং কৃষিকার্য পরিচালনার দরুন শোষকশ্রেণী নির্মূল হইয়াছে—এখন সোভিয়েটে একটিমাত্র শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট যখন উৎপাদনের উপায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তাহাকে ঠিক করিতে হয়,—কি উৎপাদন করিতে হইবে, কতটুকু উৎপাদন করিতে হইবে, উৎপাদিত দ্রব্য কে পাইবে?

সারা দেশের জন্য এ সকল সিদ্ধান্ত লইতে হয়। পুঁজিতন্ত্রী দেশে প্রত্যেক পুঁজিপতিই তাহার টাকা খাটানোর আগে স্থির করে—কিরূপ উৎপাদনে সে টাকা খাটাইবে। তারপর ঠিক করে,—শ্রমিককে কত দিবে;—উৎপাদনের পরিমাণ কি হইবে। সকল মালিকই এইরূপ সিদ্ধান্ত লয় এবং এই সিদ্ধান্তগুলির ফলই পুঁজিতন্ত্রী সমাজের মোট উৎপাদন। কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে সুসমঞ্জস হইবে। আমরা সকলেই আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে সামঞ্জস্য বিধান হয় না বলিয়াই কয়েক বছর পর পর পুঁজিতন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে।

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত লইতে হয় গভর্নমেণ্টের। বিভিন্ন অংশ-গুলির মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য হয়, সকলরকম অর্থনৈতিক কার্য যাহাতে সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত হয় তাহা দেখে গভর্নমেণ্ট। সুশৃংখলার সহিত কাজ চালাইতে হইলে আবশ্যক পরিকল্পনার।

সারা দেশের উৎপাদন এবং বণ্টনের কাজের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের এইরূপ পূর্ব হইতে স্থির করা পরিকল্পনা রহিয়াছে; শ্রেণীবিশেষের মুনাফা

বৃদ্ধি করা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়, সকলের বৈষয়িক সুখ ও মানসিক উন্নতি সাধন করাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত বিত্তের বিলোপ হইলে উৎপাদনের সকল বিভাগই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়; কোন্ বিভাগ কি উৎপাদন করিবে, কতটুকু উৎপাদন করিবে তাহা ঠিক করিয়া দিতে হয়। তাই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে সারাদেশের জন্য একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।

আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা শুনিয়াছি। প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর তৃতীয় পরিকল্পনা—এইভাবে তাহা চলিতেই থাকিবে। বিখ্যাত ওয়েব দম্পতি লিখিয়াছেন, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা থাকিতেই হইবে। সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি পরিকল্পিত অর্থনীতি, পরিকল্পনাই সমাজতন্ত্রের প্রাণ।

প্রত্যেক পরিকল্পনারই দুইটি দিক থাকে; প্রথমত, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত, কিভাবে এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা যায়। সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনার বেলায়ও তাহা সত্য। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কখনও এক নয়। পুঁজিতন্ত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য মালিকের মুনাফা; কিন্তু সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই; মালিক নাই; অতএব মুনাফার কথা উঠে না। সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনার একমাত্র লক্ষ্য সমষ্টির সর্বোচ্চ কল্যাণ।

যে লক্ষ্যের কথা বলা হইল, তাহাকে কার্যকরী করার পথ কি? কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু দেখিতে হইবে তাহা কতটুকু কার্যকরী হয়। সারা দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং পুরা তথ্য এজন্য জানা দরকার।

ইহা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কমিশন বা 'গসপ্লেনের' কাজ।

গস্প্লেন প্রথমেই অনুসন্ধান করে;—দেশে কত শ্রমিক আছে? কি পরিমাণ উৎপাদনশক্তি আছে? প্রাকৃতিক সম্পদ কতটুকু? কি পরিমাণ কাজ হইয়াছে? আরও কতটুকু হইতে পারে? কি কি প্রয়োজন? রাশি রাশি তথ্য ও সংখ্যা এজন্য সংগ্রহ হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি কারখানা, কৃষি প্রতিষ্ঠান, খনি, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, গবেষণাগার, শ্রমিক-সংঘ, সমবায় সমিতি, নাট্য পরিষদ—সকল কিছু হইতেই তথ্য লওয়া হইতেছে। আগের বছর কি কাজ হইয়াছিল? এবছর কি হইতেছে? পর বছর কি হইবে? কি সাহায্য দরকার?—এইরূপ হাজার প্রশ্নের জবাব লওয়া হইতেছে। এসব তথ্যাদি জড়ো হয় গস্প্লেনের দপ্তরে, বিশেজ্ঞরা সেগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া লন। এইভাবে তাঁহারা পান সারা দেশের চিত্র। কিন্তু ইহা মাত্র আংশিক কাজ। গভর্নমেণ্টের নিকট এসব তথ্য উপস্থিত করা হয়; তখন স্থির হয় কর্মসূচী। গস্প্লেন এবং গভর্নমেণ্টের মধ্যে আলোচনা ও পরামর্শের

ফলেই পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া তৈয়ার হয়। ইহা মাত্র খসড়াই; পূর্ণাবয়ব পরিকল্পনা তৈয়ার হইতে আরও দেরী। সমাজতন্ত্রে নেতারা মাথা খাটাইয়া যাহা ঠিক করিবেন তাহাই সুসম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত এরূপ মনে করা ভুল; পরিকল্পনার খসড়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। ইহাই পরের ধাপ।

যেসব তথ্য সাজাইয়া গুছাইয়া লওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব বিভাগের তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া নিচের প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠায়। এইভাবে একে একে সেগুলি আসে একক ফ্যাক্টরী এবং কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির নিকট। গস্‌প্লেন বা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন হইতে সংখ্যা ও তথ্যগুলি পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধাপের পর ধাপ যখন নামিয়া আসে ফ্যাক্টরী ও কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির নিকট, তখনই জনসাধারণ—শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ পায়। তাহারা এগুলির সমালোচনা করে এবং নিজেদের মন্তব্য ও প্রস্তাব দেয়।

তথ্যগুলি যে পথ ধরিয়া জনসাধারণের নিকট আসিয়াছিল, সেই পথেই সংশোধিত আকারে পুনরায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের নিকট ফিরিয়া যায়।

শ্রমিক এবং কৃষক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দোষগুণ সম্পর্কে মতামত দিতে পারে, ইহা বাস্তবিকই তাহাদের নিকট গর্বের বিষয়। অনেক সময় এমনও হয়; স্থানীয় ব্যাপারের তথ্য ও সংখ্যা সম্পর্কে শ্রমিক-কৃষক ভিন্ন মত পোষণ করে; নূতন প্রস্তাব দেয়। তাহারা আরও বেশী কাজ দিতে সক্ষম, এইভাবের সংখ্যা তাহারা নূতন ভাবে দিয়া থাকে। খসড়া পরিকল্পনার বিচার ও পরীক্ষায় কোটি কোটি লোকের যোগদান সত্যকার গণতান্ত্রিক রীতিরই পরিচায়ক। উপর হইতে কোন কিছু চাপানো সমাজতন্ত্রের রীতি নয়। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের অধিবাসী আজ গর্বের সহিত বলে, "এটা আমাদের হাসপাতাল", "এটা আমাদের ফ্যাক্টরী", "এটা আমাদের স্বাস্থ্যবাস।"

খসড়া পরিকল্পনাটি সংশোধিত আকারে ফিরিয়া আসিলে গস্‌প্ল্যান এবং গভর্নমেণ্ট উহা পরীক্ষা করে এবং উহাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। দেশের সর্বত্র এখন সুসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটি পাঠানো হয়; শ্রমিক কৃষক উহাকে কার্যে রূপ দেওয়ার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। সমষ্টির হিতের জন্য সমষ্টিগত কাজ বাস্তব রূপ লয়।

সমষ্টির হিত বলিতে কি বুঝায়? সকলের আগে আগে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কথা। আমাদেরই মত রুশিয়া ছিল অনুন্নত দেশ; সুতরাং শিক্ষা-বিস্তার প্ল্যানের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। স্বাস্থ্যসম্পর্কেও ছিল আগেকার গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্য; তাই হাসপাতাল, শিশু-আবাস প্রভৃতির উপর পরিকল্পনা যথেষ্ট জোর দেয়। শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যাবাস, ক্লাব কোন কিছুই পরিকল্পনায় বাদ যায় না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এসকল প্রাথমিক এবং আবশ্যিক প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা যে পরিকল্পনায় থাকিবে তাহা না বলিলেও চলে।

এখনই যে-সব দ্রব্য ব্যবহার করা যায়, সেগুলি বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা, না কলকব্জা বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা—পরিকল্পনায় কোন্‌টির উপর জোর দেওয়া ঠিক। সোভিয়েটের নেতাদের নিকট ইহা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। জুতার জন্য বেশী শ্রম ব্যয় না করিয়া জুতা তৈয়ারীর কলের জন্য বেশী শ্রম ব্যয় করাই ঠিক হইবে কি? উহাতে অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার হইতে এখনকার মত নিজেদের বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইবে। তবুও এই ত্যাগ বরণ করিতে তাহারা অস্বীকার করে নাই। শিল্পের দিক হইতে দেশকে উন্নত করাই প্রথম প্রয়োজন; সেজন্য কলকব্জা, ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হয়; পরিকল্পনায় ভারী লৌহশিল্পই প্রধান স্থান পায়। শিল্পের দিক হইতে যত শীঘ্র সম্ভব আগাইয়া না গেলে, বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

১৯১৮-২০ সালে অন্তত ছয়টি শক্তি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেই সোভিয়েটের অধিবাসীরা ভাবে, আবারও এইরূপ আক্রমণ হইতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা সফল হইলে নিশ্চয়ই পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির বিপদ। তাই উহারা সোভিয়েটের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার মতলবে উহাকে যে কোন সময় আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং যতশীঘ্র শিল্পের দিক হইতে স্বাবলম্বী হওয়া যায়—সোভিয়েটের নেতারা সেরূপ ব্যবস্থাই করেন। কেননা এরূপ ব্যবস্থায় দ্রুত প্রতিরোধক্ষমতা লাভ করা যাইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের উপর জোর পড়ায়, সাময়িকভাবে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির যথেষ্ট অভাব হয়। ১৯৩৬'র দিকে দুইরকমের উৎপাদনের মধ্যে অনেকটা সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়ানো হয় শতকরা ২৩; আর যন্ত্রাদির উৎপাদন বাড়ানো হয় শতকরা ২২। রেল, ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, মেশিন প্রভৃতি ভারী শিল্পের সাফল্যের

দরুনই গত মহাযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণকারী ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে কাবু করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। সারা জাতির জন্য পরিকল্পনা করিতে গেলেই যে কলকব্জা, মেশিন প্রভৃতির উপরই জোর বেশী দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যদি সামাজিক বিপ্লব হয়, এবং সেখানকার শ্রমিকেরা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা করিতে যায়—তবে অবশ্য যন্ত্রাদির উৎপাদনের উপর বেশী জোর দিবে না; কেননা সেখানে পুঁজিতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ হইয়াছে; রেল, ইঞ্জিন, ফ্যাক্টরী, মেশিন কোন কিছুরই সেখানে অভাব নাই। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন অনুন্নত দেশ; প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেও যেটুকু পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ রুশিয়ায় সম্ভব হইয়াছিল, যুদ্ধের এবং বিদেশী শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের ফলে তাহা প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নকে আরম্ভ করিতে হয় প্রায় গোড়া হইতেই।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই অপর দেশের নিকট হইতে ঋণ লইয়া স্বদেশের শিল্পোন্নতি করিয়াছে। অন্যদেশের তো কথাই নাই, এমন কি যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান প্রথম ঋণ গ্রহণ করে ইংলণ্ডের নিকট। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমিকের রাজত্ব; সুতরাং উহা অপাংক্তেয়। এই অবস্থায়, স্বদেশে উৎপাদিত গম, তৈল প্রভৃতি কৃষিজাত ও খনিজদ্রব্য রপ্তানি করিয়া উহাদের বিনিময়ে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় সবটাই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন; সুতরাং পরিকল্পনায় আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এখানে একটা মুস্কিল দেখা দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন উহার পরিকল্পনার সাহায্যে স্বদেশের অর্থনীতি আয়ত্তে রাখিতে পারে সত্য, কিন্তু বিদেশের ব্যাপারে উহার হাত নাই। ১৯৩০ হইতে দেখা দেয় পুঁজিতান্ত্রিক জগতে সংকট। সব জিনিসেরই দাম কমিয়া যায়; কিন্তু যন্ত্রপাতির তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমে অনেক বেশী। বাধ্য হইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যদেশকে দিতে হইয়াছে অনেক বেশী।

একটা যুক্তি দেখানো হয়, ব্যক্তিগত লাভের আশা করা যায় না বলিয়া সমাজতন্ত্রের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কেহই পুরাদমে কাজ করিবে না, কাজের মধ্যে প্রেরণার অভাব হয়। এইরূপ যুক্তি একান্ত বাজে। পুঁজিতন্ত্রে অধিকাংশ কাজই করিতে হয় শ্রমিকের; ভরণ পোষণের উপযোগী মজুরিও তাহাদের জুটে না। ইহাদের প্রেরণা আসে কোথা হইতে? অন্য দেশের মত সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকেরাও মজুরির জন্যই কাজ করে। কিন্তু এখানে শ্রমিকের মর্যাদা অনেক বেশী; শ্রমিক মনে করে সে নিজের জন্যই উৎপাদন করিতেছে: কিন্তু পুঁজিতন্ত্রে শ্রমিকের এরূপ মনে করার কারণ

নাই। লেনিন ১৯১৯'এ বলিয়াছিলেন : 'নূতন সমাজব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার উপর। সামন্ততন্ত্রের ভূমিদাসদের চেয়ে পুঁজি-তন্ত্রের মজুর বেশী উৎপাদন করে; সমাজতন্ত্রের শ্রমিক যে আরও বেশী উৎপাদন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজতন্ত্রে শ্রমিক উচ্চাঙ্গের যন্ত্রের সাহায্যে স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে কাজ করে।' এই প্রসঙ্গে তিনি 'সাব্বট্নিক'দের* কাজের উল্লেখ করেন। ইহারা স্বেচ্ছায় অ-দক্ষ শ্রমিকদের কাজে সাহায্য করিতে আগাইয়া যায়।

শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর একটা উপায় 'সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা'। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একদল শ্রমিক অপর একদলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। বিজয়ী দল পরাজিত দলের নিকট যায় এবং বন্ধুভাবে তাহাদের ভাল কাজ দেওয়ার কৌশল শিখায়। এরূপ ব্যাপার অশ্রুতপূর্ব। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে ভাল কাজের জন্য বোনাস, প্রিমিয়াম, ছুটি পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। শ্রমিক মনে করে সে মজুরি অর্জন করে না, সে পায় সমাজের দেওয়া ভাতা†।

এই প্রসঙ্গে স্টাখানোভাইটদের কথা উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে ১৯৩৫-এর ৩০শে অগস্ট এলেক্সি স্টাখানোভ্ ও তাঁহার দুইজন সহযোগী ৫½ ঘণ্টায় একটি শিফ্টে ১০২ টন কয়লা তোলে; অথচ তখন এক শিফ্টে কয়লা উৎপাদনের গড় ছিল মাত্র ৭ টন। শ্রমিকেরা স্টাখানোভের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়; নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। স্টাখানোভিজম্ একটা আন্দোলনে পরিণত হয়। স্টাখানোভকে অনুসরণই শুধু নয়, স্টাখানোভ প্রবর্তিত উৎপাদনের মান অতিক্রম করা এবং উহাকে উন্নত করার দিকেও সকলের চেষ্টা থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে স্টাখানোভাইটরা সকল শিল্পেই তাহাদের উৎপাদন শতকরা ২০০ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। উরালে বোসার নামক একজন শ্রমিক তাহার উৎপাদন শতকরা ১০০০ বৃদ্ধি করে। তাহার কারখানায় ৩০২ জন স্টাখানোভাইট্; ইহারা নিজেদের '১০০০ পারসেণ্টার'* বলিতে গর্ববোধ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন বাড়ে শতকরা ৪১; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার উপরেও শতকরা ৯২ উৎপাদন বাড়িয়া যায়। ইহার মূলে স্টাখানোভাইটদের উদ্যম।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে শ্রমিকের মজুরি ১৯২৮-এর তুলনায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২-এর জানুয়ারী মাসে স্যার আলফ্রেড্ ফ্লেমিং নয়াদিল্লীতে ইঞ্জিনীয়ারদের এক সভায় বলেন : সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৬৫ জন

---

* Subbotnik. † Social allowance. * 1000 percenter.

শ্রমিক তাহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া হাতের কাজ শেষ করে; বাকী ৩৫ জন স্বাভাবিক কাজ দেয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অধীনে সমাজতন্ত্রের কাঠামো এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি গড়িয়া উঠে। পরিকল্পনায় কিরূপ নির্দেশ থাকে তাহার একটু নমুনা দেখা যাক। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭000 মাইলের রেল লাইন, এবং ১৫টি বৃহৎ পাওয়ার স্টেশন নির্মাণের নির্দেশ ছিল।

অবশ্য যাহা নির্দেশ দেওয়া হয় সবসময় তাহার সবটুকু হয়ত কাজে পরিণত করা সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে, প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় আগেকার পরিকল্পনাটির চেয়ে বেশী সাফল্য পাওয়া গিয়াছে। পাঁচ বছরের পরিকল্পনার মধ্যে আবার প্রতি বছরের জন্যও পরিকল্পনা লওয়া হয়। অনেক সময়ই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সমন্বয়ের দরকার হয়—তাই বাৎসরিক পরিকল্পনা না করিয়া পারা যায় না।

সোভিয়েট ইউনিয়নে কারখানাগুলির দায়িত্ব থাকে ম্যানেজারের উপর। ম্যানেজার নিয়োগ করার আগে শ্রমিক-সংঘের সহিত পরামর্শ করিতে হয়। শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড্-ইউনিয়ন ম্যানেজারের কাজের, তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে; এমন কি দরকার হইলে তাহাকে কাজ হইতে সরাইয়া দেয়। যথার্থ গণতন্ত্রের সাফল্য হইতে পারে সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে, এই ব্যাপারে তাহারই প্রমাণ হয়। প্রত্যেক কারখানায় ফ্যাক্টরী কমিটি থাকে; এই কমিটি শুধু উৎপাদনের উপরই লক্ষ্য রাখেনা, শ্রমিকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও উহারই করিতে হয়।

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও উন্নতির পূর্ণ সুযোগ থাকে। কিন্তু উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তির স্বত্ব নাই, এগুলির স্বত্ব সমষ্টির। সমষ্টির স্বত্ব বলিয়াই সমাজতন্ত্রে সকল প্রকারের বিকাশ সম্ভব হয়। এঙ্গেল্‌স্-এর ভাষায়, "এই সর্বপ্রথম একটি নির্দিষ্ট অর্থে মানুষ অবশিষ্ট জীবজগত হইতে নিজেকে চূড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়; পশুর জীবন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যথার্থ মানুষে পরিণত হয়। অস্তিত্বের যে সমুদয় অবস্থা এতদিন মানুষের পরিবেশরূপে কাজ করিয়াছে, এখন তাহা মানুষের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে; এই প্রথম মানুষ হয় প্রকৃতির রাজ্যের যথার্থ, সচেতন নিয়ন্তা; কেননা সে এখন তাহার নিজেরই সমাজ-সংগঠনের কর্তা।"